দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮ সন

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

মুদ্রক
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিন্টার্স
১৩৮ বিধান সরণী
কলকাতা-৪।

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীমৎ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ

সমীপেষু

নিবেদন

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী আজ কত প্রতিষ্ঠানে ও সভায় পঠিত, আলোচিত হচ্ছে; কত শ্রোতারা তা সাগ্রহে শুনছেন; কত ঘরে কত জন পাঠ করছেন—সে বৃত্তান্ত পরিসংখ্যানবিদ্‌দের গবেষণা সাপেক্ষ। দ্বিতীয় গীতার তুল্য এখন 'কথামৃতে'র আসন এবং পাঠকের চিত্তে তার আবেদন। সত্যের শক্তিতে অমোঘ, আবার অমিয়বৎ স্বাদু; পরম শান্তিলাভের চিরকালীন দিশারী তাঁর সুভাষিতাবলী।

তেমনি ক্রমবর্ধমান শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কিত বাংলা সাহিত্য। ঠাকুরের বাহ্য জীবন-কালেই তাঁর বিষয়ে গ্রন্থ রচনার সূচনা হয়েছিল। আর তাঁর দেহত্যাগের পর থেকে প্রকাশিত হতে থাকে বিভিন্ন পুস্তক। তার মধ্যে শ্রীম (মহেন্দ্রলাল গুপ্ত) প্রণীত 'কথামৃত' তো বঙ্গসাহিত্যের অনন্য সম্পদ।

বাংলার সাহিত্যিক কুলে অচিন্ত্যকুমারই প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হলেন। ঠাকুর সম্বন্ধে সাহিত্য সৃষ্টিতেও তিনি পথিকৃৎ। বিপুলায়তন 'পরম পুরুষ' ভিন্ন তাঁর 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ'ও স্মরণীয় সাহিত্যকর্ম।

অচিন্ত্যকুমারের পরে শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয়ে নানা ধরনের আলোচনা গ্রন্থ লিখিত হচ্ছে। ঠাকুরের ভাবরাশি অনন্ত। তার উপযুক্ত ব্যাপক ও বিশিষ্ট মূল্যায়ন আজো সম্ভবত হয় নি সাহিত্যক্ষেত্রে। 'কথামৃতে'র প্রতি সাহিত্য সমাজের দৃষ্টি যথোচিত আকৃষ্ট হতে পারে নি, বলতে হয়। তবে অদূর ভবিষ্যতে সুসমৃদ্ধ শ্রীরাম-কৃষ্ণ বিষয়ক সাহিত্য গড়ে উঠবে নিঃসন্দেহে।

তাঁর ভাবধারা ও আদর্শ উপনিষদ গীতাদি শাস্ত্রের সারাৎসার। তাই এত প্রাণজ এবং এত অসংখ্যজনের প্রিয়-পাঠ্যে পরিণত। আমার জীবনের চরম দুঃসময়ে অবলম্বন হয় ঠাকুরের দিব্য বাণী। তাঁর কথামৃত আমারও সঞ্জীবনী তুল্য হয়েছিল। আর সেই ধারণা থেকে লেখার ইচ্ছা জাগে, অযোগ্যতা সত্ত্বেও।

তাঁর সম্পর্কে আমার প্রথম কথা 'সঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণ'। তাঁর সঙ্গীতগুণের সর্বাঙ্গীন পরিচয় তার মধ্যে আছে। তার পরের বই 'কথায় কথায়।' শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত গল্প-গুলি নীতিকথা যুক্ত করে সাজিয়ে দেওয়া, সকল বয়সীদের উপযোগীভাবে। ঠাকুর সম্পর্কে আমার আরেকটি গ্রন্থ এ বছরের শেষ দিকে প্রকাশ পেতে পারে।

বর্তমান পুস্তকের বিষয়বস্তু—বাক্‌পতি শ্রীরামকৃষ্ণ। কি অসাধারণ তাঁর বাগবৈদগ্ধ্য,

নিবেদন

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী আজ কত প্রতিষ্ঠানে ও সভায় পঠিত, আলোচিত হচ্ছে, কত শ্রোতারা তা সাগ্রহে শুনছেন, কত ঘরে কত জন পাঠ করছেন—সে বৃত্তান্ত পরিসংখ্যানবিদদের গবেষণা সাপেক্ষ। দ্বিতীয় গীতার তুল্য এখন 'কথামৃতে'র আসন এবং পাঠকের চিত্তে তার আবেদন। সে তার শক্তি ও অমোঘ, আবার অমিয়বৎ স্বাদু, পরম শান্তিলাভের চিরকালীন দিশারী তার সুভাষিতাবলী।

তেমনি এমবর্ধমান শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কিত বাংলা সাহিত্য। ঠাকুরের বাহ্য জীবন-কালেই তার বিষয়ে গ্রন্থ রচনার সূচনা হয়েছিল। আর তাঁর দেহত্যাগের পর থেকে প্রকাশিত হতে থাকে বিভিন্ন পুস্তক। তার মধ্যে শ্রীম (মহেন্দ্রলাল গুপ্ত) প্রণীত 'কথামৃত' তো বঙ্গসাহিত্যের অনন্য সম্পদ।

বাংলার সাহিত্যিক কুলে অচিন্ত্যকুমারই প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হলেন। ঠাকুর সম্বন্ধে সাহিত্য সৃষ্টিতেও তিনি পথিকৃৎ। বিপুলায়তন 'পরম পুরুষ' ভিন্ন তার 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ'ও স্মরণীয় সাহিত্যকর্ম।

অচিন্ত্যকুমারের পরে শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয়ে নানা ধরনের আলোচনা গ্রন্থ লিখিত হচ্ছে ঠাকুরের ভাবরাশি অনন্ত। তার উপযুক্ত ব্যাপক ও বিশিষ্ট মূল্যায়ন আজও সম্ভবত হয় নি সাহিত্যক্ষেত্রে। 'কথামৃতে'র প্রতি সাহিত্য সমাজের দৃষ্টি যথোচিত আকৃষ্ট হতে পারে নি, বলা চলে। তবে অদূর ভবিষ্যতে সুসমৃদ্ধ শ্রীরাম-কৃষ্ণ বিষয়ক সাহিত্য গড়ে উঠবে নিঃসন্দেহে।

তাঁর ভাবধারা ও আদর্শ উপনিষদ গীতাদি শাস্ত্রের সারাৎসার। তাই এত প্রাণজ এবং এত অসংখ্যজনের প্রিয়-পাঠ্য। পরিণত আমার জীবনের চরম দুঃসময়ে অবলম্বন হয় ঠাকুরের দিব্য বাণী। তাঁর কথামৃত আমারও সঞ্জীবনী তুল্য হয়েছিল। আর সেই ধারণা থেকে লেখার ইচ্ছা জাগে, অযোগ্যতা সত্ত্বেও।

তাঁর সম্পর্কে আমার প্রথম কথা 'সঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণ'। তার সঙ্গীতগুণের সর্বাঙ্গীন পরিচয় তার মধ্যে আছে। তার পরের বই 'কথায় কথায়।' শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত গল্প-গুলি নীতিকথা যুক্ত করে সাজিয়ে দেওয়া, সকল বয়সীদের উপযোগীভাবে। ঠাকুর সম্পর্কে আমার আরেকটি গ্রন্থ এ বছরের শেষ দিকে প্রকাশ পেতে পারে।

বর্তমান পুস্তকের বিষয়বস্তু—বাক্‌পতি শ্রীরামকৃষ্ণ। কি অসাধারণ তাঁর বাগবৈদগ্ধ্য,

কত বড় সংলাপী তিনি, চারটি অধ্যায়ে তা বিবৃত করা হয়েছে। তিনি পূর্ণজ্ঞানী। একাধারে তাত্ত্বিক এবং সুরসিক। বিভিন্ন ভাবে পাওয়া যায় তাঁর বাক-পটুত্বের পরিচয়। প্রথম অধ্যায়ে দেখা যাবে, কথোপকথনে সৌকর্যের সঙ্গে তাঁর তত্ত্ব-বিষয়েও অপরাজেয়তা। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ দিকপাল বিদ্বানও তাঁর সঙ্গে বিতর্কে পর্যুদস্ত হয়ে যান। বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্রকেও ছাপিয়ে ওঠে তাঁর ব্যক্তিত্ব। যে প্রতিভাধর মনস্বীরা ঠাকুরের ভিন্ন মতাবলম্বী, কেবল তাঁদের সম্বন্ধিত প্রসঙ্গ এই অধ্যায়ে আলোচিত। দ্বিতীয় স্তবকে সংকলিত হয়েছে তাঁর কিছু সুভাষিতাবলী। তৃতীয় পরিচ্ছেদে পাওয়া যাবে নানা জ্ঞাতব্য, দুরূহ সব প্রশ্নের প্রাঞ্জল উত্তর। চতুর্থ স্তবকে তাঁর রহস্য-কৌতুকী সত্তার পরিচয় বিধৃত। একদিক থেকে বলতে গেলে, তার ভাবধারাকে বিভক্ত করা যায় না। যেখানে তিনি হাস্য পরিহাসে মুখর, সেখানেও আছে সুগভীর তত্ত্বকথা। আবার বিবাদের সময়েও তিনি রসিকতায় উচ্ছ্বসিত। তবু আলোচনার সুবিধার জন্যে বিষয়বস্তুকে ভাগ করা হয়েছে।

আমার বর্তমান শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণাম নিবেদিত হলো এইভাবে। তাঁর স্বরূপ যদি পাঠক পাঠিকারা কিছু অভিনব রূপে উপলব্ধি করতে পারেন তাহলেই আমি কৃতার্থ।

ইতি—

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

কথায় রাজা শ্রীরামকৃষ্ণ

লেখকের অন্য কয়েকটি গ্রন্থ :—

সঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণ

ভারতের সঙ্গীতগুণী—প্রথম খণ্ড

ভারতের সঙ্গীতগুণী—দ্বিতীয় খণ্ড

ভারতের সঙ্গীতগুণী—তৃতীয় খণ্ড (যন্ত্রস্থ)

দরবার নটী কলাবন্ত

ভারতীয় সঙ্গীতে ঘরাণার ইতিহাস

বাঙ্গালার রাগসঙ্গীত চর্চা

আসরের গল্প

সঙ্গীতের আসরে

বিচিত্র প্রতিভা

বিষ্ণুপুর ঘরাণা

সঙ্গীতসাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীতকল্পতরু

CHAITANYA

ছোটদের :—

কথায় কথায়

এশিয়ার রূপকথা

একদা যাহার বিজয় সেনানী

আলাপে বিচারে বিতর্কে

'বঙ্কিম !' নাম শুনেই শ্রীরামকৃষ্ণ রহস্য করে বললেন, 'তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো ?'

শুধু সানন্দ নন, কি আশ্চর্য সপ্রতিভ। বঙ্কিম অর্থ বাঁকা, তৎক্ষণাৎ এই ব্যঞ্জনায় রসিকতা করলেন।

একশ বছর আগেকার সেই বৃটিশ আমল। সেকালের ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজেও মাতৃভাষায় এমন অন্তরঙ্গ অধিকার ক'জনের ছিল, কে জানে। কিন্তু পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কহীন সাধুর স্বতঃস্ফূর্ত কৌতুক ঝলকিত হল এই শব্দটি নিয়ে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিদ্বৎ পরিচয়ও তিনি খানিক পেয়েছেন। তাঁকে দেখিয়ে অধরলাল সেন বলেছেন ঠাকুরকে, 'মহাশয়, ইনি ভারি পণ্ডিত। অনেক বই-টই লিখেছেন। আপনাকে দেখতে এসেছেন। এঁর নাম বঙ্কিমবাবু।'

কিন্তু সেজন্য কিছুমাত্র সঙ্কুচিত, অপ্রতিভ নন পূর্ণজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণ।

অধরলাল শুধু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নন, কবিও। তিনখানি কবিতা পুস্তকের তিনি রচয়িতা। সংস্কৃতিবান, মনস্বী। পুরাতত্ত্ব বিষয়ে গ্রন্থ-লেখকও। শ্রীরামকৃষ্ণের অতি প্রিয় এক গৃহী ভক্ত।

সে দিনটি হল—৫ই ডিসেম্বর ১৮৮৭। বাড়িতে ঠাকুরের আগমন উপলক্ষে সেন মহাশয় কজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বন্ধুকেও নিমন্ত্রণ করে এনেছেন। তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখবেন এবং বলবেন 'যথার্থ তিনি মহাপুরুষ কিনা।' (শ্রীম. কথিত)।

সম্ভবত ঠাকুরের সাধুত্ব সম্বন্ধে তাঁর সেই বন্ধুমহলে আলোচনা সমালোচনা হয়েছিল। সেই সূত্রে তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করতে চেয়েছিলেন।

সেই সুহৃদ্‌বর্গের অন্যতম বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮–১৮৯৫) যদিও তিনি অধরলালের চেয়ে পনের-যোল বছর বয়োজ্যেষ্ঠ।

বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে, বিদ্বৎ সমাজে বঙ্কিমের তখন অতুল প্রতিষ্ঠা। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছরের পরিণত বয়সী সে সময়। তাঁর সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি একপ্রকার সুসম্পন্ন। বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর এনেছে তাঁর যে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা, তার সমগ্র খণ্ড প্রকাশিত। দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী রচনার সঙ্গে তাঁর যে সৃজনশীল রস-সাহিত্যের জয়যাত্রা, তা বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রজনী, চন্দ্রশেখর, কমলাকান্ত, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, রাজসিংহ প্রভৃতি সৃষ্টির সম্পূর্ণতায় চূড়ান্ত গৌরবের শিখরে আসীন। তরুণ কবি রবীন্দ্র বঙ্কিমের প্রবন্ধ প্রতিবাদ করেও তাঁকে বলেছেন (ভারতী, ১২৯১, অগ্রহায়ণ)—'আমাদের দেশের প্রধান লেখক।'

বঙ্কিমের বিপুল, বিচিত্র দানে বাংলার তৎকালীন সাহিত্য সংস্কৃতি জীবন ধন্য হয়েছে। সারস্বত সত্তার সঙ্গে তাঁর উচ্চ সরকারী কর্ম এবং চরিত্র গৌরবের যোগে অর্জিত সামাজিক প্রতিপত্তিও সবিশেষ। প্রখর বুদ্ধি-দীপ্ত, ব্যক্তিত্বশালীও বঙ্কিমচন্দ্র। সুরসিক হলেও স্বভাবে গম্ভীর, বিশেষ বন্ধুগোষ্ঠীর বাইরে।

সেদিন তিনি এবং রাজকর্মচারী তাঁর কয়েকজন সুহৃদ একরকম পরীক্ষা করতে এসেছেন—অধরের এই বিচিত্র অতিথি 'যথার্থ মহাপুরুষ কিনা।' আর এই গ্রাম্য-দর্শন, অপরিপাটি বেশভূষার মানুষটিকে প্রথম দেখে বঙ্কিমের মনে কি তেমন অনুকূল ছাপ পড়েছিল? বোধহয়, না। কারণ তিনি অত্যন্ত লঘুভাবে ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করেন, কৌতূহলী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মণ্ডলীর মধ্যে।

তাই, 'তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো'-র উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র হাসতে

হাসতে বললেন, 'আর মহাশয়, সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।'
তিনি ধারণাও করতে পারেন নি, কার সঙ্গে কথোপকথনের এই সূচনা। তাঁর আদৌ জানা ছিল না—অধরের এই অনন্ত অতিথির ঈশ্বরই একমাত্র ধ্যান জ্ঞান মনন বাচনের বস্তু, তাঁর কথিত যাবতীয় প্রসঙ্গের ধারা ঈশ্বরীয় সাগর সঙ্গমে প্রবাহিত, রসিক চিত্তের সমগ্র ভাবনা পরম রস স্বরূপের উদ্দেশে নিবেদিত।
বঙ্কিমের নিতান্ত লৌকিক এই পরিহাসকে তিনি অলৌকিক পর্যায়ে উন্নীত করলেন তৎক্ষণাৎ।
'না গো, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে বঙ্কিম হয়েছিলেন। শ্রীমতীর প্রেমে ত্রিভঙ্গ হয়েছিলেন।'
আবার কৃষ্ণের অনুষঙ্গে মনে হল তাঁর কালো রূপের কথা। অমনি তার ব্যাখ্যা করলেন, 'কালো কেন জানো? যতক্ষণ ঈশ্বর দূরে ততক্ষণ তাঁকে কালো দেখায়, যেমন সমুদ্রের জল দূর থেকে নীলবর্ণ দেখায়। সমুদ্রের জলের কাছে গেলে ও হাতে করে তুললে আর কালো থাকে না, তখন খুব পরিষ্কার, শাদা।'
পুনরায় একটি উপমা দিলেন, 'সূর্য দূরে বলে খুব ছোট দেখায়; কাছে গেলে আর ছোট থাকে না। ঈশ্বরের স্বরূপ ঠিক জানতে পারলে আর কালোও থাকে না, ছোটও থাকে না।'
কিন্তু তাঁর স্বরূপ জানবে কে? কখন?
ঠাকুরের প্রসঙ্গ অগ্রসর হয়েই চলল আপনার ভাবে। বঙ্কিমের বাক্যটি তার উপলক্ষ মাত্র।
সেই ভগবৎ-সত্তা তত্ত্বেরও পরিচয় দিলেন, 'সে অনেক দূরের কথা, সমাধিস্থ না হলে হয় না। যতক্ষণ তুমি আমি (অর্থাৎ সেই ভেদ বুদ্ধি) আছে ততক্ষণ সেই নাম রূপও আছে। তাঁরই সব লীলা। আমি তুমি যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তিনি নানারূপে প্রকাশ হন।'
তারপরই বললেন পুরুষ আর প্রকৃতির কথা, নিত্য আর লীলার পারস্পরিক সম্পর্কের কথা—

'শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, শ্রীমতী তাঁর শক্তি—আদ্যাশক্তি। যুগল মূর্তির মানে কি? পুরুষ আর প্রকৃতি অভেদ, তাঁদের ভেদ নাই।···একটি বললেই আরেকটি তার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে।'

উপমা যোগে বোঝালেন, 'যেমন অগ্নি আর দাহিকা শক্তি। দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নিকে ভাবা যায় না। আর অগ্নি ছাড়া দাহিকা শক্তি ভাবা যায় না।'

এখানে একটি জটিল তত্ত্বের অবতারণা করলেন। নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম আর তাঁর সক্রিয় লীলার প্রসঙ্গ।

কিন্তু আশ্চর্য সরল ভাষায় তার উপস্থাপনা। অন্যত্রও যেমন বলেছেন, দুধ আর তার শুভ্রতা যেমন অবিভাজ্য। গঙ্গা আর তার ঢেউ যেমন অঙ্গাঙ্গী।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতীর যুগল মূর্তির ব্যাখ্যা থেকে প্রসঙ্গ আরম্ভ করেছিলেন। এবার তার উপসংহারে বললেন কবির ভাষায়—'অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের অন্তরে বাহিরে মিল।'

বঙ্কিমের কি সামান্য উক্তি থেকে কতখানি অসামান্য আলোচনা হয়ে গেল। এমন উচ্চ পর্যায়ের তত্ত্বকথা কি এমন অনাড়ম্বর-দর্শন ব্যক্তির কাছে আশা করেছিলেন তিনি?

না কি, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীমতী অর্থাৎ রাধার যুক্ত প্রসঙ্গ মনোমত হয় নি তাঁর? বঙ্কিমচন্দ্র যে রাধা স্বীকার করতেন না তা তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র' গ্রন্থে সুপ্রকাশ।

তাই কি শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শেষ হবার পর বঙ্কিম বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন ইংরেজীতে? অর্থাৎ ইংরেজ-অনভিজ্ঞ বক্তাকে গোপন করে তাঁর সম্পর্কে কোন বিরূপ আলোচনা? নাকি সেকালের ইংরেজী-'শিক্ষিত' বাঙ্গালীরা যেমন অনেক সময় পরস্পর ইংরেজীতে কথোপ-কথন করতেন, বন্ধুবান্ধবদের চিঠিপত্র যেমন লেখা হত ইংরেজীতে! সঠিক জানা যায় না।

কিন্তু আশ্চর্য ঠাকুরের লোকচরিত্রের জ্ঞান। প্রথমোক্ত সন্দেহটিই তাঁর

মনেও বোধহয় জেগেছিল। তাঁকে অজ্ঞাত রাখবার জন্যই বঙ্কিম প্রমুখের এই বিদেশী ভাষায় কথাবার্তা। এমন কি তাঁরই নিন্দাসূচক কিছু হয়ত। নচেৎ নাপিতের গল্প সূত্রে সেই বিধ্বংসী উপমাটি প্রয়োগ করলেন কেন? ঠাকুরের লোক—প্রজ্ঞাও তো অসাধারণ। তার কত অজস্র নিদর্শন তাঁর নানা দিনের বৃত্তান্তে ভাস্বর হয়ে আছে। নানা ধরনের মানুষের স্বরূপ নির্ণয় তিনি করেছেন অবলীলায়, স্বল্পকালের দর্শনেই।

তাই কি সহাস্যে ইংরেজী-ভাষীদের জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর নিজস্ব ভাষা ভঙ্গিমায়—'কি গো। আপনারা ইংরাজীতে কি কথাবার্তা বলছো?' তাঁর কথার ধরণে সকলে হাসতে লাগলেন। উত্তর দিলেন না বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা অপর কেউ। তবে তাঁর পরম ভক্ত অধরলাল, সম্ভবত গৃহপতির দায়িত্বে, যুক্তিস্বরূপ বললেন, 'আজ্ঞে, এই বিষয় একটু কথা হচ্ছিল, কৃষ্ণরূপের ব্যাখ্যার কথা।'

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বোধহয় কৈফিয়ৎটি বিশ্বাস করলেন না। তাই আরো রহস্য করে শোনালেন সেই চতুর কিন্তু সাহসী নাপিতের গল্পটি।

হাসতে হাসতে বললেন, 'একটা কথা মনে পড়ে আমার হাসি পাচ্ছে। শুনো, একটা গল্প বলি। এক নাপিত একজন ভদ্রলোককে দাড়ি কামাচ্ছিল। কামাতে কামাতে একটু লাগতেই লোকটি বলে উঠল—ড্যাম (Damn)। নাপিত ড্যামের মানে জানত না। সে হাতের ক্ষুর নামিয়ে রেখে, জামার আস্তীন গুটিয়ে বললে—তুমি আমায় ড্যাম বললে, এর মানে কি এখন বলতে হবে। লোকটি বিপদ বুঝে বললে, আরে তুই কামা না; ওর মানে এমন কিছু নয়। তবে তুই একটু সাবধানে কামাস। নাপিত কিন্তু ভারি চালাক। সে ছাড়বার পাত্তর নয়। সোজা লোকটির মুখের ওপর বলে দিলে, 'ড্যাম মানে যদি ভাল হয়, তাহলে আমি ড্যাম, আমার বাবা ড্যাম, আমার চোদ্দ পুরুষ ড্যাম। (শুনে বঙ্কিম প্রমুখ সবাই হেসে উঠলেন)। আর ড্যাম মানে যদি খারাপ হয়, তাহলে তুমি ড্যাম, তোমার বাবা ড্যাম, তোমার

চোদ্দ পুরুষ ড্যাম। (আবার সকলে হাসতে লাগলেন)। আর শুধু ড্যাম নয়। ড্যাম ড্যাম ড্যাম ড্যা ড্যাম ড্যাম।'

এবার উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন সবাই। কিন্তু গল্পটিকে উপমা স্বরূপ বিবেচনা করে, তার তাৎপর্য কি বুঝলেন?

ইংরেজী অনভিজ্ঞ হয়েও বুদ্ধিমান ক্ষৌরকার কেমন দাপটের সঙ্গে নিজের এবং পূর্বপুরুষদেরও সম্মান রাখলে। আর দুর্ভাষীকেও চোদ্দ পুরুষ সমেত গালাগালি দিয়ে নিলে প্রকারান্তরে।

ঠাকুরও কি পরিহাসছলে দুধারি তলোয়ার চালনা করলেন?

উচ্চ মানের তত্ত্বকথার পরে এমন দ্ব্যর্থক রসিকতা আস্বাদন করে, বঙ্কিমচন্দ্রের মনে শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণত্বের আভাস জাগল কি?

তাই বুঝি তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'মহাশয়, আপনি প্রচার করেন না কেন?'

প্রচারকের অভাব ছিল না সেযুগে। বঙ্কিমচন্দ্র সেকথা মনে রেখেই বলেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের যথার্থ মহিমা তখনো তাঁর কল্পনার অতীত। প্রচলিত অর্থে প্রচার যে তাঁর কাছে কতখানি অকিঞ্চিৎকর তা বঙ্কিমের বোধগম্য হলে এমন প্রশ্ন করতেন না অবশ্যই।

অবতার-কল্প পুরুষ বিনয়েরও অবতার।

'প্রচার।' তাঁর তাৎক্ষণিক উত্তর হল, 'ওগুলো অভিমানের কথা।'

তারপর একটি বাক্যে 'প্রচার'কে সর্বোত্তম পর্যায়ে উন্নীত করলেন। বিরাটের ব্যঞ্জনা দিয়ে বলতে লাগলেন, 'মানুষ তো ক্ষুদ্র জীব। প্রচার তিনিই করবেন যিনি চন্দ্র সূর্য সৃষ্টি করে এই জগৎ প্রকাশ করেছেন। প্রচার কি সামান্য কথা? তিনি সাক্ষাৎকার হয়ে আদেশ না দিলে প্রচার হয় না।'

বঙ্কিমচন্দ্র বলতে চেয়েছিলেন সাধারণ ভাবের প্রচারের কথা, যা ঈশ্বর উপলব্ধির ফলস্বরূপ নয়।

ঠাকুর সেই অসারকে নস্যাৎ করে দিয়ে বললেন, 'তবে হবে না কেন? আদেশ হয় নি তুমি বকে যাচ্ছ; ঐ দুদিন লোক শুনবে তারপর ভুলে

যাবে। যেমন একটা হুজুগ আর কি। যতক্ষণ তুমি বলবে ততক্ষণ লোকে বলবে, আহা, ইনি বেশ বলছেন। তুমি থামবে, তার পর কোথায় কিছুই নাই।'

আবার একটি ঘরোয়া উপমা দিলেন—যেমন সুপরিচিত তেমনি সুবোধ্য—'যতক্ষণ দুধের নীচে আগুনের জ্বাল রয়েছে, ততক্ষণ দুধটা ফোঁস করে ফুলে ওঠে। জ্বালও টেনে নিলে, আর দুধও যেমন তেমনি! কমে গেল।'

কিন্তু প্রচারকের নিজস্ব শক্তি থাকা প্রয়োজন। তবেই সফল হতে পারে প্রচার। কি করে আসে সেই শক্তি?

তাও জানিয়ে দিলেন, 'সাধন করে নিজের শক্তি বাড়াতে হয়। তা না হলে প্রচার হয় না।'

তারপর আরো স্পষ্ট করে বললেন, হালদার পুকুরে কোম্পানীর সেই নোটিশ দেওয়ার আর চাপরাশ পাবার উপমাটি শুনিয়ে—'তেমনি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয়ে যদি আদেশ দেন, তবেই প্রচার হয়, লোক শিক্ষা হয়, তা না হলে কে তোমার কথা শুনবে?'

'শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথাগুলি সকলে গম্ভীর ভাবে স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলেন', 'কথামৃত'কার লিপিবদ্ধ করেছেন।

সেই 'সকলে'র মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রও অন্যতম। তাঁরই কথার প্রতিবাদে ঠাকুর এমন প্রাঞ্জলভাবে মহৎ বক্তব্য প্রকাশ করলেন। একটিমাত্র কথার সূত্রে এমন অমূল্য ভগবদ্ প্রসঙ্গে বিবৃতি দিলেন যা বঙ্কিমের অশ্রুতপূর্ব। কিন্তু এতবড় বিদগ্ধ মনস্বী, ধর্ম-সচেতন ব্যক্তিও নিরুত্তর রইলেন। প্রসঙ্গে যোগ দিতে পারলেন না আপনা থেকে।

ঠাকুর এবার তাঁকেই প্রশ্ন করলেন, নিজস্ব ব্যাকরণে—'আচ্ছা, আপনি তো খুব পণ্ডিত, আর কত বই লিখেছ; আপনি কি বলো, মানুষের কর্তব্য কি? কি সঙ্গে যাবে? পরকাল তো আছে?'

বঙ্কিম কিন্তু এমন মনোজ্ঞ বিষয়ে পণ্ডিতোচিত আলোচনায় অগ্রসর হলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণকে যথোচিত গুরুত্ব দিতে এখনো তিনি যেন

অপারগ। তা ইচ্ছাকৃত কিনা কে জানে।

যেন লঘুভাবে কিংবা রহস্যভরে পাল্টা জিজ্ঞাস্য পেশ করলেন, 'পরকাল। সে আবার কি ?'

কি আশ্চর্য। পরকাল আছে কি না তা-ই কি বঙ্কিমের জ্ঞাতব্য এখানে? পরকাল বা পরলোক সম্পর্কে তিনি কি অনবহিত? হিন্দুধর্ম বিশ্বাসীর এক মূল বিশেষত্বই তো পরকাল বা পুনর্জন্মে আস্থা, তা কি বঙ্কিমচন্দ্রের অজ্ঞাত থাকা সম্ভব? তিনি এমন অজ্ঞতার ভান করলেন কিংবা জিজ্ঞাসুর মনোভাব দেখালেন কি ঠাকুরকে আরো পরীক্ষার উদ্দেশ্যে? শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু বিরক্ত হলেন না এই অ-বিজ্ঞ-জনোচিত কথায়। তিনি সরলভাবে হয়ত মনে করলেন, সুপণ্ডিত গ্রন্থকার প্রকৃত জ্ঞানীর তুলা এ বিষয়ে পর্যালোচনায় আগ্রহী. মুক্তিপ্রাপ্তদের নিরিখে পরলোক সম্পর্কে অনিশ্চয়তার প্রসঙ্গ, তাঁদের পুনর্জন্মলাভের প্রশ্ন উত্থাপন করতে চান। অর্থাৎ বিচারে ইচ্ছুক. ঈশ্বর-লব্ধ পুরুষের পুনরায় জন্ম হয় কিনা।

তাই সেই উচ্চ ভাবক্ষেত্র স্বীকার করে নিয়ে. সেই মান থেকে বিচার করলেন, 'হ্যাঁ, জ্ঞানের পর আর অন্য লোকে যেতে হয় না. পুনর্জন্ম হয় না। কিন্তু যতক্ষণ না জ্ঞান হয়, ঈশ্বর লাভ হয়, ততক্ষণ সংসারে ফিরে আসতে হয়, কোন মতে নিস্তার নাই। ততক্ষণ পরকালও আছে। জ্ঞান লাভ হলে, ঈশ্বর দর্শন হলে মুক্তি হয়ে যায়—আর আসতে হয় না। সিধোনো ধান পুঁতলে আর গাছ হয় না। জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ যদি কেউ হয় তাকে নিয়ে আর সৃষ্টির খেলা হয় না। সে সংসার করতে পারে না, তার তো কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি নাই। সিধোনো ধান ক্ষেতে পুঁতলে কি হবে!'

শস্য-ক্ষেত্রের মতন এক চাক্ষুষ. প্রাকৃত বিষয়ের উপমায় এত বৃহৎ এক অপ্রাকৃত জিজ্ঞাসার নিষ্পত্তি করে দিলেন। বহু মস্তিষ্ক আলোড়িত এক দুর্জ্ঞেয় প্রশ্নের কি স্থির মীমাংসা করলেন এমন অনায়াসে। কি প্রজ্ঞা-প্রদীপ্ত সুসংহত ভাষ্য।

কিন্তু এমন অপরূপ ব্যাখ্যারও ত্রুটি কিংবা অপূর্ণতা দেখাতে চাইলেন বঙ্কিমচন্দ্র। কোন যুক্তিযুক্ত আলোচনায় কিংবা গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যেও নয়। হাল্কাভাবেই তিনি বৃথা তর্কের আশ্রয় নিলেন। ছিদ্রান্বেষণই উদ্দেশ্য যেন, প্রকৃত অন্বেষা নয়। তাই তিনি জ্ঞানরূপ অগ্নিতে সিদ্ধ হওয়ার উপমানে সিদ্ধ-করা ধানের প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত দিলেন—আগাছা। এটি বঙ্কিমের নিজেরই তৎকালীন মানসিক আগাছা, না এই 'অশিক্ষিত' দর্শন ব্যক্তিকে আরো পরখ করবার অপচেষ্টা ?

তাই হাসতে হাসতে বললেন, 'মহাশয়, তা আগাছাতেও কোন গাছের কার্য হয় না।'

যথার্থ জ্ঞানীরও যেন আগাছা-তুল্য নিষ্ফল হওয়া সম্ভব !

এমন অজ্ঞানকৃত বাক্যেও বিরূপ হলেন না শ্রীরামকৃষ্ণ।

পরম ধৈর্যে, অ র্বভাবে জানালেন, 'জ্ঞানী তা বলে আগাছা নয়। যে ঈশ্বর দর্শন করেছে, সে অমৃত ফল লাভ করেছে—লাউ, কুমড়ো ফল নয় !'

এবার ভূমি থেকে ভূমায় উত্থিত হয়ে বললেন, 'তার পুনর্জন্ম হয় না। পৃথিবী বল, সূর্যলোক বল, চন্দ্রলোক—কোনও জায়গায় তার আসতে হয় না।'

বক্তব্যের সমর্থনে আবার ন্যায়-শাস্ত্রের একটি সূত্র ধরে দিলেন—'উপমা—একদেশী। তুমি তো পণ্ডিত, ন্যায় পড় নাই ? বাঘের মত ভয়ানক বললে যে বাঘের মত একটা ভয়ানক ল্যাজ কি হাঁড়িমুখ থাকবে তা নয়।'

এত বড় পণ্ডিত সাহিত্যিককেও এমন ভাবে বোঝাতে শোনাতে হল। তারপর কেশব সেনের প্রসঙ্গ করলেন ঠাকুর। আবার কুমোরের হাঁড়ি তৈরির উপমা দিয়ে বললেন, 'তাঁকে লাভ করলে তবে মুক্তি হয়, তবে কুমোর ছাড়ে, কেননা, তার দ্বারা মায়ার সৃষ্টির কোন কার্য আসে না। জ্ঞানী মায়াকে পার হয়ে গেছে। সে আর মায়ার সংসারে কি করবে।'

'তবে,'—উপসংহারে আরেকটি তত্ত্বের উদাহরণও রাখলেন, ব্যতিক্রম-

স্বরূপ—'কারুকে কারুকে তিনি রেখে দেন, মায়ার সংসারে লোক শিক্ষার জন্য। লোক শিক্ষা দিবার জন্য। জ্ঞানী বিদ্যা-মায়া আশ্রয় করে থাকে। সে তাঁর কাজের জন্য তিনিই রেখে দেন, যেমন শুকদেব, শঙ্করাচার্য।'

ঈশ্বর কি করেন, কোন্ উদ্দেশে—তা এমন ঈশ্বর-জানিত পুরুষ জানাতে পারেন এমন অবলীলায়।

আর যেন প্রসঙ্গ সূত্রেই বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, আপনি কি বল, মানুষের কর্তব্য কি ?'

এবার ঠাকুরই যেন পরীক্ষা করতে চাইলেন তাঁকে।

কিন্তু কি দুঃখের বিষয়। এতক্ষণ এমন অলৌকিকী জ্ঞানমার্গের বার্তা শুনেও বঙ্কিম কি নৈরাশ্যকর অজ্ঞানী উত্তরই দিলেন! অথবা, তিনি কি এই অনন্য প্রজ্ঞাবানের মাহাত্ম্য কিছুমাত্র অনুধাবন করতে পারেন নি এত তত্ত্ব কথার পরেও ? কিংবা তাঁকে পরীক্ষা করা আরো বাকি ছিল ? নাকি তামাসা করবার জন্যে এমন স্থূল রসিকতা করলেন হাসতে হাসতে ?—

'আজ্ঞা, তা যদি বলেন, তাহলে আহার নিদ্রা ও মৈথুন।'

যদি তামাসা কিংবা পরীক্ষা করবার জন্যে এমন অর্বাচীন উক্তি করে থাকেন, তাহলে উপযুক্ত শিক্ষাই পেলেন, এই বিশিষ্ট মণ্ডলীর মধ্যে। এমন 'সিনিক', মানবের নিন্দাসূচক মন্তব্য ঠাকুর বরদাস্ত করলেন না। বিষম বিরক্ত হলেন এবার।

সমাগত কয়েকজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, রাখাল মহারাজ প্রমুখ বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দ, নব বিধান সমাজের বিখ্যাত গায়ন-গুণী প্রচারক ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল এবং দর্শনার্থী অনেক নূতন ভদ্রলোক—সকলের সামনে বঙ্কিমের মুখের ওপর বলে উঠলেন, ধিক্কার দিয়ে, 'এঃ! তুমি তো ভারি ছ্যাঁচড়া! তুমি যা রাতদিন কর তাই তোমার মুখে বেরুচ্চে। লোক যা খায় তার ঢেঁকুর ওঠে। কামিনী কাঞ্চনের ভিতর রাতদিন রয়েছ, আর ওই কথাই মুখ দিয়ে বেরুচ্চে! কেবল বিষয় চিন্তা করলে

পাটোয়ারি স্বভাব হয়, মানুষ কপট হয়। ঈশ্বর চিন্তা করলে সরল হয়, ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হলে ও কথা কেউ বলবে না।'

বঙ্কিমের দিকে চেয়ে তাঁকে একেবারে নস্যাৎ করে দিয়ে বললেন, 'শুধু পাণ্ডিত্য হলে কি হবে, যদি ঈশ্বরচিন্তা না থাকে? যদি বিবেক বৈরাগ্য না থাকে? পাণ্ডিত্য কি হবে, যদি কামিনী কাঞ্চনে মন থাকে?'

রাশভারী ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক বঙ্কিমচন্দ্রের আকৃতি। বুদ্ধিদীপ্ত মুখাবয়ব। সুপুরুষ সুবেশ পরিণত বয়সী। এত পুস্তক রচনার গৌরব আর সরকারী উচ্চ পদের গরিমা। কিছুই গ্রাহ্য করলেন না পরমহংসদেব। একেবারে শবভূক শকুনের সঙ্গে তাঁকে তুলনা করে দিলেন সর্বসমক্ষে—

'চিল শকুনি খুব উঁচুতে উঠে, কিন্তু ভাগাড়ের দিকে কেবল নজর। পণ্ডিত অনেক বই শাস্ত্র পড়েছে, শোলক ঝাড়তে পারে, কি বই লিখেছে; কিন্তু মেয়েমানুষে আসক্ত, টাকা মান সার বস্তু মনে করেছে, সে আবার পণ্ডিত কি? ঈশ্বরে মন না থাকলে পণ্ডিত কি?'

আরেক দিক থেকেও তেমনি তীক্ষ্ণভাবে জানালেন, 'কেউ কেউ মনে করে এরা কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করছে; পাগলা। এরা বেহেড হয়েছে। আমরা কেমন স্যায়না, কেমন সুখ ভোগ করছি; টাকা, মান, ইন্দ্রিয়-সুখ।'

সেই সব চরিত্রের মানুষদের কাকের স্বভাব বলে বর্ণনা করলেন। কাকরা নিজেদের বড় চালাক মনে করে—'কাক দেখো না কত উড়ুর পুড়ুর করে, ভারী স্যায়না।' কিন্তু কি তাদের রুচি প্রবৃত্তি—সকালেই বিষ্ঠা-ভোজী। একথাও জানিয়ে দিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মণ্ডলীর মধ্যমণিকে। তাঁর মুখের সামনে।

শ্রীরামকৃষ্ণের এমনি ভাষণ শুনে—'সকলে স্তব্ধ।'

বঙ্কিমচন্দ্রও, অবশ্যই এমন সাক্ষাৎভাবে আক্রান্ত, বিধ্বস্ত হয়েও প্রতিবাদযোগ্য ভাষা হারিয়েছেন। বাক্যহারা তিনি। নির্বাক শ্রোতা মাত্র।

পূর্ণ জ্ঞানের উৎস থেকে মণিমুক্তার নির্ঝর প্রবাহিত হয়ে এসেছে।

সত্যের শক্তিতে অমোঘ, ভগবদ্ উপলব্ধির প্রকাশে দুর্বার। তার অভিঘাতে এক শ্রেষ্ঠতম পুরুষও বিপর্যস্ত, আপন অসমীচীন উক্তির ফলে। স্বখাত সলিলে মজ্জমান।

কিন্তু ঈশ্বর-কল্প পুরুষ তো কলহপর ন'ন। তিনি যেমন নিরন্তর দিব্য-ভাবে দেদীপ্যমান, তেমনি সর্ব মানবের প্রতি সুপ্রীত। পরম কারুণিক। বিসংবাদ তাঁর স্বভাবের বিপরীত।

ভগবৎ সান্নিধ্য আস্বাদন যেমন তাঁর প্রাণের শ্রেষ্ঠ আরাম, মননে বাচনে সঙ্গীতে ভগবৎ প্রসঙ্গ তাঁর দিনচর্যা, তাঁর সুভাষিত বিষয়; তেমনি মুখর প্রতিবাদী হতে হয় ঈশ্বর-বিমুখতা নিরসনের জন্যে। তখনো তাঁর যাবতীয় বক্তব্য শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরমুখীন। তাই পুনরায় বাঙ্ময় হলেন ঝলকিত ধারায়—

'যারা কিন্তু ঈশ্বর চিন্তা করে, বিষয়ে আসক্তি, কামিনী কাঞ্চনে ভালবাসা চলে যাবার জন্য রাতদিন প্রার্থনা করে, যাদের বিষয় রস তেতো লাগে, হরিপাদপদ্মের সুধা বই আর কিছু ভাল লাগে না, তাদের স্বভাব যেমন হাঁসের স্বভাব। হাসের সুমুখে দুধে জলে দাও, জল ত্যাগ করে দুধ খাবে। আর হাঁসের গতি দেখেছো? একদিকে সোজা চলে যাবে। শুদ্ধ ভক্তের গতিও কেবল ঈশ্বরের দিকে। সে আর কিছু চায় না, তার আর কিছু ভাল লাগে না।'

ঈশ্বরীয় কথায় সদা তন্ময় ঠাকুর। এবার তাঁর মনে পড়েছে, বঙ্কিমকে কঠিন কিছু বলে ফেলেছেন, বিচারের মধ্যে। কিন্তু তা নিতান্ত সত্য নির্ণয়ের জন্যে। তাঁকে হেয় করবার বা ব্যথা দেবার উদ্দেশ্যে নয়। বরং তিনি স্বয়ং বেদনা বোধ করেছেন।

তাই দুঃখিত হয়ে কোমলকণ্ঠে বললেন, পুনরায় নিজস্ব ব্যাকরণে, 'আপনি কিছু মনে কোর না।'

বুদ্ধিমান বঙ্কিমচন্দ্র। মানিয়ে নেবার জন্যে বললেন, 'আজ্ঞা, মিষ্টি শুনতে আসিনি।'

কিন্তু তিনি কি তিক্ত কথা শুনতে এসেছিলেন? কথাটা যেন অর্থহীন

শোনাল। যুক্তিযুক্ত বাক্য তাঁর কণ্ঠে আসছিল না কেন, যা তাঁর তুল্য বিদ্বানের উপযুক্ত হত? লক্ষণীয় যে, তিনি স্বয়ং বিশেষ কিছুই বলছেন না। একটি দুটি কথা উচ্চারণ করছেন এই আশ্চর্য কথকের সামনে। আর নীরব শ্রোতারূপেই উপবিষ্ট রয়েছেন। তাঁর কোন প্রত্যয়যোগ্য ভূমিকা থাকছে না এই কথোপকথনে। আদ্যোপান্ত সংলাপের প্রবর্তক-রূপে বিদ্যমান—অনাড়ম্বর দর্শন সাধুপুরুষ।

বঙ্কিমচন্দ্র কি প্রখর ব্যক্তিত্বশালী, তা রবীন্দ্রনাথ লিখিত তাঁকে প্রথম দর্শনের বর্ণনায় জানা যায়—'সেই সম্মেলন সভার ভিড়ের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে নানা লোকের মধ্যে হঠাৎ এমন একজনকে দেখিলাম যিনি সকলের হইতে স্বতন্ত্র—যাঁহাকে অন্য পাঁচজনের সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিবার জো নাই। সেই গৌরকান্তি দীর্ঘকায় পুরুষের মুখের মধ্যে এমন একটি দৃপ্ত তেজ দেখিলাম যে তাঁহার পরিচয় জানিবার কৌতূহল দমন করিতে পারিলাম না। সেদিনকার এত লোকের মধ্যে, কেবল-মাত্র, তিনি কে ইহাই জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলাম। যখন শুনিলাম তিনিই বঙ্কিমবাবু তখন বড়ো বিস্ময় জন্মিল। লেখা পড়িয়া এতদিন যাঁহাকে মহৎ বলিয়া জানিতাম চেহারাতেও তাঁহার বিশিষ্টতায় যে এমন একটি নিশ্চিত পরিচয় আছে সেকথা সেদিন আমার মনে খুব লাগিয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর খড়্গ নাশায়, তাঁহার চাপা ঠোঁটে, তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভারি একটা প্রবলতার লক্ষণ ছিল। বক্ষের উপর দুইহাত বদ্ধ করিয়া তিনি যেন সকলের নিকট হইতে পৃথক হইয়া চলিতেছিলেন, কাহারও সঙ্গে যেন তাঁর কিছুমাত্র গা ঘেঁষাঘেষি ছিল না, এইটেই সর্বাপেক্ষা বেশি করিয়া আমার চোখে ঠেকিয়াছিল। তাঁহার যে কেবল মাত্র বুদ্ধিশালী মননশীল লেখকের ভাব তাহা নহে, তাঁহার ললাটে যেন একটি অদৃশ্য রাজতিলক পরানো ছিল।' (জীবনস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ)। রবীন্দ্রনাথের বঙ্কিমচন্দ্রকে সেই দেখা ১৮৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে (যতীন্দ্রমোহন-সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরদের এমারেল্ড বাওয়ারে)। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎকারের আট বছর আগে।

সুতরাং এখন তিনি আরো সুপরিণত দর্শন, সুপ্রতিষ্ঠিত প্রৌঢ়ত্বে অধিকতর ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক।

কিন্তু সুহৃদ অধরলালের গৃহে আজ তিনি কেমন নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছেন। তাঁকে উদ্দেশ করেই বলছেন পরমহংসদেব, 'কামিনী কাঞ্চনই সংসার। এরই নাম মায়া। ঈশ্বরকে দেখতে, চিন্তা করতে দেয় না। পশুভাব না গেলে ঈশ্বরের আনন্দ আস্বাদন করতে পারে না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হয় যাতে পশুভাব যায়। ব্যাকুল হযে প্রার্থনা। তিনি অন্তর্যামী, শুনবেনই শুনবেন। যদি আন্তরিক হয়।'

'আর কাঞ্চন', বলে, 'টাকা মাটি মাটি টাকা'র সেই পরম উপলব্ধির কথাও শোনালেন।

কিন্তু এমন জ্বলন্ত বিশ্বাসের বাণীও বৃথা গেল মূল শ্রোতার কাছে। সত্যসন্ধ বৈরাগীর সম্যক ধারণা করতে বঙ্কিম অপারগ। তাই নিতান্ত সাধারণবুদ্ধি লোকের মতন পুনরায় মন্তব্য করে ফেললেন, 'টাকা মাটি! মহাশয় চারটা পয়সা থাকলে গরীবকে দেওয়া যায়। টাকা যদি মাটি, তাহলে দয়া পরোপকার করা যাবে না?'

উত্তরে আরেক ঝলক দিব্যবাণী ধ্বনিত হল, তাঁকেই লক্ষ্য করে— 'দয়া! পরোপকার! তোমার সাধ্য কি যে তুমি পরোপকার করো? মানুষের এত নপর চপর কিন্তু যখন ঘুমোয়'—তখন তার কি অসহায় অবস্থা তা একেবারে গ্রাম্য ভাষায় অবারিত করে, শ্রোতার অহং বোধকে চূর্ণ করে দিলেন—'তখন, অহঙ্কার অভিমান দর্প কোথায় যায়?'

নিরুত্তর, হতবাক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দুর্ধর্ষ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সাহিত্য মহারথী এখন এক নগণ্য শ্রোতায় পর্যবসিত।

সত্যের তেজে পুনরায় সেই দৃপ্ত ভাষণ বিচ্ছুরিত হতে লাগল— ' সন্ন্যাসী যদি কাউকে কিছু দেয় সে নিজে দেয় মনে করে না। দয়া ঈশ্বরের, মানুষ আর কি দয়া করবে? দানটান সবই রামের ইচ্ছা। ঠিক সন্ন্যাসী মনেও ত্যাগ করে বাইরেও ত্যাগ করে।...'

হু উচ্চমার্গের এই ধরনের তত্ত্বকথাসার। হিসাবী-বুদ্ধি সংসারীর পক্ষে ারণার অতীত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তো সাধারণ কোটির মানুষ নন। তিনি কেন পতিত হলেন এমন অজ্ঞতার ভ্রমে?

অনর্গল শ্রীরামকৃষ্ণের কথাপ্রসঙ্গে ক্রমে এলো—নিষ্কাম কর্ম।

এ বিষয়ে বঙ্কিম নিজেই লিখেছেন ক বছর আগে, 'দেবী চৌধুরাণী'তে। ভবানী পাঠক নিষ্কাম কর্মের ব্যাখ্যা করেছেন প্রফুল্লের উদ্দেশে। আজ সেই তত্ত্বের অন্তরঙ্গ ভাষ্য ভবাণী পাঠকের স্রষ্টা নীরবে শুনতে লাগলেন। স্বতঃ উৎসারিত সর্বজনবোধ্য ভাষণ—

সংসারী লোকের টাকার দরকার। পরিবার ভরণপোষণ করতে হয়।'

প্রথমেই তিনি একথা স্বীকার করলেন। কিন্তু—ঠাকুরের বক্তব্য, সে কাজও করা উচিত আসক্তি-শূণ্য হয়ে। সংসারী ব্যক্তিরও আসক্তি দূর হয় কি করে? মনে শুদ্ধাভক্তি জাগলে। তিনি তাই বলছেন, 'সংসারী লোক শুদ্ধভক্ত হলে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করে।'

নিষ্কাম কর্ম কাকে বলে এবং কিভাবে তা সম্ভব?

ঠাকুর বলছেন, 'কর্মের ফল—লাভ, লোকসান, সুখ দুঃখ ঈশ্বরকে সমর্পণ করে। আর তাঁর কাছে রাতদিন ভক্তি প্রার্থনা করে, আর কিছুই চায় না। এরই নাম নিষ্কাম কর্ম—অনাসক্ত হয়ে কর্ম করা।· '

সংসারীর দান দাতার নিজেরই মঙ্গলের জন্যে। পরোপকারের দান আত্মশ্লাঘার আর ক্ষুদ্রদৃষ্টির পরিচায়ক। উদার পটভূমিতে প্রশ্নটিকে স্থাপন করে ঠাকুর তাও বুঝিয়ে দিলেন। সংসারী ব্যক্তি যদি নিষ্কাম-ভাবে কাউকে দান করে সে নিজেরই উপকারের জন্যে, পরোপকারের জন্যে নয়। সর্বভূতে ঈশ্বর বিদ্যমান। কাউকে দান করলে ঈশ্বরেরই সেবা করা হয়। বিশ্বব্যাপী কল্যাণময় ভগবৎসত্তা সম্বন্ধে অবহিত করিয়ে দিলেন শ্রোতাদের, এইভাবে।

সেই সঙ্গে জানালেন কমযোগের অর্থও। হরিসেবা হলে, নিজেরই উপকার হল, অপরের নয়। এমনি সর্বভূতে হরির সেবা—শুধু মানুষের নয়, জীবজন্তুর মধ্যেও ঈশ্বরের সেবা—যদি কেউ করে, আর যদি সে

মান না চায়, যশ না চায়, মৃত্যুর পর স্বর্গও না চায়, যাদের সেবা করছে, তাদের কাছ থেকে প্রতিদানে কোন উপকার না চায়, এমনিভাবে যদি কেউ সেবক বৃত্তি পালন করে, তাহলে তার যথার্থ নিষ্কাম কর্ম, অনাসক্ত কর্ম করা হয়। এমনি নিষ্কাম কর্ম করলে তার আপনারই কল্যাণ হয়। এরই নাম কর্মযোগ। এই কর্মযোগও ঈশ্বর লাভের একটি পথ। কিন্তু তা বড় কঠিন, কলিযুগের পক্ষে কদাচিৎ সম্ভব।

দান ধ্যানের এই মহান আদর্শ কি গভীর আন্তরিকতায়, কি প্রাঞ্জলভাবে তিনি প্রকাশ করলেন।

'তাই বলছি, যে অনাসক্ত হয়ে এরূপ কর্ম করে, দয়াদান করে, সে নিজেরই মঙ্গল করে। পরের উপকার, পরের মঙ্গল সে ঈশ্বর করেন— যিনি চন্দ্র সূর্য বাপ মা ফল ফুল শস্য জীবের জন্য করেছেন! বাপ মার ভিতর যে স্নেহ দেখ, সে তাঁরই স্নেহ, জীবের রক্ষার জন্যই দিয়েছেন দয়ালুর ভিতর যা দয়া দেখ, সে তাঁরই দয়া, নিঃসহায় জীবের রক্ষার জন্য দিয়েছেন। তুমি দয়া কর আর না কর, তিনি কোন না কোন সূত্রে তাঁর কাজ করবেন। তার কাজ আটকে থাকে না।

তাই জীবের কর্তব্য কি? আর কি, তাঁর শরণাগত হওয়া, আর তাঁকে যাতে লাভ হয়, দর্শন হয় সেইজন্যে ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা।'...

একযোগে অহং বোধ-শূন্য হওয়া এবং ঈশ্বরে সমর্পিত প্রাণ হয়ে কর্ম করে যাবার কি মনোহর আহ্বান। বাস্তব পথ নির্দেশও।

মানুষের প্রকৃত কর্তব্য যে মাত্র আহার নিদ্রা মৈথুন নয়, ঈশ্বরে শরণাগতি, সে উত্তর এবার দিলেন।

পুনরায় আরেকটি প্রশ্ন করলেন বঙ্কিমকেই। আগেকার জিজ্ঞাস্যেরই আরেকটি সূত্র। প্রথমে পুঁথিগত বিদ্যা, না ভগবান?

বললেন, 'কেউ কেউ মনে করে শাস্ত্র না পড়লে, ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। তারা মনে করে, আগে জগতের বিষয় জীবের বিষয় জানতে হয় আগে সায়েন্স পড়তে হয়। (কথার ধরনে সকলে হাসলেন)। তারা

বলে ঈশ্বরের সৃষ্টি এসব না বুঝলে ঈশ্বরকে জানা যায় না। তুমি কি বল? আগে সায়েন্স না আগে ঈশ্বর?'

এরকম একেকটি ইংরেজী শব্দ ঠাকুর মাঝে মাঝে বেশ বলে দেন! সঠিক জায়গাতেই প্রয়োগ করেন চমৎকারভাবে। এমন রসিকতার ভঙ্গিমায় তাঁকে শব্দগুলি উচ্চারণ করতে শোনা যায় যে শ্রোতাদের পরম উপভোগ্য হয়। আরো আকর্ষক হয়ে ওঠে তাঁর বক্তব্য। তাঁর নানাদিনের কথাবার্তায় এমনি কয়েকটি ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করেন তিনি—থ্যাঙ্ক ইউ। বিল্‌ডিঙ্। কুইন। রেফাইন। লাইক। ইংলিশম্যান। পেন্‌সান | 'ফ্যালজফি' | আণ্ডার | সায়েন্স | ইয়ং বেঙ্গল ইত্যাদি। সবই নিশ্চয় লোকের মুখে মুখে শুনে মনে রাখা। আর শব্দগুলির অর্থও জানতেন বিলক্ষণ, বলা বাহুল্য। ইংরেজী শিক্ষিতদের সঙ্গে কথাবার্তায় সেসব প্রয়োগ করে থাকেন। এখানেও 'সায়েন্স' বললেন বঙ্কিমের উদ্দেশে প্রশ্নটিতে।

উত্তরের ইঙ্গিত তাঁর বাক্যের মধ্যেই ছিল। কিন্তু তা যেন বুঝেও বুঝতে চাইলেন না বঙ্কিমচন্দ্র।

সাধারণ্যে প্রচলিত ধারণাকে সমর্থন জানিয়ে বললেন, 'না, আগে পাঁচটা জানতে হয়, জগতের বিষয়। একটু এদিককার জ্ঞান না হলে, ঈশ্বর জানবো কেমন করে? আগে পড়াশুনা করে জানতে হয়।'

'ঐ তোমাদের এক।' শ্রীরামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করলেন এই বিপরীত বুদ্ধির! তার বিচার হল---জ্ঞানের একটি মূল সূত্র—'আগে ঈশ্বর, তারপর সৃষ্টি। তাঁকে লাভ করলে, দরকার হয় তো সবই জানতে পারবে।'

এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে তার বিচারের ধারা অগ্রসর হল, অতি সহজ লৌকিক কিন্তু অতি সার্থক উপমা যোগে,—'যদি যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ করতে পারো সো সো করে, তাহলে যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, যদু মল্লিকের কখানা বাড়ি, কত কোম্পানীর কাগজ, কখানা বাগান, এও জানতে পারবে। যদু মল্লিকই বলে দেবে। কিন্তু তার সঙ্গে যদি

আলাপ না হয়, বাড়ি ঢুকতে গেলে দারোয়ানেরা যদি না ঢুকতে দেয়, তাহলে কখানা বাড়ি, কত কোম্পানীর কাগজ, কখানা বাগান, এসব ঠিক খবর কেমন করে জানবে ?'

সর্ব কথার সার—'তাঁকে (অর্থাৎ ঈশ্বরকে) জানলে, সব জানা যায়, কিন্তু সামান্য বিষয় জানবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। ··আগে ঈশ্বর লাভ, তারপর সৃষ্টি বা অন্য কথা। · এককে জানলে সব জানা যায়। এক-এর পর যদি পঞ্চাশটা শূন্য থাকে তাহলে অনেক হয়ে যায়। এক-কে পুঁছে ফেললে কিছু থাকে না। এক-কে নিয়েই অনেক। এক আছে, তারপর অনেক ; আগে ঈশ্বর তার পর জীব জগৎ।'

এর চেয়ে সরলীকৃত ভাষ্য আর কি হতে পারে ?

তবু বোধার্থে আরো সুস্পষ্ট একটি উপমা যোগ করলেন—'তোমার আম খাবার দরকার। বাগানে কত শ আম গাছ, কত হাজার ডাল, কত লক্ষ কোটি পাতা, এসব খবরে তোমার কাজ কি ? · আম খেতে এসেছিস, আম খেয়েই যা।'

এতক্ষণ পরে বঙ্কিম মন্তব্য করলেন, 'আম পাই কই ?'

হয়ত ভাবলেন, খুব যুক্তিযুক্ত কথা সরস-ভাবে প্রকাশ করা হল। শ্রীরামকৃষ্ণের উপমার সূত্রেই তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হল তাঁর বক্তব্যের অসম্ভাব্যতার কথা। ঈশ্বর লাভের পন্থা দেওয়া কি মুখের কথা ? উত্তর দেওয়া কঠিন হবে কথকের পক্ষে। কিন্তু বঙ্কিম লক্ষ্য করেন নি, আগেই তিনি পথের সন্ধান দিয়েছিলেন।

সে যা হোক, প্রশ্ন করা মাত্র ঠাকুর জোরের সঙ্গে বললেন, 'তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, তিনি শুনবেনই শুনবেন। হয়ত এমন কোন সৎসঙ্গ জুটিয়ে দিলেন, যাতে সুবিধা হয়ে গেল। কেউ হয়ত বলে দেয়, এমনি এমনি কর তাহলে ঈশ্বরকে পাবে।'

'কে ? গুরু।' আবার বঙ্কিম এমন গুরুতর বিষয়েও অসার রসিকতা করলেন, 'তিনি আপনি ভাল আম খেয়ে, আমায় খারাপ আম দেন।' শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চয়ই সে ধরনের গুরুর কথা বলেন নি। একথা বোঝা

উচিত ছিল বঙ্কিমের। যথার্থ গুরু অমন (বঙ্কিমের বর্ণনার মতন) হন না। গুরুগিরি যাদের পেশা—যাদের ঠাকুর বহুবারই ধিক্কার দিয়েছেন —তাদের তেমন মতিগতি হতে পারে। কিন্তু সমগ্রভাবে গুরু সম্পর্কে বঙ্কিমের এই উক্তি অপ্রযোজ্য। পরমহংসদেবের কাছে এমন নৈরাশ্য-জনক, 'সিনিক' মন্তব্য যে আদৌ সমীচীন হয় না, তা বঙ্কিমচন্দ্রের কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছিল না—তা এক বিস্ময়ের ব্যাপার।

ঠাকুর কিন্তু বিরক্ত হলেন না। পরম ধৈর্যে গুরুর মহত্ত্ব, বিচক্ষণতা, পথ নির্দেশের ক্ষমতার কথা বললেন, আরো মিষ্টি ভাবে। শিষ্যদের প্রতি তাঁর স্নেহ, কল্যাণ কামনার বার্তাও জানালেন দায়িত্ববোধ সম্পন্না জননীর উপমা যোগে, 'কেন গো। যার পেটে যা সয়। সকলে কি পলুয়া কালিয়া খেলে হজম করতে পারে? বাড়িতে মাছ এলে মা সব ছেলেকে পলুয়া কালিয়া দেন না। যে দুর্বল, যার পেটের অসুখ, তাকে মাছের ঝোল দেন, তা বলে মা সে ছেলেকে কম ভালবাসেন?'

গুরুর মহিমময় ভূমিকা। তিনি ঈশ্বর লাভের পন্থা দেন শিষ্যকে, তার অবস্থা বা ক্ষমতা অনুসারে।

বঙ্কিমের বিদ্রূপাত্মক উক্তিকে দ্বিগুণ করে, শ্রীরামকৃষ্ণ গুরুর মাহাত্ম্য প্রকাশ করলেন। গুরুর উদ্দেশে তাঁর আপন অন্তরের শ্রদ্ধাও নিবেদিত হল সেইসঙ্গে,—'গুরুবাক্যে বিশ্বাস করতে হয়। গুরুই সচ্চিদানন্দ, সচ্চিদানন্দই গুরু। তাঁর কথা বিশ্বাস করলে—বালকের মত বিশ্বাস করলে—ঈশ্বর লাভ হয়। বালকের কি বিশ্বাস মা বলেছে, 'ও তোর দাদা হয়, অমনি জেনেছে, 'ও আমার দাদা।' একেবারে পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস। এই বালকের বিশ্বাস, গুরুবাক্যে এমন বিশ্বাস চাই। স্যায়না বুদ্ধি, পাটোয়ারি বুদ্ধি, বিচার বুদ্ধি করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। সরলের কাছে তিনি খুব সহজ। কপট থেকে অনেক দূর।'

তারপর আরো কিছু প্রসঙ্গ করলেন। মাতার জন্যে সন্তানের ব্যাকুলতার উপমা। সব মতই ঈশ্বর লাভের একেকটি পথ।

এমনি নানা আলোচনার পর নববিধান সমাজের বিখ্যাত গায়ক

ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল আরম্ভ করলেন কীর্তন গান।
সুমিষ্ট-কণ্ঠ গায়ক তথা গীত-রচয়িতা সান্ন্যাল মহাশয়। ঠাকুরের অতি প্রিয় এক ভক্ত। তাঁর কীর্তন শুনতে শুনতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবেগে দাঁড়িয়ে উঠলেন। তাঁর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হল ঈশ্বর আবেশে। চিত্রপটের তুল্য স্থির, অচঞ্চল দেহ! 'একেবারে অন্তর্মুখ, সমাধিস্থ।'
দণ্ডায়মান অবস্থাতেই সমাধি-মগ্ন হয়েছেন ঠাকুর। ভক্তেরা সকলে তাঁকে বেষ্টন করে দাঁড়ালেন।
আর বঙ্কিমচন্দ্র—'ব্যস্ত হইয়া ভিড় ঠেলিয়া ঠাকুরের কাছে গিয়া এক দৃষ্টে দেখিতেছেন। তিনি সমাধি কখনও দেখেন নাই।'
খানিকক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণের বহির্জ্ঞান ফিরে এলো। এবার তিনি নৃত্য করতে লাগলেন আপন ভাবে, ভগবৎ প্রেমে উন্মত্ত হয়ে।
'যেন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাস মন্দিরে ভক্ত সঙ্গে নাচিতেছেন। সে অদ্ভুত নৃত্য। বঙ্কিমাদি ইংরাজী পড়া দেখিয়া অবাক। কি আশ্চর্য! এরই নাম কি প্রেমানন্দ! ঈশ্বরকে ভালবেসে মানুষ কি এত মাতোয়ারা হয়?··· সকলেই দণ্ডায়মান—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চারিদিকে—আর এক দৃষ্টে তাঁকে দেখিতেছেন।'
এযাবৎ যে প্রদীপ্ত ভাষণ বঙ্কিমচন্দ্র শুনেছিলেন, তা তাঁর অশ্রুত-পূর্ব। এখন যে সমাধিস্থ অবস্থা দেখলেন, তাও তাঁর অদৃষ্ট-পূর্ব। এবার কি কিছু অনুধাবন করেছেন ঠাকুরের মহিমা? এবার আর পরীক্ষার জন্যে লঘু কথা বললেন না। ঋজু ব্যক্তিত্বশালী, স্বয়ং অধ্যাত্ম-ভাবুক বঙ্কিম সরল জিজ্ঞাসুরূপে প্রশ্ন করলেন 'বিদ্যাবিহীন' পুরুষকে—'মহাশয়, ভক্তি কেমন করে হয়?'
'ব্যাকুলতা।'—শ্রীরামকৃষ্ণের তাৎক্ষণিক উত্তর। 'ছেলে যেমন মার জন্য মাকে না দেখতে পেয়ে দিশেহারা হয়ে কাঁদে, সেই রকম ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরের জন্য কাঁদলে ঈশ্বরকে লাভ পর্যন্ত করা যায়।'
আকাশপটে রবির আগমনীর দৃষ্টান্তও দিলেন কবির দৃষ্টিতে—'অরুণোদয় হলে পূর্বদিক লাল হয়, তখন বোঝা যায় যে, সূর্যোদয়ের দেরি নাই।

সেইরূপ যদি কারও ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে দেখা যায়, তখন বেশ বুঝতে পারা যায় যে, এ ব্যক্তির ঈশ্বর লাভের আর বেশি দেরি নাই।'

সে ব্যাকুলতা কেমন? তাও বুঝিয়ে দিলেন উপমা যোগে। উপমার অন্ত নেই তাঁর। একটু আগে গুরুর প্রসঙ্গ করেছিলেন। তাই হয়ত এখন দিলেন গুরু শিষ্যের এক উপমা। ব্যাকুলতার কি প্রাণবন্ত উদাহরণ: 'ঈশ্বর কেমন করে পাব?' একজন তার গুরুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। গুরু বললেন, 'এস, আমি তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি।' বলে তাকে একটি পুকুরের কাছে নিয়ে গেলেন। তুজনেই জলে নামতে, গুরু হঠাৎ শিষ্যকে চুবিয়ে ধরলেন জলে। একটু পরে ছেড়ে দিতেই শিষ্য মাথা তুলে হাঁফ ছাড়ল। গুরু জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি রকম মনে হচ্ছিল?' শিষ্য বললে, 'প্রাণ যায় বোধ হচ্ছিল, প্রাণ আটুপাটু করছিল।' তখন গুরু বললেন 'ঈশ্বরের জন্য যখন প্রাণ ঐরূপ আটুপাটু করবে, তখন জানবে যে, তাঁর সাক্ষাৎকারের দেরি নাই।'

গল্প শুনিয়ে বঙ্কিমকেই ভাবের নির্দেশ দিলেন—'তোমায় বলি, উপরে ভাসলে কি হবে? একটু ডুব দাও। গভীর জলের নীচে রত্ন রয়েছে, জলের উপর হাত পা ছু'ড়লে কি হবে?' যথার্থ জহুরীর মতন রত্নের স্থান নির্ণয় করলেন, 'ঠিক মাণিক ভারি হয়, জলে ভাসে না; তলিয়ে গিয়ে জলের নীচে থাকে। ঠিক মানিক লাভ করতে গেলে জলের ভিতর ডুব দিতে হয়।'

এমন সুভাষিতাবলী। তবু বঙ্কিম আবার বাঁকা কথা বললেন, পরিহাসের ভাবে—'মহাশয় কি করি, পেছনে শোলা বাঁধা আছে।' (শুনে সকলে হাসলেন)। 'ডুবতে দেয় না।'

একি তাঁরই স্বীকারোক্তি, আপন সচেতন অক্ষমতা?

পরম জ্ঞানে সে বাধারও নিরাকরণ করলেন ঠাকুর—'তাঁর স্মরণ করলে সব পাপ কেটে যায়। তাঁর নামেতে কাল পাশ কাটে। ডুব দিতে হবে, তা না হলে রত্ন পাওয়া যাবে না। একটা গান শোন—'

বলেই, তাঁর 'সেই দেবদুর্লভ মধুর কণ্ঠে' সেই অপূর্ব ভাবের গানখানি গাইতে লাগলেন—

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেমরত্নধন॥
খুঁজ খুঁজ খুঁজ খুঁজলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ দীপ দীপ জ্ঞানের বাতি জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ॥
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙে চালায় আবার সে কোন্ জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্, ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

'সভাসুদ্ধ লোক আকৃষ্ট হইয়া এক মনে এই গান শুনিতে লাগিলেন। গান সমাপ্ত হইলে আবার কথা আরম্ভ হইল।'

ঠাকুর বঙ্কিমের প্রতি অন্তর্দৃষ্টি করলেন কি?

কারণ তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, 'কেউ কেউ ডুব দিতে চায় না। তারা বলে, ঈশ্বর ঈশ্বর করে বাড়াবাড়ি করে শেষকালে কি পাগল হয়ে যাব? যারা ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত, তাদের তারা বলে, বেহেড হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এইসব লোকে এটি বোঝে না যে, সচ্চিদানন্দ অমৃত সাগর। তাই বলছি ডুব দাও। কিছু ভয় নাই, ডুবলে অমর হয়।'

ঈশ্বরপ্রেমের কি হৃদয়স্পর্শী, মর্মউৎসারী আহ্বান। কি অভয়। মহাভাবের ভাবুক চিত্ত, তবু কি বাস্তব-বোধ। নৈমিত্তিক সংসারগত প্রাণ যারা, তাদের উত্তরণের জন্যে কি আকুল আগ্রহ।

কিছুক্ষণ আগেই বঙ্কিম ঠাকুরকে প্রচার করতে বলেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরানুরাগ প্রচার তো ঘটা করে সভাসমিতির মাধ্যমে নয়, পত্র পত্রিকাতেও নয়। তাঁর নিত্য প্রচার। প্রাত্যহিক সমগ্র কথোপকথনে। তাঁর যাবতীয় প্রসঙ্গের ঈশ্বরীয় সঙ্গমে উপসংহারে। রত্ন মাণিক খচিত তাঁর দিব্য বাণীতে। আপন দৈবী ব্যক্তিত্বের দৃষ্টান্তে।

এবার আর বঙ্কিম কোন মন্তব্য করলেন না। তিনি বিদায় নেবেন এখন। প্রণাম করে বললেন, 'মহাশয়, যত আহম্মক আমাকে ঠাউরেছেন, তত নয়। একটি প্রার্থনা আছে—অনুগ্রহ করে কুটিরে একবার পায়ের ধুলো—

তাঁর কি তাহলে মনে হয়েছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে 'আহাম্মক' বা অর্বাচীন ধারণা করতে পারেন? যে ধরনের অকিঞ্চিৎকর মন্তব্য, মতামত তিনি নিজে প্রকাশ করেছিলেন, স্বয়ং তাহলে সচেতন ছিলেন সে বিষয়ে? পরীক্ষার জন্যেই কি সেই সব উক্তি? তাঁর প্রকৃত ধারণা সে প্রকার নয়?

বঙ্কিম-গৃহে যাবার আমন্ত্রণে ঠাকুর জানালেন—ভগবদ্ ইচ্ছায় তা হতে পারে—'তা বেশ তো, ঈশ্বরের ইচ্ছা।'

যদি সেখানে ভক্ত না থাকার সম্ভাবনায় শ্রীরামকৃষ্ণের উৎসাহ না হয়, তাই যেন বঙ্কিম তাঁকে আশ্বাস দিলেন, 'সেখানেও দেখবেন ভক্ত আছে।' শুনেই ঠাকুর সহাস্যে বললেন, 'কি গো! কিরকম সব ভক্ত সেখানে? যারা গোপাল গোপাল, কেশব কেশব বলেছিল, তাদের মত কি?'

একথায় সবাই হাসতে লাগলেন। একজন জানতে চাইলেন—গোপাল গোপাল গল্পটি কি?

হাসিমুখে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন—'এক জায়গায় একটি স্যাকরার দোকান আছে। তারা পরম বৈষ্ণব, গলায় মালা, তিলক সেবা, প্রায় হাতে হরিনামের ঝুলি আর মুখে সর্বদাই হরিনাম।...এই কথা শুনে অনেক খরিদ্দার তাদেরই দোকানে আসে; কেননা তারা জানে যে, এদের দোকানে সোনা-রূপা গোলমাল হবে না। খরিদ্দার দোকানে গিয়ে দেখে যে, মুখে হরিনাম করছে, আর বসে বসে কাজকর্ম করছে। খরিদ্দার যাই গিয়ে বসলো, একজন বলে উঠলো, 'কেশব! কেশব! কেশব!' খানিকক্ষণ পরে আর একজন বলে উঠলো, 'গোপাল! গোপাল! গোপাল!' আবার একটু কথাবার্তা হতে না হতেই আর একজন বলে উঠলো—'হরি! হরি! হরি!' গয়না গড়াবার কথা যখন একরকম ফুরিয়ে এলো, তখন আর একজন বলে উঠলো—'হর! হর! হর! হর!' কাজে কাজেই এত ভক্তি প্রেম দেখে তারা স্যাকরাদের কাছে টাকাকড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত হলো, জানে যে এরা কখনও ঠকাবে না।

কিন্তু কথা কি জানো? খরিদ্দার আসবার পর যে বলেছিল, 'কেশব! কেশব!' তার মানে এই, এরা সব কে? যে বললে, 'গোপাল! গোপাল!' তার মানে এই, এরা দেখছি গোরুর পাল। যে বললে, 'হরি! হরি!' তার মানে এই, যেকালে দেখছি গোরুর পাল, সে স্থলে তবে 'হরি' অর্থাৎ হরণ হরি। আর যে বললে, 'হর! হর!' তার মানে এই, যেকালে গোরুর পাল দেখছো, সেকালে সর্বস্ব হরণ কর। এই তারা পরম ভক্ত সাধু।'

গল্প শুনে সকলে হাসতে লাগলেন।

মুখে ধর্মের বুলি, কিন্তু অন্তরে ও ব্যবহারে অসাধু, এমন ভণ্ড ভক্ত বঙ্কিমের ওখানে আছে কি, এই রহস্য করলেন ঠাকুর?

বঙ্কিমচন্দ্র এই রসিকতার উত্তর দিলেন না। অন্যমনস্ক দেখা গেল তাঁকে। বিনা চাদরেই যাচ্ছিলেন, সেটি কক্ষে ফেলে রেখে। একজন চাদরখানি নিয়ে তাঁকে দরজার কাছে দিয়ে এলেন। কি চিন্তায় মগ্ন তিনি।

এতক্ষণ যেসব কথা শুনলেন, যাকে দেখলেন তা কি আলোড়িত করছিল তাঁর চিত্ত? এই বিস্ময়কর কথকের সামনে আপনাকে অপ্রতিভও ভাবছিলেন তিনি?

সরস্বতীর বরপুত্র বঙ্কিমচন্দ্র। বাংলা সাহিত্যে শুধু অপূর্ব উপন্যাস স্রষ্টা নন। জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা শাখায় কৃতাবদ্য। গ্রন্থকার মহা ধীমান প্রবন্ধ লেখক, সমালোচক। বঙ্গসাহিত্যের আচার্যস্থানীয়। মনস্বী ভাবুক শিল্পী। মানবচরিত্র ও জীবন সম্পর্কে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। স্বদেশীয় এবং ইউরোপীয় ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানচর্চায়ও সমকালীন অগ্রগতি পর্যন্ত সম্যক ব্যুৎপন্ন।

কিন্তু গ্রন্থ-বিধৃত বিদ্যাবিহীন সন্ন্যাসীর সঙ্গে বিচারে পর্যুদস্ত হলেন সেদিন (৫, ডিসেম্বর, ১৮৮৪)।

তার প্রায় এক যুগ পরের কথা। সেই আশ্চর্য সাধুর প্রধানশিষ্য নরেন্দ্র-নাথ তখন স্বামী বিবেকানন্দ রূপে অধ্যাত্ম চিন্তার ক্ষেত্রে আলোড়ন

তুলে পাশ্চাত্য দেশে দেশে ভ্রমণরত। কম্বুকণ্ঠে ভারতের বাণী প্রচারক আত্মপরিচয় দিয়েছেন ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যরূপে।

সেই পর্যায়ে একদিন আমেরিকায় Sages of India নামে বক্তৃতায় নিজের গুরুর সম্বন্ধে বললন—'He lived without any book learning whatsoever···but the most brilliant graduates of our Uuiversity found in him an intellectual giant.'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদি দুই স্নাতকদের অন্যতম বঙ্কিমচন্দ্র।

শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্কে বঙ্কিমের কি ধারণা হয়েছিল, তার কোন বিবরণ অপ্রাপ্য। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে ঠাকুরের একাধিক দিনের মন্তব্য 'কথামৃত'তেই প্রকাশিত আছে। প্রথমটি হল, ওই সাক্ষাৎকারের ছ' মাস পরের কথা (১৩ জুন, ১৮৮৫)।

তার কিছুদিন আগে বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রকাশিত হয়েছে 'প্রচার' পত্রিকায়।

সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ নেপালের ভক্ত বিশ্বনাথ উপাধ্যায় (তার সাদর সম্ভাষণের 'কাপ্তেন') প্রমুখের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে রয়েছেন। 'কথামৃত'কার জানাচ্ছেন—ভাগবত প্রসঙ্গে তখন ঠাকুরের প্রেমাবস্থা।

একজন ভক্ত (স্বয়ং শ্রীম) তাঁকে বললেন—'শ্রীযুক্ত বঙ্কিম কৃষ্ণচরিত্র লিখেছেন।'

ঠাকুর মন্তব্য করলেন—'বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণ মানে, শ্রীমতী মানে না।'

কি আশ্চর্য! তিনি কিভাবে জানলেন বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্প্রতিক প্রকাশিত এই মতামত? সেদিন তাঁর সঙ্গে কথোপকথনে তো রাধা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নি। কেউ তাঁর কাছে কি 'কৃষ্ণচরিত্র' পাঠ করেছিলেন আগে? কোন গ্রন্থপাঠ তাঁর নিকটে গুপ্ত মহেন্দ্রনাথই করতেন, অন্য নানা দিনের বিবরণে দেখা গেছে। অন্তত শ্রীম তাঁকে শোনান নি এ পুস্তকের পাঠ। তাহলে আজ আর বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র লেখার কথা উল্লেখ করতেন না।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র বিষয়ে একটি মূল ধারণার

কথা জেনেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

কাপ্তেন জিজ্ঞেস করলেন—(বঙ্কিম) 'বুঝি লীলা মানেন না ?'

ঠাকুর আরো জানালেন বঙ্কিম সম্পর্কে—'আবার বলে নাকি কামাদি—এসব দরকার।'

কাপ্তেন বললেন—'ঈশ্বর মানুষ হয়ে বৃন্দাবনে এসেছিলেন, রাধাকৃষ্ণ-লীলা, তা মানেন না ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে উত্তর দিলেন, ঈষৎ শ্লেষ যোগে—'ওসব কথা যে খবরের কাগজে নাই, কেমন করে মানা যায় ? ঈশ্বর মানুষ হয়ে লীলা করে বিশ্বাস করবো ? একথা যে ওদের ইংরেজী লেখাপড়ার ভিতর নাই।'

বঙ্কিমের বিদ্যার এবং জ্ঞানের অপূর্ণতার কথা স্পষ্টত বললেন। পূর্ণ-জ্ঞানী ঈশ্বরদ্রষ্টার বঙ্কিমচন্দ্রের খণ্ডিত চিন্তার হিসাব।

সেই একটি দিনের কথাবার্তা থেকেই ঠাকুর ধারণা করে রাখেন বঙ্কিমের সীমাবদ্ধতা। আর কি পুঙ্খানুপুঙ্খ স্মরণ শক্তি। সাক্ষাতের প্রায় এক বছর পরে কি অন্তরঙ্গ ভাবে স্মৃতিচারণ করছিলেন একদিন (২৬ অক্টোবর, ১৮৮৫)। এর মধ্যে কত বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গেই তিনি মিলিত হয়েছেন। কত অজস্র ভাষণ দিয়েছেন প্রত্যহ। কিন্তু এমনি এক এক বা একাধিক দিনে নানা বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত আর কথাবার্তার বিবরণ তার বহুকাল পরেও উল্লেখ করেছেন কথা প্রসঙ্গে। শুধু বঙ্কিম নন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, কেশবচন্দ্র সেন, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, কৃষ্ণদাস পাল, পদ্মলোচন তর্কালঙ্কার, দয়ানন্দ সরস্বতী, নারায়ণ শাস্ত্রী, গৌরীদাস পণ্ডিত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তোতা-পুরী, বৈষ্ণবচরণ, জয়নারায়ণ পণ্ডিত প্রমুখ অনেকের মৌখিক কথা তিনি অনেকদিন পরেও প্রাসঙ্গিক ভাবে প্রকাশ করেছেন।

বঙ্কিমের কোন কোন কথা নিয়েও স্মৃতিচারণ করলেন শেষোক্ত দিনে। তখন তাঁর ব্যাধি-জর্জর শরীর। শ্যামপুকুর বাড়িতে চিকিৎসার জন্যে রয়েছেন। দুপুরবেলা। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল, গিরিশচন্দ্র, শরৎ চক্রবর্তী (সারদানন্দ), শ্রীম, ছোট নরেন্দ্র প্রভৃতি উপস্থিত।

ডাক্তারকে বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'বঙ্কিম তোমাদের একজন পণ্ডিত। বঙ্কিমের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'মানুষের কর্তব্য কি? তা বল্লে, 'আহার নিদ্রা মৈথুন।' এই সব কথাবার্তা শুনে আমার ঘৃণা হল। বললুম যে, তোমার এ কিরকম কথা। তুমি তো বড় ছ্যাঁচড়া। যা রাতদিন চিন্তা করছ, কাজ করছ, তাই আবার মুখ দিয়ে বেরুচ্চে।'

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কথোপকথনের অনেকাংশ তিনি বিবৃত করলেন। মনে আছে সবই।

এ প্রসঙ্গের উপসংহারে আরেকটি তথ্য উল্লেখনীয়। বঙ্কিমচন্দ্র যে সেদিন ঠাকুরকে তাঁর গৃহে যাবার আমন্ত্রণ করেন, সেই সম্পর্কে। সে অনুরোধ অনুসারে শ্রীরামকৃষ্ণ যেন প্রতিনিধি-স্বরূপ পাঠিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র এবং শ্রীম-কে। তাঁরা দুজন বঙ্কিমের প্রতাপ চাটুজ্যে লেনের বাড়িতে আসেন। গৃহকর্তা তখন শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে অনেক কথাবার্তা বলেন গিরিশচন্দ্র ও শ্রীম-র সঙ্গে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে কথোপকথনের কোন বিবরণ পাওয়া যায় নি।

কিন্তু বিশেষ জ্ঞাতব্য ছিল সে বিষয়টি। কারণ গিরিশচন্দ্র এবং শ্রীম দুজনেই ঠাকুর সম্বন্ধে তাঁদের ধ্যান ধারণার কথা বলেছিলেন বঙ্কিমকে। একথাও মনে রাখা যায় যে, গিরিশচন্দ্র তাঁর 'দুর্গেশ নন্দিনী', 'কপাল-কুণ্ডলা,' 'মৃণালিনী' প্রভৃতি উপন্যাসের নাট্যরূপদাতা এবং তাদের প্রধান ভূমিকায় অভিনেতারূপে বঙ্কিমের সুপরিচিত, আস্থাভাজন ছিলেন। তাঁদের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে কেবল জানা গেছে যে, বঙ্কিম শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে পুনরায় আসবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তা আর ঘটে ওঠে নি, হয়ত ঠাকুরের পীড়া বৃদ্ধির জন্যে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গেও শ্রীরামকৃষ্ণের উচ্চমার্গের প্রসঙ্গ। তত্ত্ববিচার তাঁদের এই সাক্ষাৎকারও যথেষ্ট হয়েছিল। ঠাকুরের সব প্রসঙ্গেরই পরিণতি তত্ত্ব-কথায়, ভগবদ্ সমীপে। কিন্তু বিপরীত ভাবের

উক্তি করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। সেজন্যে বিতর্কের সূচনা হয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর তা করেন নি, যদিও তিনি ঈশ্বর প্রসঙ্গে নীরব, কিংবা সংশয়বাদীরূপে পরিচিত।

তাঁর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কথোপকথন যেমন দিব্য বাণীর প্রকাশ তেমনি উপভোগ্য। ঠাকুরের অলৌকিকী ক্ষমতা এবং বাকপটুতার এক দীপ্ত দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। সে আলাপচারির সূত্রপাত কি পরিপাটি রহস্য কৌতুকে। আর তেমনি সরস পরিহাসে তার পরিসমাপ্তি। মধ্যপর্বে বিস্তারিত কয়েকটি কঠিনতম প্রশ্নের হৃদয়গ্রাহী, সাবলীল ব্যাখ্যা। মানব জীবনের পরম লক্ষ্য সতেজ ভাষণে নির্ণীত, সত্যের আলোক-পাতে উদ্ভাসিত।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সুপটু আলাপী। তাঁর সঙ্গে ঠাকুরের ভাষণ ও প্রখর বুদ্ধি-প্রদীপ্ত উত্তর প্রত্যুত্তরে, বাকচাতুর্যে পূর্ণ।

বঙ্কিমের সঙ্গে যেমন দৃপ্ত প্রতিবাদমুখর হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ আপন বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করেন, এখানে তার প্রয়োজন হয় নি। ঈশ্বরীয় কথা পরিবেশন করেছেন অপরূপ মাধুর্যে। ব্রহ্মের স্বরূপও উদ্ঘাটন করে দিয়েছেন নিতান্ত আটপৌরে ভাষায়। কিন্তু গভীর প্রত্যয়ে এবং শ্রোতাদের পক্ষে প্রত্যয়যোগ্যতায়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিরীশ্বরবাদী বলেও কথিত। ভগবদ্ প্রসঙ্গে নিরুৎসুক তিনি। ভগবদ্-ভক্তি বর্জিত তো অবশ্যই। অপরপক্ষে, শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বর ভিন্ন 'গীত নাই।' যে কোন বিষয়ে সূচনা হোক, উপসংহারে অনিবার্যভাবে ভাগবতী প্রসঙ্গ। ঈশ্বরভক্তি প্রচারের জন্যে যেমন তাঁর ইহজগতে অবতরণ, তেমনি সর্ব ব্যক্তির সঙ্গে যাবতীয় আলাপন, দিবারাত্রির তাবৎ কথোপকথনে সেই ভাবের প্রকাশ। ঈশ্বরে অনাগ্রহী ঈশ্বরচন্দ্রকেও তিনি ভগবদ্ চিন্তার সূত্র নানাভাবে দিয়েছেন। অপূর্ব আন্তরিকতায় ভক্তিবাদ প্রচার করেছেন এমন নাস্তিকের নিকটেও।

বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পূর্ব-নির্ধারিত ছিল না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের

সঙ্গে তিনি দেখা করতে আসেন স্বেচ্ছায়। তাঁর পরম ভক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম) বিদ্যাসাগরের শ্যামপুকুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক। সেজন্যে মহেন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় ঠাকুর এসেছেন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে বাদুড়-বাগানে।

গুণীর বড় আদর করেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বিদ্যাসাগরের নানা গুণ। তাঁর মহৎ অন্তঃকরণ, অসাধারণ দান ও বিদ্যার কথা ঠাকুর অনেকদিন থেকে শুনেছেন। ঈশ্বর-ভক্তের সন্ধান পেয়ে যেমন সাক্ষাৎ করেন নামা ব্যক্তির সঙ্গে, তেমনি গুণবানের সঙ্গেও।

সেদিন (৫ আগস্ট, ১৮৮২) তাই তিনি বিদ্যাসাগর ভবনে উপস্থিত। সঙ্গে মাস্টার মহাশয় বা শ্রীম। •

বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) তখন পরিণত জীবন। বয়স প্রায় ৬৩ বছর। শ্রীরামকৃষ্ণের চেয়ে অন্তত ষোল বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি।

দেশে সমাজে সে সময় তাঁর নাম অতুল গৌরবে সমুজ্জ্বল। প্রবাদ-বাক্যের তুল্য তাঁর দয়া দাক্ষিণ্যের কথা প্রচারিত। তাঁর বিদ্যাবত্তা। শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অকাতর তৎপরতা ও দান। সমাজ সংস্কারে তন্নিষ্ঠ আত্মনিয়োগ। তাঁর অপ্রমেয় চরিত্রবল। সকলের সুপরিচিত—বহুকাঙ্ক্ষ সরকারী উচ্চপদ এক কথায় পরিত্যাগ, আত্মসম্মান রক্ষার জন্যে। সেই দুটি পদ, যার প্রত্যেকটির বেতন মাসিক পাঁচ শ টাকা। সে তো পঁচিশ বছর আগেকার কথা। তারপর আপন প্রচেষ্টায়, বিদ্যাচর্চার মাধ্যমে প্রচুর উপার্জনেরও দৃষ্টান্ত স্থাপন। সেজন্যে বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তকাবলী রচনা। 'সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি' প্রতিষ্ঠা, বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহযোগিতায়। সেই মুদ্রণালয় আর স্বরচিত গ্রন্থ সম্বন্ধে তাঁর আর্থিক স্বাচ্ছল্য অর্জন। আর কত দুঃস্থ সাধারণ, অনাথা, অনাত্মীয় আত্মীয় বান্ধবদের নিত্য সাহায্য সেই অর্থবলে। আর উড়িষ্যা, দক্ষিণ বাংলায় দুর্ভিক্ষকালীন তাঁর ভূমিকার কথাও সুবিদিত। সে সময় তিনি বিরাট অন্নসত্র খুলে দেন বীরসিংহ গ্রামে। ছ'মাসব্যাপী সার্বজনীন ভোজনের ব্যবস্থা করেন সেখানে। তার ক'বছর পরে 'হিন্দু ফ্যামিলী

অ্যান্যুয়িটি ফাণ্ড' প্রতিষ্ঠা করে এত পারিবারের দুর্দিনে তাঁর সহায়তা। দেশবাসী জানে তাঁর এমনি নানা মহৎ কীর্তির কথা। শ্রীরামকৃষ্ণও অনেক সৎ কাহিনী শুনেছেন তাঁর সম্পর্কে।

এত চরিত্রগুণের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাকপটুতাও বিলক্ষণ। হাস্য পরিহাস এবং সংলাপে নৈপুণ্যের জন্যেও পরিচিত মহলে চিহ্নিত। বিদ্বদ্ সমাজে বিশিষ্ট। সুহৃদ সঙ্গে সরস বাচনে তিনি কেন্দ্র-পুরুষরূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পৌরুষ, ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য, বৈদগ্ধ, হৃদয়বত্তা, করুণা, দাক্ষিণ্য প্রভৃতির সঙ্গে ঈষৎ অহং বোধও বিদ্যমান তাঁর চরিত্রে। মনস্বী কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য সেই সঙ্গে বিদ্যাসাগরের স্বভাবে দু-একটি দুর্বলতাও লক্ষ্য করেছেন,—'কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি তাঁহার রাজতক্তের নিকট আর কাহারও আসন হইতে পারে, একথা কল্পনা করিতেও পারিতেন না। তাঁহার এই literary jealousy সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।' কৃষ্ণকমল আরো জানিয়েছেন—'আমার দৃঢ় ধারণা যে বিদ্যাসাগরের সময়ে সময়ে আশঙ্কা হইত যে, পাছে আর কোনও বাঙ্গালীর 'সাহেবদের' কাছে তাঁহার চেয়েও বেশি প্রতিপত্তি হয়। পূর্বে আমি যে তাঁহার literary jealousyর কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহার মধ্যে যে এইরূপ একটা কারণ নিহিত ছিল না একথা বলা যায় না।...তাহার চরিত্রে এইটুকু দুর্বলতা ছিল, একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি।...তাঁহার বিদ্যাগৌরবে সাহেব সমাজে যে প্রতিপত্তি হইয়াছিল, তাহা তিনি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।' (পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃঃ ৩০, ৪৯-৫০—বিপিনবিহারী গুপ্ত সম্পাদিত, নব সংস্করণ)।

দক্ষিণেশ্বরের পুঁথিবিদ্যাবিহীন পরমহংসদেব সাক্ষাৎ পরিচয় করতে এলেন এ হেন ব্যক্তির সঙ্গে। তাঁর আগমন সংবাদে সে কক্ষে তখন বিদ্যাসাগরের কয়েকজন বন্ধুবান্ধব এসেছেন।

'আজ সাগরে এসে মিললাম,' বিদ্যাসাগরকে প্রথম সম্বোধন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর সুপরিচিত উপাধি নিয়েই দ্ব্যর্থ। অন্য অনেকের

তুলনায় তাঁর বিশালতার উপমা দিয়ে বললেন, 'এতদিন খাল বিল হৃদ নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখছি।'

কথার ধরনে এমন কৌতুক যে সবাই হেসে উঠলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সহাস্যে উত্তর দিলেন, বিনয় মিশ্রিত করে, 'তবে লোনা জল খানিকটা নিয়ে যান।'

এই রসিকতায়ও হাসলেন সবাই।

প্রত্তিবাদে কিন্তু তাঁর মহৎ গুণের কথাই ঠাকুর উল্লেখ করলেন চমৎকার উপমাযোগে, 'না গো ' লোনা জল কেন ? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর। তুমি ক্ষীর সমুদ্র।'

পুনরায় সকলে হাস্য করলেন।

বিদ্যাসাগর প্রচ্ছন্ন আত্মগরিমার সঙ্গে জানালেন, 'তা বলতে পারেন বটে।'

তারপর তিনি মৌন রইলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ মুখর হলেন অপরূপ ভাষণে।

বিদ্যা ও অবিদ্যার উল্লেখ তো আগেই করেছিলেন। এখন আরো উচ্চ গ্রামে নিয়ে গেলেন কথনীয় বিষয়বস্তুকে। সাত্ত্বিক কর্ম থেকে নিষ্কাম কর্মের প্রসঙ্গ। ঈশ্বর লাভের উপায়স্বরূপ বলে বর্ণনা করতে লাগলেন অন্তরঙ্গভাবে। বিদ্যাসাগরকেই রীতিমতো বিশ্লেষণ করে বললেন, বক্তব্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ—'তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম। সত্ত্বগুণ দয়া থেকে হয়। দয়ার জন্য যে কর্ম করা যায়, সে রাজসিক কর্ম বটে—কিন্তু এ রজোগুণ—সত্ত্বের রজোগুণ, এতে দোষ নাই। শুকদেবাদি লোক-শিক্ষার জন্য দয়া রেখেছিলেন—ঈশ্বর বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্য। তুমি বিদ্যাদান অন্ন দান করছো, এও ভাল। নিষ্কাম করতে পারলেই এতে ভগবান লাভ হয়। কেউ করে নামের জন্য, পুণ্যের জন্য, তাদের কর্ম নিষ্কাম নয়। আর সিদ্ধ তো তুমি আছই।'

নিষ্কাম কর্মের প্রসঙ্গে গেলেন না বিদ্যাসাগর। কেবল 'সিদ্ধ' কথাটি সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, 'মহাশয়, কেমন করে ?'

ঠাকুর সহাস্যে, কৌতুকের সঙ্গে বুঝিয়ে দিলেন, 'আলু পটল সিদ্ধ হলে তো নরম হয়, তা তুমি তো খুব নরম। তোমার অত দয়া।'

কিঞ্চিৎ বিনয়যোগে নিজেকে কঠিন বলতে চাইলেন ঈশ্বরচন্দ্র। হেসে বললেন, 'কলাই বাটা সিদ্ধ তো শক্তই হয়।'

তাঁর এই বিনতি সূচক রসিকতায় সকলে হাসলেন। কিন্তু অসামান্য পটুত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব ব্যাখ্যা করে দিলেন, 'তুমি [illegible] নয় গো, শুধু পণ্ডিতগুলো দরকচা পড়া! না এদিক না ওদিক। [illegible] খুব উঁচুতে উঠে, তার নজর ভাগাড়ে। যারা শুধু পণ্ডিত, শুনতেই পণ্ডিত, কিন্তু তাদের কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি,—শকুনির মতো পচা মড়া খুঁজছে। আসক্তি অবিদ্যার সাগরে। দয়া ভক্তি, বৈরাগ্য বিদ্যার ঐশ্বর্য।'

এমনি তটিনী ধারায় নির্গলিত হয়ে চলে তাঁর সুভাষিতাবলী। নিবাক হয়ে শুনছেন বিদ্যাসাগর। কক্ষপূর্ণ 'সকলেই একদৃষ্টে···এই আনন্দময় পুরুষকে দর্শন ও তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন।'

বিদ্যা ও অবিদ্যার প্রসঙ্গ করে ঠাকুর একেবারে ব্রহ্মের তত্ত্ব উত্থাপন করলেন। ব্রহ্মজ্ঞানের কথা।

সরলতম ভাষায়, এক বাক্যে, কঠিনতম বস্তুর ধারণা দিলেন, 'ব্রহ্ম—বিদ্যা ও অবিদ্যার পার। তিনি মায়াতীত।'

পরম জ্ঞানের দিব্য বাণী। তাঁর উপলব্ধ সত্য স্বচ্ছভাবে শ্রোতাদের অন্তরে নিবিষ্ট করে দিতে লাগলেন। ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে লাগলেন অনায়াসে, অতি সুবোধ্য উপমার মাধ্যমে,—'এই জগতে বিদ্যামায়া অবিদ্যামায়া দুই আছে, জ্ঞান ভক্তি আছে, আবার কামিনী কাঞ্চনও আছে, সৎ অসৎও আছে। ভালও আছে আবার মন্দও আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। ভাল মন্দ জীবের পক্ষে, সৎ অসৎ জীবের পক্ষে, তাঁর ওতে কিছু হয় না।

যেমন প্রদীপের সম্মুখে কেউ ভাগবত পড়ছে, আর কেউ বা জাল করছে। প্রদীপ নির্লিপ্ত।

সূর্য শিষ্টের উপর আলো দিচ্ছে, আবার দুষ্টের উপরও দিচ্ছে।'

এই প্রসঙ্গে সাধারণের মনে একটি সংশয় জাগে।

তিনি সেই অনুসারে তার আগাম নিরাকরণ করলেন, তাও উপমা প্রয়োগে—'যদি বল দুঃখ, পাপ, অশান্তি এ সকল তবে কি? তার উত্তর এই যে, ও সকল জীবের পক্ষে। ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। সাপের ভিতর বিষ আছে, অন্যকে কামড়ালে মরে যায়। সাপের কিন্তু কিছু হয় না।'

এইভাবে ব্যাখ্যার পর ব্রহ্মের চূড়ান্ত পরিচয় দিলেন—'ব্রহ্ম যে কি, মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়দর্শন, সব এঁটো হয়ে গেছে।' এঁটো হবার একেবারে প্রাকৃত অর্থ বললেন মুখে পড়া হয়েছে 'মুখে উচ্চারণ হয়েছে—তাই এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে জিনিসটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি তা আজ পর্যন্ত কেউ মুখে বলতে পারে নাই।'

বিদ্যাসাগর চমৎকৃত হলেন একথা শুনে। এতক্ষণ পরে মৌন ভঙ্গ করলেন। এবার তাঁকে স্বীকার করতে হল, আজ একটি নতুন কথা শিখলেন তিনি।

বন্ধুদের বললেন, 'বা! এটি তো বেশ কথা। আজ একটি নূতন কথা শিখলাম।'

শুধু অভিনব কেন? এত গভীর তত্ত্বকথা এমন প্রাঞ্জলভাবে আর কেউ ইতিপূর্বে বলেছেন কি?

বিদ্যাসাগর উপাধি ঈশ্বরচন্দ্র পেয়েছিলেন তখন থেকে সুদীর্ঘ তেতাল্লিশ বছর আগে। অর্থাৎ ১৮৩৯ সালে। তার পরেও এতকালের বিদ্যাচর্চার শেষে তাঁকে এক অপূর্ব প্রজ্ঞার নতুন বাণী শোনালেন ঈশ্বরজানিত পুরুষ। যে ঈশ্বরের অস্তিত্বে তিনি নিজে সংশয়ী কিংবা অনুৎসুক।

কেবল সেই অভাবিত জ্ঞানের কথা বলা-ই নয়। তৎক্ষণাৎ সেই ভাবের প্রতিপাদ্য একটি গল্পও মুখে মুখে শুনিয়ে দিলেন ঠাকুর।—এক বাপের দুটি ছেলে। ব্রহ্ম বিদ্যা শিখতে তিনি ছেলে দুটিকে আচার্যের হাতে দিলেন। কয়েক বছর পরে তারা ফিরে এলো গুরুগৃহ থেকে।

তিনি বড় ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন—'তুমি তো সব পড়েছ, ব্রহ্ম কিরূপ বল দেখি ? সে বেদ থেকে নানা শ্লোক বলে বলে ব্রহ্মের স্বরূপ বোঝাতে লাগল। তারপর তিনি যখন ছোট ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, সে চুপ করে রইল হেঁটমুখে। একটি কথাও উচ্চারণ করলে না। বাপ তখন প্রসন্ন হয়ে ছোট ছেলেকে বললেন, 'বাপু! তুমিই একটু বুঝেছ। ব্রহ্ম যে কি, তা মুখে বলা যায় না।'

'মানুষ মনে করে আমরা তাঁকে জেনে ফেলেছি।'

বলে, ব্রহ্মের অজ্ঞেয়তার কথা পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণ গল্পাকারে উপমা দিয়ে বললেন, 'একটি পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গিছলো। চিনির একদানা খেয়েই তার পেট ভরে গেল। আর একদানা মুখে করে বাসায় ফিরতে লাগল। যাবার সময় ভাবছে,—এবার এসে সব পাহাড়টি লয়ে যাবে। ক্ষুদ্র জীবেরা এইসব মনে করে। জানে না ব্রহ্ম বাক্য মনের অতীত।'

সবই শাস্ত্রবাক্য। অথচ আশ্চর্য এই যে, কথক সেসব শাস্ত্র আদৌ পাঠ করেন নি। সমস্ত বাণী উৎসারিত হয়ে আসছে পূর্ণজ্ঞানের উৎস থেকে, —'যে যতই বড় হউক না কেন, তাঁকে কি জানবে? শুকদেবাদি না হয় ডেও পিঁপড়ে—চিনির আট দশটা দানা না হয় মুখ করুক।'

আরো, বুঝিয়ে বলতে লাগলেন—ব্রহ্ম কেমন সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ। নির্বিকল্প সমাধি আর ব্রহ্ম-জ্ঞানের কথা উল্লেখ করলেন। আভাস দিলেন বেদ পুরাণের বক্তব্যেরও, সর্বজন বোধ্য ভাষায়।

বিদ্যাসাগর প্রমুখ সকলে বাক্যহীন হয়ে সেই অশ্রুতপূর্ব ব্যাখ্যা শুনতে লাগলেন।

'তবে বেদ পুরাণে যা বলেছে—সে কিরকম বলা জান ? একজন সাগর দেখে এলে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে কেমন দেখলে, সে লোক মুখ হাঁ করে বলে—'ও! কি দেখলুম! কি হিল্লোল কল্লোল!' ব্রহ্মের কথাও সেইরকম। বেদে আছে—তিনি আনন্দস্বরূপ—সচ্চিদানন্দ। শুকদেবাদি এই ব্রহ্মসাগর তটে দাঁড়িয়ে দর্শন স্পর্শন করেছিলেন। এক মতে

আছে—তাঁরা এ সাগরে নামেন নাই। এ সাগরে নামলে আর ফিরবার যো নাই।'

তারপর কি অবস্থায় ব্রহ্ম জ্ঞান হয়, সে কথা বললেন। তাও সুদুর্লভ কথন।

'সমাধিস্থ হলে ব্রহ্ম জ্ঞান হয়, ব্রহ্ম দর্শন হয়—সে অবস্থায় বিচার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, মানুষ চুপ হয়ে যায়। ব্রহ্ম কি বস্তু মুখে বলবার শক্তি থাকে না। নূনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছলো।'

কথার ধরনে সবাই হাসতে লাগলেন। এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বকথার মধ্যেও সকলকে হাসাচ্ছেন বাকচাতুর্যে। এও এক আশ্চর্য লক্ষণীয় শক্তি তাঁর। 'কত গভীর জল তাই খপর দেবে। খপর দেয়া আর হল না। যাই নামা অমনি গলে যাওয়া। কে আর খপর দিবেক?'

এতক্ষণ শোনবার পর একজন প্রশ্ন করলেন, 'সমাধিস্থ ব্যক্তি, যাঁর ব্রহ্ম জ্ঞান হয়েছে তিনি কি আর কথা কন না?'

প্রশ্নকর্তা নিশ্চয় ভেবে দেখেন নি, কি অসম্ভব কঠিন এই জিজ্ঞাস্য বিষয়। ব্রহ্মজ্ঞানী ভিন্ন একথার উত্তর দেবেন কে? সমাজ সংসারে এমন ব্রহ্মজ্ঞানী দেখা যায় কদাচিৎ।

এখন যিনি সদুত্তর দিলেন, তাঁর স্বরূপ কি উপলব্ধি করতে পারলেন উপস্থিত কোনো ব্যক্তি?

এমন জিজ্ঞাসারও উত্তর তিনি তখনি দিলেন, বিদ্যাসাগর প্রমুখের দিকে চেয়ে, উদাহরণ সহযোগে—কিছুমাত্র চিন্তা করতে হল না—'শঙ্করাচার্য লোকশিক্ষার জন্য বিদ্যার 'আমি' রেখেছিলেন। ব্রহ্ম দর্শন হলে মানুষ চুপ হয়ে যায়। যতক্ষণ দর্শন না হয় ততক্ষণই বিচার। ঘি কাঁচা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই কলকলানি। পাকা ঘির কোন শব্দ থাকে না। কিন্তু যখন আবার পাকা ঘিয়ে কাঁচা লুচি পড়ে—তখন আর একবার ছ্যাঁক কল্‌কল্ করে। যখন কাঁচা লুচিকে পাকা করে, তখন আবার চুপ হয়ে যায়। তেমনি সমাধিস্থ পুরুষ লোকশিক্ষা দিবার জন্য আবার নেমে আসে, আবার কথা কয়।'

তেমন একজন যে সশরীরে সর্বসমক্ষে উপস্থিত, স্বয়ং কথক। কিন্তু বিদ্যাসাগর প্রমুখের তা ধারণার অতীত। ভাষ্যকার আরেকটি লৌকিক উপমাযোগে সেই অলৌকিক অবস্থা বর্ণনা করলেন—

'যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে, ততক্ষণ ভন্ ভন্ করে। ফুলে বসে মধু পান আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। ·'

শ্রীরামকৃষ্ণ একক বক্তা। পরম জ্ঞানের প্রসঙ্গ, ব্রহ্ম জ্ঞানের আরো কথা তিনি বলে চলেছেন। আর কোনো প্রশ্ন নেই কারো মুখে। স্তব্ধবাক শুনছেন সবাই। আলাপচারীতে সুদক্ষ, বিদগ্ধ বিদ্যাসাগরও সাধারণ শ্রোতায় পরিণত।

'ঋষিদের ব্রহ্মজ্ঞান হযেছিল। বিষয বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে এই ব্রহ্ম-জ্ঞান হয না।'

এবার বলতে লাগলেন ঋষিদের কথা। আর তাও এমন অন্তরঙ্গভাবে যেন মুনিদের আশ্রম জীবন তাঁর প্রত্যক্ষ গোচর। ঈশ্বর দৃষ্ট পুরুষের সর্বাত্মক জ্ঞান। যে প্রসঙ্গই করেন, তার সমগ্র রূপটি তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত দেখা যায। তাই পুরাকালের আশ্রমিক ঋষিদের পরিচয় দিলেন কি গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে—

'ঋষিরা কত খাটত। সকাল বেলা আশ্রম থেকে চলে যেত। একলা সমস্ত দিন ধ্যান চিন্তা করত, রাত্রে আশ্রমে ফিরে এসে কিছু ফলমূল খেত। দেখাশুনা, ছোঁয়া এসবের বিষয় থেকে মনকে আলাদা রাখত তবে ব্রহ্মকে বোধে বোধ করত।'

নির্গলিত অর্থের কি সরল প্রকাশ, তাঁর নিজস্ব ভাষায়—ব্রহ্মকে বোধে বোধ করা।

পুনরায় সমকালের বক্তব্যে ফিরে এলেন। ব্যাখ্যা করতে লাগলেন—এযুগে মুক্তির উপায়—ভক্তির পথে। আবার দেখালেন—বিচারের পথ, জ্ঞানীর পথও সত্য। জ্ঞান যোগ, ভক্তিযোগ সব পথেই ঈশ্বর লাভ সম্ভব। তবু কলিকালে ভক্তিপথ সরল, সহজসাধ্য—বিশেষ সাধারণের পক্ষে। একথাও জানিয়ে দিলেন স্পষ্টভাবে—'কলিতে অন্নগত প্রাণ

দেহবুদ্ধি যায় না। এ অবস্থায় সোঽহং বলা ভালো নয়। সবই করা যাচ্ছে, আবার 'আমিই ব্রহ্ম' বলা ঠিক নয়। যারা বিষয় ত্যাগ করতে পারে না, যাদের 'আমি' কোনমতে যাচ্ছে না, তাদের 'আমি দাস' 'আমি ভক্ত' এ অভিমান ভাল। ভক্তিপথে থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়।'

অন্তরের কি সহানুভূতি সর্বসাধারণের জন্যে। কি দরদে সকলের পক্ষে মুক্তির সহজ পথ নির্দেশ করলেন। কি পরম আশ্বাসের বাণী।

আবার জ্ঞান বিচারের পথও তেমনি সত্য। জ্ঞানীর ঈশ্বর লাভ সেই মার্গে। তারও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করে দিলেন। প্রতিষ্ঠিত করলেন বিরাট তত্ত্বকে। অথচ কি নিতান্ত ঘরোয়া উপমার প্রয়োগ :

'জ্ঞানী নেতি নেতি করে বিষয় বুদ্ধি সব ত্যাগ করে, তবে ব্রহ্মকে জানতে পারে। যেমন সিঁড়ির ধাপ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ছাদে পৌঁছানো যায়। কিন্তু বিজ্ঞানী যিনি বিশেষরূপে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন তিনি আরও কিছু দর্শন করেন। তিনি দেখেন, ছাদ যে জিনিসে তৈয়ারি সেই ইট চুন সুরকিতেই সিঁড়িও তৈয়ারি। 'নেতি' 'নেতি' করে যাঁকে ব্রহ্ম বলে বোধ হয়েছে তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন। বিজ্ঞানী দেখে, যিনি নির্গুণ তিনিই সগুণ।'

এমনিভাবে বেদান্তের একটি মহাকাব্য শোনালেন 'নেতি' 'নেতি'র কথায়।

আবার অভেদ তত্ত্ব, বিজ্ঞানবাদ অপরূপভাবে বুঝিয়ে দিলেন। আর প্রতিটি বক্তব্যেই তাঁর উপমা যোগ। এবার মনোরম উপমা হল— সঙ্গীতের সপ্তকে বা সাত স্বরের ক্রম আরোহণে—

'ছাদে অনেকক্ষণ লোকে থাকতে পারে না, আবার নেমে আসে। যারা সমাধিস্থ হয়ে ব্রহ্ম দর্শন করেছেন, তাঁরাও নেমে এসে দেখেন যে, জীব জগৎ তিনিই হয়েছেন। সা রে গা মা পা ধা নি। 'নি' তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না। 'আমি' যায় না, তখন দেখে, তিনিই আমি, তিনিই জীব জগৎ সব। এরই নাম বিজ্ঞান।'

আর সেই মহা সমন্বয়ের উদাত্ত বাণী ধ্বনিত হল। সেই উদারতম নিদে
শিকা—বরাভয়—

জ্ঞানীর পথও পথ। জ্ঞানভক্তির পথও পথ। আবার ভক্তির পথও পথ
জ্ঞানযোগও সত্য; ভক্তিযোগও সত্য। সব পথ দিয়ে তাঁর কাছে
যাওয়া যায়। তিনি যতক্ষণ 'আমি' রেখে দেন, ততক্ষণ ভক্তিপথই
সোজা।

কবি সাহিত্যিকের সমৃদ্ধ ভাষায় চরম জ্ঞানের বর্ণনা করলেন, 'বিজ্ঞানী
দেখে যিনিই ব্রহ্ম তিনিই ভগবান; যিনিই গুণাতীত, তিনিই ষড়ৈশ্বর্য
পূর্ণ ভগবান। এই জীবজগৎ, মন বুদ্ধি, ভক্তি বৈরাগ্য, জ্ঞান এ সব তাঁর
ঐশ্বর্য।'

জ্ঞানের, ভাবের, উপলব্ধির এই উত্তুঙ্গ শিখর থেকে আবার এক
কথায় ভূমিতে নেমে এলেন।

এমন পরম তত্ত্বকথার মধ্যে একটি কৌতুককর উপমা দিলেন সহাস্যে
—'যে বাবুর ঘরদ্বার নাই, হয়তো বিকিয়ে গেল, সে বাবু কিসের
বাবু।'

এই পরিহাস সবাই বেশ উপভোগ করলেন।

উপমাটির সূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিয়ে বললেন মূল বক্তব্য—'ঈশ্বর ষড়ৈশ্বর্য
পূর্ণ। সে ব্যক্তির যদি ঐশ্বর্য না থাকতো তাহলে কে মানতো।'
কথ্যভঙ্গীতে আবার সকলে হাসতে লাগলেন।

প্রসঙ্গত বলা যায়, 'ঐশ্বর্য' শব্দের উৎপত্তিও ঈশ্বর থেকে।

এখন বৈঠকী গল্পের ধরনে কি সহজে ভগবানের সেই ঐশ্বর্যের বর্ণনা
করলেন—'দেখ না, এই জগৎ কি চমৎকার। কত রকম জিনিস—চন্দ্র
সূর্য তারা। কত রকম জীব। বড় ছোট ভাল মন্দ, কারু বেশি শক্তি
কারু কম শক্তি।'

এতক্ষণ পরে বিদ্যাসাগর একটি কথা বললেন। প্রশ্নের আকারে
প্রতিবাদ যেন, 'তিনি কাউকে বেশি শক্তি কাউকে কম শক্তি
দিয়েছেন?'

ঈশ্বর কর্তৃক এই শক্তিদানের তারতম্যে তিনি যেন অবিশ্বাসী। সাধারণ মানুষের যেমন ধারণা।

এ ভ্রম শ্রীরামকৃষ্ণ অকাট্যভাবে দেখালেন—'তিনি বিভুরূপে সব ভূতে আছেন। পিঁপড়েতে পর্যন্ত। কিন্তু শক্তি বিশেষ। তা না হলে একজন লোকে দশজনকে হারিয়ে দেয়, আবার কেউ একজনের কাছ থেকে পালায়।'

সাক্ষাৎ বিদ্যাসাগরকেই দৃষ্টান্ত মানলেন, সহাস্যে—'আর তা না হলে তোমাকেই বা সবাই মানে কেন? তোমার কি শিং বেরিয়েছে দুটো?'

অন্য অনেকের তুলনায় বিদ্যাসাগরের মধ্যে কেন ঈশ্বরের শক্তির অধিক প্রকাশ্য—তার উদাহরণস্বরূপ বললেন, 'তোমার দয়া, তোমার বিদ্যা আছে—অন্যের চেয়ে, তাই তোমাকে লোকে মানে, দেখতে আসে। তুমি একথা মানো কিনা?'

প্রথম পরিচয়েই কথায় কি অন্তরঙ্গতার সুর। সেই সঙ্গে আপন যুক্তিকে সতেজে প্রতিষ্ঠা করা। তর্কশক্তিতেও দুর্জয় ঠাকুর, এমন মনস্বীর সঙ্গে বিচারেও।

বিদ্যাসাগর আপন বক্তব্যের সপক্ষে কিছু বলতে অক্ষম হলেন। মৃদু হাসতে লাগলেন কেবল।

নিজের শক্তির স্বীকৃতিতে হয়ত আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন অন্তরে। কিন্তু তাঁর প্রতিবাদ পরাস্ত হল। আপন বক্তব্যের সমর্থনে আর কোনো যুক্তি দিতে পারলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ এবার একটি মূল সত্যের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করলেন সকলের—বিদ্যাসাগর মহাপণ্ডিত জেনেও বললেন, 'শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু নাই। তাঁকে পাবার উপায়, তাঁকে জানবার জন্যই বই পড়া।'

আবার গীতার মুখ্য শিক্ষা একটি বাক্যে বলে দিলেন—ভগবদ্ আহ্বান যেন 'হে জীব, সব ত্যাগ করে ভগবানকে লাভ করবার চেষ্টা কর। সাধুই হোক, সন্ন্যাসীই হোক, মন থেকে সব আসক্তি ত্যাগ করতে হয়।...'

ভক্তিযোগের বিষয়ে বললেন শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ উল্লেখ করে। চৈতন্যদেব সম্পর্কে তাঁর কি অন্তরঙ্গ ধারণা ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের দিব্য জীবনকথা, তাঁর মহাভাব, তাঁর নৃত্য, তাঁর নানা ঘটনাবলী, তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে বাণী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন নানা দিনে, নানা প্রসঙ্গে। প্রত্যক্ষ দ্রষ্টার তুল্য প্রাণবন্ত তাঁর বর্ণনা।

শ্রীচৈতন্যের দক্ষিণ দেশে পরিভ্রমণের সময় সেই পূর্ণ বিশ্বাসী ভক্তের উদাহরণ এখানে দিলেন। গীতা পড়ছে একজন। আরেকজন শুনছে আর ভক্তিতে কাঁদছে—সেই গল্প।

তারপর আবার ব্যাখ্যা করতে লাগলেন ভক্তি যোগের রহস্য, 'বিজ্ঞানী কেন ভক্তি লয়ে থাকে? এর উত্তর এই যে 'আমি' যায় না। সমাধি অবস্থায় যায় বটে, কিন্তু আবার এসে পড়ে। আর সাধারণ জীবের 'অহং' যায় না। যেমন অশ্বত্থ গাছ। কেটে দাও আবার তারপর দিন ফেঁকড়ি বেরিয়েছে।'

আরো একাধিক উপমা দিলেন। তারপর জানালেন সিদ্ধান্ত—'সেব্য সেবক ভাবই ভাল। 'আমি' তো যাবার নয়। সুতরাং 'দাস আমি' থাকাই ভাল।'

বিদ্যাসাগর শুনছেন নির্বাক হয়ে। তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী নন বলে প্রসিদ্ধি। কিন্তু এমন একান্ত ঈশ্বর ভক্তির কথায় কোনো সমালোচনা করছেন না। কোনো ত্রুটি দেখাচ্ছেন না ঠাকুরের বক্তব্য পরম্পরায়। শ্রীরামকৃষ্ণ যেভাবে বলে চলেছেন, তা বিদ্যাসাগরেরই উদ্দেশে। বস্তুত তাঁকেই যেন শিক্ষা দিচ্ছেন।

'আমি ও আমার—এই দুটি অজ্ঞান। 'আমার বাড়ি,' 'আমার টাকা,' 'আমার বিদ্যা,' 'আমার এই সব ঐশ্বর্য,' এই যে ভাব, এটি অজ্ঞান থেকে হয়। 'হে ঈশ্বর তুমি কর্তা আর এসব তোমার জিনিস'—এ ভাব জ্ঞান থেকে হয়।'

ঈশ্বরকে লাভ করবার উপায়, তাঁকে জানবার উপায় বিশ্বাস ও ভক্তি। একথা আবার জানাবার জন্যে বললেন, 'তাঁকে কি বিচার করে জানা

যায় ? তাঁর দাস হয়ে তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁকে ডাক।'
এমনি অনর্গল কথার মধ্যে একবার থামলেন।
সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন বিদ্যাসাগরকে, 'আচ্ছা, তোমার কি ভাব ?'
বিদ্যাসাগর নিজের কথা বললেন না, এড়িয়ে গেলেন। তিনি কি বুঝেছিলেন যে এমন অসামান্য ঈশ্বরপ্রেমীর কাছে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ বৃথা ?
উত্তরে বললেন, 'আচ্ছা সেকথা আপনাকে একলা একলা একদিন বলব।'
শ্রীরামকৃষ্ণ আবার যেন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন—'তাঁকে পাণ্ডিত্য দ্বারা বিচার করে জানা যায় না।'
আর সুরহীন বাক্যে নয়। বাণী এবার ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলো সঙ্গীতে—

কে জানে গো কালী কেমন ?
ষড়দর্শনে না পায় দরশন ॥
মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন।
কালী পদ্মবনে হংসাসনে, হংসীরূপে করে রমণ ॥
আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥
মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম, অন্য কেবা জানে তেমন ॥
প্রসাদ ভাবে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু তরণ।
আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন ॥

গানখানি গেয়ে, বুঝিয়ে বলছেন—'পাণ্ডিত্যে তাঁকে পাওয়া যায় না। বিশ্বাস আর ভক্তি চাই—বিশ্বাসের কত জোর শুন।' বলে, লঙ্কা থেকে সমুদ্র পার হওয়ার সেই গল্পটি শোনালেন।
আবার বললেন, 'যদি তাঁতে বিশ্বাস থাকে, তা হলে পাপই করুক, আর মহাপাতকই করুক, কিছুতেই ভয় নাই।'
এবার গান গেয়ে উঠলেন বিশ্বাসের মাহাত্ম্য বিষয়ে—ভক্তের ভাব

আরোপ করে, ভাবে মাতোয়ারা হয়ে গাইতে লাগলেন—

আমি 'দুর্গা দুর্গা' বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী॥
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপান আদি বিনাশি নারী।
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, ব্রহ্ম পদ নিতে পারি॥

গানটি শেষ করে বললেন—'বিশ্বাস আর ভক্তি। তাঁকে ভক্তিতে সহজে পাওয়া যায়। তিনি ভাবের বিষয়।'

বলতে বলতে আবার ঠাকুর আরম্ভ করলেন গান—তাঁর প্রিয় মাতৃ-সাধক রামপ্রসাদের সেই মহাভাবের গানখানি—

'মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধরতে পারে॥
অগ্রে শশী বশীভূত কর তব শক্তি সায়ে।
ওরে কোঠার ভিতর চোর-কুঠরী, ভোর হলে সে লুকাবে রে॥
ষড়দর্শনে না পায় দরশন আগম-নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তি রসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥
সে ভাব লাগি পরম যোগী, যোগ করে যুগ-যুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চুম্বকে ধরে॥
প্রসাদ বলে, মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি, বোঝ না রে মন ঠারে-ঠোরে॥'

তাঁর সঙ্গীত একেবারে স্বতঃস্ফূর্ত, কথারই মতন। ভাবে বিভোর হয়ে গানখানি গাইলেন। আর তা শেষ হবার সঙ্গেই 'ঠাকুর সমাধিস্থ··· হাত অঞ্জলিবদ্ধ! দেহ উন্নত ও স্থির! নেত্রদ্বয় স্পন্দহীন। সেই বেঞ্চের উপর পশ্চিমাস্য হইয়া পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন। সকলে উদ্গ্রীব হইয়া এই অদ্ভুত অবস্থা দেখিতেছেন। পণ্ডিত বিদ্যাসাগরও নিস্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন।'

বঙ্কিমের মতন তিনিও সম্ভবত আর কারো সমাধিস্থ অবস্থা দেখেন নি। ঠাকুর আবার 'প্রকৃতিস্থ' হয়ে কথা আরম্ভ করলেন হাসিমুখে—'ভাব

ভক্তি, এর মানে—তাঁকে ভালবাসা। যিনিই ব্রহ্ম তাকেই 'মা' বলে ডাকছে।'

বলে, ওই গানেরই রামপ্রসাদী ভনিতায় কলিটি আরেকবার শোনালেন—

প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে।

সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি বোঝ না রে মন ঠারে-ঠোরে॥

তারপর রামপ্রসাদের জবানীতেই ব্যাখ্যা করলেন—'রামপ্রসাদ বলছে—'ঠারে ঠোরে' বুঝতে। এই বুঝতে বলছে যে বেদে যাঁকে ব্রহ্ম বলেছে—তাঁকেই আমি 'মা' বলে ডাকছি। যিনিই নির্গুণ, তিনিই সগুণ; যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। যখন নিষ্ক্রিয় বলে বোধ হয়, তখন তাঁকে 'ব্রহ্ম' বলি। যখন ভাবি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন তখন তাঁকে আদ্যাশক্তি বলি, কালী বলি।'...

সেই অভেদ তত্ত্ব। ব্রহ্ম আর লীলা অবিভাজ্য, অন্তরঙ্গ। সেই পরম তত্ত্বকে বিচারে প্রতিষ্ঠিত করলেন—'যেমন অগ্নি আর দাহিকা শক্তি, অগ্নি বললেই দাহিকাশক্তি বুঝা যায়; দাহিকাশক্তি বললেই অগ্নি বুঝা যায়; একটিকে জানলেই আর একটিকে জানা হয়ে যায়।'

আবার, রামপ্রসাদের মতন, 'তাঁকেই 'মা' বলে ডাকা হচ্ছে। 'মা' বড় ভালবাসার জিনিস কিনা। ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারলেই তাঁকে পাওয়া যায়। ভাব ভক্তি ভালবাসা আর বিশ্বাস।'

ঈশ্বরপ্রেমকে একেবারে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এনে দিলেন। আগে বিশ্বাস, তারপর ভক্তি। সেই ভাব ধ্বনিত করে তুললেন সঙ্গীতে।

'আর একটা গান শোন' বলে, গাইতে লাগলেন—

ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।

(ও সে) যেমন ভাব, তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়॥

কালীপদ সুধা হ্রদে, চিত্ত যদি রয় (যদি চিত্ত ডুবে রয়)।

তবে পূজা, হোম, যাগ যজ্ঞ, কিছুই কিছু নয়॥

তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বললেন, 'চিত্ত তদ্‌গত হওয়া, তাঁকে খুব ভালবাসা।

'সুধা হ্রদ' কিনা অমৃতের হ্রদ। ওতে ডুবলে মানুষ মরে না। অমর হয়। কেউ কেউ মনে করে বেশি ঈশ্বর ঈশ্বর করলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। তা নয়। এ যে সুধার হ্রদ। অমৃতের সাগর। বেদে তাঁকে 'অমৃত' বলেছে, এতে ডুবে গেলে মরে না--অমর হয়।'

প্রাসঙ্গিকভাবে আরো কিছু বললেন, উপমাও দিলেন।

তারপর উত্থাপন করলেন নিষ্কাম কর্মের প্রসঙ্গ। কর্মযোগের কথা।

বিদ্যাসাগরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তুমি যেসব কর্ম করছো, এ সব সৎ-কর্ম। যদি 'আমি কর্তা' এই অহঙ্কার ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে করতে পারো তাহলে খুব ভাল। এই নিষ্কাম কর্ম করতে করতে ঈশ্বরেতে ভক্তি ভালবাসা আসে। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম করতে করতে ঈশ্বর লাভ হয়।'

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তখন প্রবীণ বয়সী। ষাট পার হয়ে গেছেন দু তিন বছর আগে। সে সময় তিনি যশে বিদ্যায় প্রতিপত্তিতে গুণে সম্মানে স্বদেশে এক শীর্ষস্থানীয় পুরুষ। তাঁর ব্যক্তিত্বও অসামান্য।

কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের এই সাধারণ দর্শন সাধু তাঁকে স্পষ্টতই উপদেশ দিলেন, 'তুমি যেসব কর্ম করছো তাতে তোমার নিজের উপকার।'

এমন কথা কেউ তাঁর মুখের সামনে উচ্চারণ করেন নি নিশ্চয়। কিন্তু তিনি নির্বাক হয়ে শুনতে লাগলেন এমন অপ্রত্যাশিত ভাষণ। শ্রীরামকৃষ্ণ কি বুঝেছিলেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্মকাণ্ডে আত্ম-প্রসাদ প্রচ্ছন্ন ?

গীতা-অনধীত পুরুষ গীতোক্ত কর্মযোগের আদর্শ পুনরায় প্রকাশ করলেন। নিষ্কাম কর্মের ফলে যে ঈশ্বর লাভ, তাও জানালেন অন্তরঙ্গ-ভাবে—'নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের উপর তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ করতে পারবে। জগতের উপকার মানুষ করে না, তিনিই করছেন ; যিনি চন্দ্র সূর্য করেছেন, যিনি মা বাপের ভিতর স্নেহ, যিনি মহতের ভিতর দয়া, যিনি সাধু ভক্তের ভিতর ভক্তি দিয়েছেন। যে লোক কামনাশূন্য হয়ে কর্ম করবে সে নিজেরই মঙ্গল করবে।'

আভাস দিলেন যে, প্রকৃত বস্তু আছে আপনারই অন্তর্লোকে, আত্মায়, হরিণের যেমন কস্তুরী—'অন্তরে সোনা আছে এখনও খবর পাও নাই। একটু মাটি চাপা আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, অন্য কায কমে যাবে।'

আবার একাধিক উপমা, অনু-গল্পের আকারে। গৃহস্থ বধূর সন্তান ধারণ। কাঠুরের ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়া ও পাওয়া—চন্দন গাছ, রূপো, সোনা, হীরে।

'সকলে অবাক ও নিস্তব্ধ হইয়া এই সকল কথা শুনিতেছেন। যেন সাক্ষাৎ বাগ্‌বাদিনী শ্রীরামকৃষ্ণের জিহ্বাতে অবতীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগরকে উপলক্ষ্য করিয়া জীবের মঙ্গলের জন্য কথা বলিতেছেন।'

উপস্থিত সকলের মতন বিদ্যাসাগরও অন্যতম শ্রোতা হয়ে রইলেন শেষ পর্যন্ত।

বিদায়কালে পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণ হাস্য রহস্যে মুখর হলেন। দক্ষিণেশ্বরে বিদ্যাসাগরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন, বিনয় প্রকাশ করে—'আমরা জেলে ডিঙ্গি। খাল বিল আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু আপনি জাহাজ, কি জানি যেতে গিয়ে যদি চড়ায় পাছে লেগে যায়।'

তারপর হয়ত দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার কথা মনে করে সহাস্যে বললেন, 'তার মধ্যে এ সময় জাহাজও যেতে পারে।'

অবশেষে বিদ্যাসাগর একটি টিপ্পনী দিতে পারলেন, 'হাঁ, এটি বর্ষাকাল বটে।'

তাদের কথোপকথনের বিবরণ এই পর্যন্ত।

কয়েক ঘণ্টা ব্যাপী তাঁদের এই সাক্ষাৎকার। শ্রীরামকৃষ্ণ চারখানি গান গেয়েছিলেন। অবশিষ্ট সময়ে তাঁরই কথামৃত। বিদ্যাসাগর প্রায় সর্বাংশেই শ্রোতা, বঙ্কিমচন্দ্রের তুল্য।

বিদ্যাসাগর মহাশয় দক্ষিণেশ্বরে যাবার আহ্বানে স্বীকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু উপস্থিত হতে পারেন নি সেখানে। পরস্পরের সাক্ষাৎকারও আর হয় নি।

দক্ষিণেশ্বরে তাঁর না আসার কথা ঠাকুর মনে রেখেছিলেন। পরে এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য শোনা যায়, 'বিদ্যাসাগরের কথার ঠিক নাই।'

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কি ধারণা হয়েছিল, সেকথা অজ্ঞাত আছে।

কিন্তু তাঁকে ঠাকুর একদিনের দর্শনেই যে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় একটি মাত্র উল্লেখে। তিনি মন্তব্য করেন, 'বিদ্যাসাগরের অন্তর্দৃষ্টি নাই।'

'তোমরা বল ব্রহ্ম আত্মা ভগবান।'

শ্রীরামকৃষ্ণ উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানালেন। গঙ্গার ধারে। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের বাঁধানো ঘাটে। রাত তখন প্রথম প্রহর।

শ্রোতারা সকলে প্রতিধ্বনি করলেন—'ব্রহ্ম আত্মা ভগবান।'

শ্রীরামকৃষ্ণ তেমনি স্বরে ঘোষণা করিলেন—'ব্রহ্ম মায়া জীব জগৎ।'

শ্রোতারাও সবাই সমস্বরে বললেন—'ব্রহ্ম আত্মা জীব জগৎ।'

শ্রীরামকৃষ্ণ এবার উচ্চারণ করলেন—'ভাগবত ভক্ত ভগবান।'

সকলে অনুরণন তুললেন—'ভাগবত ভক্ত ভগবান।'

যেন কোন গুরুকল্প শাস্ত্রজ্ঞ সন্ন্যাসী মন্ত্রপাঠ করাচ্ছেন শিষ্যবৃন্দ কিংবা শিক্ষার্থীদের। আর উপস্থিত সকলে বিনম্রচিত্তে সেই বাণী অনুসরণ করছেন একাত্ম হয়ে।

কারা এই অনুগামী বৃন্দ ?

স্বনামধন্য ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্রাহ্মভক্ত-মণ্ডলী।

সমকালীন বাংলা তথা ভারতের এক মহা প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম আচার্য কেশব সেন। বাগ্মী, সম্প্রদায়-নেতা, সমাজসংস্কারক, লেখক, সাংবাদিক, গোষ্ঠী-সংগঠক। ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রাণপুরুষ কেশবচন্দ্র। শিক্ষিত তরুণ সমাজে এক প্রভাবশালী ব্যক্তি। ব্রাহ্ম আন্দোলনের বহুল বিস্তারক, অক্লান্ত প্রচারক। বাংলা ও ইংরেজীতে বক্তৃতাশক্তির জন্যে প্রখ্যাত নামা। তাঁকে সেদিন দক্ষিণেশ্বরে এমনি গৌণ ভূমিকায় দেখা গেল।

সে দিনটি হল, ২৯ অক্টোবর, ১৮৭৯। দুপুরবেলা কেশব সেন দক্ষিণেশ্বরে

এসেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে। তাঁর সঙ্গী এক বিরাট দল।
'স্টীমারের সঙ্গে একখানি বজরা, ছয়খানি নৌকা, দুইখানি ডিঙ্গি, প্রায় আশী জন ভক্ত। সঙ্গে পতাকা পুষ্পপল্লব. খোল করতাল ভেরী।'

হৃদয়রাম তাঁদের অভ্যর্থনা করে আনেন ঠাকুরের সন্নিধানে।

কেশবচন্দ্র আগেও বহুবার সদলে উপনীত হয়েছেন এখানে। তবে আজ তাঁর বিপুলসংখ্যক সহযাত্রী।

সেই দুপুর থেকে তাঁরা সারাদিন ঠাকুরের সঙ্গ করলেন। ভাবাবেগে গান গাইলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কত ভগবদ্ প্রসঙ্গ করলেন। সমাধিস্থ হলেন কয়েকবার।

অবশেষে ঠাকুর, কেশব প্রমুখ সকলে গঙ্গাতীরে এলেন, সন্ধ্যার পর।

জ্যোৎস্নায় উচ্ছ্বসিত কোজাগর পূর্ণিমা রজনী। সামনে কুলপ্লাবী ভাগীরথী ধারা। বাঁধাঘাটের মুক্ত স্নিগ্ধ বাতাস। মনোরম নিসর্গ পরিবেশ। দৃশ্যমান মন্দিরের পবিত্র পারিপার্শ্বিকে ঈশ্বর আরাধনার অনুকূল স্থান কাল পাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় সেখানে উপাসনা করলেন কেশবচন্দ্র।

উপাসনার পরই ঠাকুর আহ্বান জানালেন—'তোমরা বল ব্রহ্ম আত্মা ভগবান।'

কেশব নেতৃত্বে সবাই ভক্তিভরে পুনরুক্তি করলেন।

এমনিভাবে আরো দুবার মন্ত্রবৎ—'ব্রহ্ম আত্মা জীব জগৎ' এবং 'ভাগবত ভক্ত ভগবান।'

চতুর্থবার শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বললেন—'বলো গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব'—
তখন কেশব সহাস্যে বললেন, 'মহাশয়, এখন অতদূর নয়, গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব আমরা যদি বলি, লোকে বলবে গোঁড়া।'

অর্থাৎ গোঁড়া অপবাদের আশঙ্কায় কেশব অসম্মত। তাহলে ব্রাহ্ম স্বাতন্ত্র্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়। বিশেষ, সঙ্গে যখন ব্রাহ্ম অনুগামীদের বৃহৎ দল রয়েছেন। নচেৎ আপত্তিকর হতো না হয়ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বললেন, 'বেশ, তোমরা যতদূর পারো তাই বলো।'

পরম উদার, সমদর্শী তিনি। কারো অনিচ্ছায় কিছু আরোপ করা পরাঙ্মুখ।

কিন্তু যতদূর পর্যন্ত কেশব ও তাঁর অনুগামীরা প্রতিধ্বনি করলেন, তা তাঁর সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর পক্ষে অনেকখানি। তাঁদের স্বাতন্ত্র্যের নিরি কিছু বিচ্যুতি হয়ত। ভারতীয় সনাতন ধর্ম ভাবধারার খানিক নিকট গেন। পরিণত বয়সের ব্যক্তিগত ধর্ম জীবনে কেশব স্বয়ং ভক্তিভা অনেকখানি অনুপ্রাণিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত তার অন্যত কারণ কি? বৈষ্ণব বংশের সন্তানরূপে বৈষ্ণবীয় সংস্কার মূলত অবশ্য। কিন্তু তাঁর ওপর ঠাকুরের প্রভাবের এই এক নিদর্শন যে প্রথ জীবনে তিনি ব্রহ্মসঙ্কীর্তন থেকে পরবর্তীকালে হরিসংকীর্তনে মগ্ন হতেন সকলের চেয়ে বড় কথা, তাঁর সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই দিক্‌দর্শন উক্তিটি: 'কেশব কালী মেনেছিল।' দক্ষিণেশ্বরের আশয়ে সাধুর প্র জীবনের শেষ ন' বছর কেশব শ্রদ্ধায় শুধু নয়, ভক্তিতে ঠাকুরের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করতে আসেন ফল ফুলের উপচার নিয়ে তাঁকে প্রণাম করেন। তার 'নব বিধান' সমাজের (প্রতিষ্ঠা ১৮৮০ সর্বধর্ম সমন্বয়ের মতবাদ অনেকাংশে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা অনুসারে তাঁর প্রত্যক্ষ উদাহরণ তথা সংসর্গের ফল— কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথের এই ধারণা, যিনি প্রথম জীবনে ছিলেন কেশবের অনুগামী, আত্মীয় কেশবের শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পাঁচ বছর সাহচর্যের পরে 'নব বিধান' স্থাপিত হয়, তাও লক্ষণীয়।

বর্ণিত দিনটির চার বছর আগে ঠাকুরের সঙ্গে কেশবের প্রথম পরিচয় ঘটে (১৮৭৫)। তারপর থেকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় তাঁদের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা—কেশবের শ্রদ্ধা ভক্তি, শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহ প্রীতি।

ঠাকুরের আলাপের সেই সূচনাকালেই কেশবচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৮৪ বিখ্যাত ব্যক্তি। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে ব্রাহ্ম নেতা রূপে তাঁর প্রতিষ্ঠা এবং পরিচিতি। শ্রীরামকৃষ্ণের মাত্র দু বছরের কনিষ্ঠ তিনি। বঙ্কিম

চন্দ্রের সমবয়সী। দেওয়ান রামকমল সিংহের পৌত্র কেশবচন্দ্রের সামাজিক প্রতিষ্ঠাও অল্প নয়।

সর্বধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি প্রীত শ্রীরামকৃষ্ণ। সব ধর্মমতকেই তিনি ঈশ্বর-সমীপে উপনীত হবার পথস্বরূপ মানেন। তাই সকল ঈশ্বর উপাসক ঈশ্বর ভক্ত তাঁর আপনজন। ব্রহ্মানন্দ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হলেও তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র।

প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে কেশবের আমৃত্যু (১৮৮৪, জানুয়ারি ৮) ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগাযোগ থাকে। উভয়ের নানা দিনের কথোপকথন ও সাক্ষাৎকারের বিবরণ আছে 'কথামৃত' পাঁচ খণ্ডেই। আর কেশবের সঙ্গে বেলঘরের বাগানে ঠাকুরের প্রথম আলাপ (১৫ মার্চ, ১৮৭৫) থেকেই ঠাকুরের ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে ভাষণ বহির্জগতে প্রচারিত হতে থাকে কেশবেরই তৎপরতায়।

অবশ্য তারও এগার বছর আগে কেশবকে তিনি প্রথম দেখেছিলেন, যদিও তখন পরস্পরের পরিচয় হয় নি। তা হলো ১৮৬৪ সালের কথা। ছাব্বিশ বছরের যুবক কেশবচন্দ্র সে সময় আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগী, তাঁর চেয়ে একুশ বছরের কনিষ্ঠ হয়েও। দেবেন্দ্রনাথের পরম প্রিয় আস্থাভাজন ব্রাহ্ম নেতা।

সেদিন ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে পরমহংসদেব কেশবকে দেখেন ধ্যানরত অবস্থায়। আরো কয়েকজন ব্রাহ্ম ধ্যান করছিলেন সেখানে। কিন্তু কেশবের দিকেই ঠাকুরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সঙ্গী মথুরবাবুকে তিনি বলেন, 'যতগুলি ধ্যান করছে, এই ছোকরার ফতা (ফাতনা) ডুবেছে,— বড়শীর কাছে মাছ এসে ঘুরছে।' অর্থাৎ ঈশ্বরমুখীন হয়েছেন কেশবচন্দ্র। তারও আগে, অতি তরুণ বয়স থেকেই কেশবের ধর্মজীবন তথা সমাজ সংস্কারাদি কর্মধারার সূচনা। ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনকে তিনি সর্ব-ভারতীয় রূপ দেন। ব্রাহ্মসমাজকে বহুবিস্তৃত করেন বিভিন্ন কার্যসূচী রূপায়নে। উত্তর জীবনে পাশ্চাত্য দেশেও ব্রাহ্ম ভাবধারার প্রচারক কেশব।

ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নিযুক্ত হন মাত্র উনিশ বছর বয়সে। নানা-প্রকার সংস্কার কার্যও তাঁর আরম্ভ হয়ে যায়। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সমর্থক হন তিনি। সেই সূত্রে 'বিধবা বিবাহ' নাটক অভিনয়ও করেন।

তেইশ বছর বয়সেই ব্রাহ্ম প্রচারক রূপে তাঁকে দেখা যায় কলকাতার বাইরেও। সেই সময়েই তাঁর Indian Mirror পত্রিকার প্রতিষ্ঠাও।

চব্বিশ বছর বয়সী কেশবকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি দেন দেবেন্দ্রনাথ। আর সেই সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পদও। ব্রাহ্মসমাজের প্রায় অ-ব্রাহ্মণ আচার্য কেশবচন্দ্র সেন।

ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি ভারত ভ্রমণ করতে থাকেন, নানা সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রচারের জন্যে। ১৮৬৪ থেকে ১৮৬৬ পর্যন্ত তাঁর সেই ভারত পরিভ্রমণ।

তখনই তাঁর নাম প্রবাদবাক্যে পরিণত। 'জাত মারলে তিন সেনে। কেশব সেনে, উইলসেনে, ইস্টিশেনে।' কথাটি লোকের মুখে মুখে শোনা যায়।

তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকার প্রকাশও আরম্ভ হয় ১৮৬৪-তে।

কিন্তু মহর্ষির নেতৃত্বাধীন ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে ক্রমেই কেশবের আদর্শগত বিরোধ ঘনিয়ে ওঠে। অসবর্ণ বিবাহ, অব্রাহ্মণ আচার্য নিয়োগ, খৃষ্টের প্রতি অনুরাগ ইত্যাদি ব্যাপারে প্রকট হয় তাঁদের মতান্তর। ফলে মনান্তর এবং কলিকাতা (বা আদি) ব্রাহ্ম সমাজ থেকে বিযুক্ত হন কেশবচন্দ্র। স্বীয় নেতৃত্বে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন (১১ নভেম্বর ১৮৬৬)।

কেশব ইংলণ্ডে যান ১৮৭০ সালে। সেখানে বক্তৃতাদিতে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচার তাঁর প্রধান কার্য হয়।

পরের বছর তিনি 'ভারত সংস্কারক সভা'র (ইণ্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোশিয়েশন) স্থাপনকর্তা। পরবর্তী বছরে তাঁর 'ভারত আশ্রম' প্রতিষ্ঠা, 'প্রচারক সভা' স্থাপন এবং 'সুলভ সমাচার' পত্রিকা প্রকাশও (১৮৭২)।

তার চার বছর পরেই ব্রাহ্মসমাজে আলোড়নকারী সেই কুচবিহার বিবাহ। কুচবিহার মহারাজার সঙ্গে কেশব-কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজ দ্বিতীয়বার বিভক্ত হলো। আদর্শের প্রেরণায়, কেশবের প্রতিবাদে বিরুদ্ধাচারী হন শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ তরুণদল। কেশবের 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' ত্যাগ করে তাঁরা স্থাপন করেন 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' (১৮৭৮)।

তার দু বছর পরে আত্মপ্রকাশ করে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন 'নব-বিধান'।

তার পাঁচ বছর আগেকার কথা (১৮৭৫)। কেশব পরিচালিত 'ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' তখন অটুট, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ অনুগামীদের সহযোগিতায় প্রভাবশালী ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র। .স তাঁর জীবনের এক মহাসার্থকতার পর্যায়। বাগ্মী-তায় এবং বিবিধ কর্মধারায় শিক্ষিত সমকালীন তরুণ-সমাজে তাঁর তখন বিপুল প্রাতপত্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসায় উপনীত হন যে প্রতিশ্রুতিবান নবীনরা, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনই প্রথমে যাতায়াত করতেন কেশব সকাশে, তাঁর আকর্ষণে। যথা—নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ), তারকনাথ ঘোষাল (শিবানন্দ), রাখালচন্দ্র ঘোষ (ব্রহ্মানন্দ)। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম) কেশবের কেবল অনুগামী ছিলেন না, তাঁর আত্মীয়ও। ঠাকুরের পরম ভক্ত পরিণত, অদ্বৈতাচার্য বংশধর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও কয়েক বছর কেশবের নিযুক্ত ব্রাহ্ম প্রচারক থাকেন, কেশবের বিশেষ আস্থা-ভাজন-রূপে।

জীবনের সেই গৌরবোজ্জল পর্বেই কেশবের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে শ্রীরাম-কৃষ্ণের সঙ্গে।

প্রথম যোগাযোগের পর তিনি এত অধিকবার মিলিত হন ঠাকুরের সঙ্গে, যা শ্রীরামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলের বাইরে আর কারো সম্পর্কে হয়ত বলা যায় না। আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম নেতা, স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের প্রধান পুরুষ হয়েও

পরমহংসদেবের সবিশেষ প্রীতি অধিকারী হন কেশবচন্দ্র। তাঁদের নানা দিনের অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ বিধৃত আছে 'কথামৃত' গ্রন্থাবলীতে। তা থেকে জানা যায় পরস্পর সম্পর্কে তাঁদের ধারণা, মনোভাবের কথা।

প্রসঙ্গত বলা যায়, ঠাকুর ও কেশবের যতদিন সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হয়, তার অল্পাংশই আছে 'কথামৃত' বিবরণে। কারণ, শ্রীম. ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন ১৮৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তায়। তারপর থেকে ঠাকুরের কথামৃত শ্রীম. চয়ন করতে থাকেন। তাও রবিবার বা ছুটির দিনগুলিতে তাঁর দক্ষিণেশ্বরে বা অন্যত্র শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন লাভের উপলক্ষে। অপর পক্ষে, কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুরের আলাপ ও সাক্ষাৎকার তার সাত বছর আগে থেকে। সুতরাং তাঁদের পারস্পরিক কথোপকথনের অধিকাংশ বৃত্তান্তই 'কথামৃত' গ্রন্থে থাকা এবং 'কথামৃত' কারের জানা অসম্ভব। তবু শ্রীম.-র বিবরণে যা প্রকাশিত আছে তার মূল্যও সবিশেষ।

শ্রীরামকৃষ্ণকে কেশব কি দৃষ্টিতে দেখেছিলেন সে বিষয়ে তাঁর স্বলিখিত বিবৃতিও বর্তমান।

শ্রীম-র লিপিতে তাঁদের সেই সব সাক্ষাৎকারের বিবরণ নানা কারণে উল্লেখনীয়। ঠাকুরের নানা মনোজ্ঞ ভাষণের প্রতিবেদনরূপে শুধু নয়। তাঁর তত্ত্বকথা, ভাব, যুক্তি, মতামত, অপ্রতিরোধ্য বক্তব্যের পরিচায়করূপেও কেবল নয়। তাঁর উপলব্ধ সত্যের অপরূপ উদ্ভাষণের পরিচায়ক হিসাবেও শুধু নয়। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সংস্পর্শে কেশব প্রভাবিত হয়েছিলেন কিনা এবং কতদূর পর্যন্ত, কেশবের হিন্দুধর্ম সম্পর্কে ক্রমে কেমন শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হয়—তাও জানার উপায়স্বরূপ। কেশবের সমন্বয়বাদী পরিণতি কি পরিমাণে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দৃষ্টান্তে সম্ভব হয়, তা সামগ্রিক ভাবে বোঝা যায় 'কথামৃত' গ্রন্থাবলী অনুসরণে। তাঁর 'নববিধান' ভাবাদর্শের প্রতিষ্ঠাও পরমহংসদেবের নানা দিনের আলোচিত, আচরিত অধ্যাত্ম প্রসঙ্গের ফলস্বরূপ কিনা সে বিষয়েও আলোকপাতী শ্রীম-র বিবরণী। অপরপক্ষে, কেশব সম্পর্কে ঠাকুরের ধারণার কথাও

উক্ত লিপিমালায় সুপ্রকাশ তাঁর মতামত থেকে।
বিদ্যাসাগরকে যেমন, কেশবকেও সাক্ষাৎ করতে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। যথার্থ ঈশ্বর-প্রেমীর কথা শুনলে সেখানে উপস্থিত হতেন নিরহঙ্কার ঠাকুর। অযাচিত আলাপ পরিচয় করতেন। কেশব সকাশেও আসেন সেইভাবে। প্রথমে কমলকুটীরে। সেখানে সাক্ষাৎ না পেয়ে এবং কেশব বেলঘরে আছেন শুনে, সেখানে উপনীত হলেন। সঙ্গে হৃদয়রাম। কেশব তখন সদলে উপাসনায় ছিলেন জয়গোপাল সেনের সেই বাগানে।
শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি গো বাবু, তোমরা নাকি ঈশ্বরের উপাসনা কর? সে উপাসনা কিরূপ, আমি দেখতে এসেছি।'
অপরিচিত আগন্তুক। কেশব এবং তাঁর সঙ্গীরা প্রথমে তাঁকে বিশেষ গুরুত্ব দেন নি।
কিন্তু ঠাকুর যখন অপূর্ব ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করতে লাগলেন, ভাবে বিভোর হয়ে গাইলেন—'কে জানে কালী কেমন? যড়দর্শনে না পায় দরশন…'
কেশব ক্রমেই আকৃষ্ট, মুগ্ধ হলেন।
সে কথোপকথনের কোনো বিবরণী অপ্রাপ্য। কিন্তু সেই প্রথম সাক্ষাৎকারেই কেশব তাঁর প্রতি কতখানি শ্রদ্ধান্বিত হয়েছিলেন তা স্বয়ং প্রকাশ করেন দু সপ্তাহের মধ্যেই। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় (১৮ মার্চ, ১৮৭৫) এই বিবৃতিতে,—'We met not long ago Paramhansa of Dakshineshwar, and were charmed by the depth, penetration and simplicity of his spirit. The never ceasing metaphors and the analogies in which he indulged, are most of them as apt as they are beautiful. The characteristics of his mind are the very opposite to those of Pandit Dayananda Saraswati, the former being too gentle, tender and contemplative, as the latter is sturdy, masculine and polemical.

Hinduism must have in it a deep source of beauty, truth and goodness to inspire such men as these.'

তার আংশিক অনুবাদ: 'আমরা সম্প্রতি দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসকে সাক্ষাৎ করেছি এবং তাঁর স্বভাবের গভীরতা, অন্তর্দৃষ্টি এবং সরলতায় মুগ্ধ হয়েছি। তিনি অনর্গল যে সব উপমা ও রূপক প্রয়োগ করলেন তা যেমন যথাযথ তেমনি চমৎকার। হিন্দুধর্মের গভীর উৎসে অবশ্যই এমন সৌন্দর্য, সত্য ও সততা আছে যা এই প্রকৃতির ব্যক্তিদের অনুপ্রাণিত করেছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টান্তে হিন্দুধর্ম সম্পর্কেও সমগ্রভাবে এই সশ্রদ্ধ উক্তি কেশবচন্দ্রের, প্রথম সাক্ষাৎকারের ফলে।

আরো একটি স্মরণীয় কথা। কেশবচন্দ্রের এই বিবৃতি পরমহংসদেবের বিষয়ে প্রথম সংবাদপত্রে মুদ্রিত প্রচারস্বরূপ। তাঁর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সাধারণ্যে প্রথম প্রকাশ। ইতিপূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণকে জানতেন প্রধানত দক্ষিণেশ্বরে সমাগত সাধুসন্তরা। তীর্থব্যপদেশে যাঁরা এখানে উপনীত হতেন, তাঁদের মধ্যেই ঠাকুরের মহিমা প্রকাশ পায়। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবার পর থেকে কেশবের বিবৃতি প্রকাশিত হতে লাগল 'ইণ্ডিয়ান মিরর', 'সুলভ সমাচার' প্রভৃতি পত্রপত্রিকায়। তারই ফলস্বরূপ শিক্ষিত বাঙালী সমাজে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেব সম্পর্কে কৌতূহল জাগল। আর তাঁকে দর্শন করবার জন্যে, তাঁর কথা শোনবার জন্যে বহুজনের আগমন ঘটতে লাগল রাণী রাসমণির কালী মন্দিরে।

বৃহত্তর ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রচারে কেশবচন্দ্রের এই ঐতিহাসিক ভূমিকা। শ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমার প্রথম প্রচারক তিনি, ভিন্ন সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর হয়েও।

ঠাকুরের প্রথম আলোক-চিত্রও নেওয়া হয় কেশব ভবনে। সেদিন ২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯। কমল কুটীরে একটি উৎসবে কেশব তাঁকে আমন্ত্রণ করে আনেন। সেখানে 'শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইলে ব্রাহ্ম ভক্তদের সঙ্গে তাঁর ফটো তোলা হয়। ঠাকুর দণ্ডায়মান, সমাধিস্থ। হৃদয় ধরিয়া আছেন।'

সমাধিস্থ অবস্থায়, ব্রহ্মানন্দমগ্ন, সহাস্য মুখের অপূর্ব প্রতিকৃতি। কেশবের গৃহে ঠাকুরের প্রথম ফটোরূপে তাও ঐতিহাসিক।

প্রসঙ্গত বলা যায়, তাঁর দ্বিতীয় ফটো গৃহীত হয় রাধাবাজারে। বেঙ্গল ফটোগ্রাফ স্টুডিওতে। তার তারিখ ১১ ডিসেম্বর, ১৮৮১। দণ্ডায়মান অবস্থায় সে ছবি। সেদিন আলোক-চিত্র নেবার পদ্ধতি কেমন লক্ষ্য করেছিলেন ঠাকুর। আর তারও বর্ণনায় কি অপরূপ ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ শোনান দক্ষিণেশ্বরে। উপবিষ্ট অবস্থায় সে ছবি দক্ষিণেশ্বরে নেওয়া। তাঁর তরুণ ভক্ত ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় সেদিন ফটোগ্রাফারকে এনে-ছিলেন। পরে ঠাকুর একদিন বলেন, 'এই ছবি পরে ঘরে ঘরে দেখা যাবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবের যতদিনের সাক্ষাৎকার বিবরণ 'কথামৃত' গ্রন্থা-বলীতে আছে, তার সব কিংবা অধিকাংশ উদ্ধৃত করাও বাহুল্য। কটি মাত্র দিনের কথোপকথনের অংশ এখানে দেওয়া হলো, তাঁদের পার-স্পরিক সম্পর্কের পরিচায়কস্বরূপ।

সেদিন ২৭ অক্টোবর ১৮৮২। কেশব সদলে জলপথে এসেছেন দক্ষিণে-শ্বরে। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে 'মাস্টার মহাশয়' অর্থাৎ শ্রীম অন্যতম। তিনি তার আট মাস আগে প্রথম দর্শন করেন শ্রীরামকৃষ্ণকে।

তিনিই বিবরণ দিয়েছেন—

'মাস্টার ··বেলা তিনটার সময় কেশবের জাহাজে চড়িয়া কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। বড় সাধ, দেখিবেন ঠাকুর ও কেশবের মিলন ও তাহাদের আনন্দ, শুনিবেন তাঁহাদের কথাবার্তা। কেশব তাঁহার সাধু চরিত্রে ও বক্তৃতাবলে মাস্টারের ন্যায় অনেক বঙ্গীয় যুবকের মন হরণ করিয়াছেন।··কেশব ইংরেজী পড়া লোক, ইংরেজী দর্শন সাহিত্য পড়িয়াছেন। তিনি আবার দেবদেবী পূজাকে অনেকবার পৌত্তলিক বলিয়াছেন। এইরূপ লোক শ্রীরামকৃষ্ণকে ভক্তি শ্রদ্ধা করেন, আবার মাঝে মাঝে দর্শন করিতে আসেন; এটি বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। তাঁহাদের মনের মিল কোন্‌খানে বা কেমন করিয়া হইল, এ রহস্য ভেদ

করিতে মাস্টারাদি অনেকেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছেন। ঠাকুর নিরাকারবাদী বটেন, আবার সাকারবাদী। ব্রহ্মের চিন্তা করেন আবার দেবদেবী প্রতিমার সম্মুখে ফুল চন্দন দিয়া পূজা ও প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্যগীত করেন।··

নৌকা আসিয়া লাগিল। সকলেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত।· ঠাকুরকে নিরাপদে নামাইবার জন্য কেশব শশব্যস্ত হইলেন। ···ব্রাহ্ম ভক্তরা একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ হইল। এখনো ভাব পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে।

ঠাকুর আপনা আপনি অস্ফুটস্বরে বলিতেছেন, 'মা, আমায় এখানে আনলি কেন ? আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা করতে পারবো ?'

কয়েকজন ব্রাহ্ম ভক্ত সম্প্রতি গাজীপুরে পওহারী বাবাকে দেখে এসেছেন। সেই প্রসঙ্গ হলো। কিছুক্ষণ পরে একজন ব্রাহ্ম ভক্ত ঠাকুরকে বললেন, 'মহাশয়, পওহারী বাবা নিজের ঘরে আপনার ফটোগ্রাফ রেখে দিয়েছেন।'

'ঠাকুর ঈষৎ হাস্য করিযা নিজের দেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিযা বলিলেন,—'খোলটা।'

তত্ত্বকথা আরম্ভ হলো। ওই একটি কথায তিনি বুঝিযে দিলেন—দেহ বাহ্য, নশ্বর। শরীরের অন্তরে যাঁর অবস্থান, তিনিই অবিনশ্বর। দেহ বাইরের আবরণ মাত্র। পরিবর্তনশীল, বিনাশশীল। যেন বালিশের খোল, প্রতিকৃতিও। অন্তর্যামীই পূজ্য।

আবার প্রাসঙ্গিকভাবে বললেন, 'তবে একটি কথা আছে। ভক্তের হৃদয় তাঁর আবাসস্থান। তিনি সর্বভূতে আছেন বটে, তবে ভক্ত হৃদয়ে বিশেষরূপে আছেন।'

এমন প্রাঞ্জলভাবে তত্ত্বটি বুঝিয়েও ক্ষান্ত নন। একটি সুযোগ্য উপমা প্রয়োগে, শ্রোতাদের মনে আরো মুদ্রিত করে দিলেন ভাবটি,—'যেমন কোন জমিদার তাঁর জমিদারির সকল স্থানেই থাকতে পারেন। কিন্তু

তিনি তাঁর অমুক বৈঠকখানায় প্রায়ই থাকেন, এই লোকে বলে। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।'

কেশব প্রমুখ সকলে সানন্দে শুনতে লাগলেন—এক মহান উপলব্ধ সত্যের উৎসার—

'জ্ঞানীরা যাকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাকেই আত্মা বলে, আর ভক্তেরা তাঁকেই ভগবান বলে।'

আবার এক নিপুণ উপমায় সরলীকৃত—'একই ব্রাহ্মণ। যখন পূজা করে, তার নাম পূজারী। যখন রাঁধে তখন রাঁধুনী বামুন।'

এবার অবারিত হলো অমৃত বাণী—বৈদান্তিক মত, ভক্তিবাদ, ব্রহ্মজ্ঞানের সর্বোত্তম প্রসঙ্গ—'যে জ্ঞানী, জ্ঞানযোগ ধরে আছে, সে নেতি নেতি এই বিচার করে। ব্রহ্ম এ নয়, ও নয়; জীব নয়, জগৎ নয়। এইরূপ বিচার করতে করতে যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হয়, সমাধি হয়, তখন ব্রহ্ম জ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা; নাম রূপ এসব স্বপ্নবৎ; ব্রহ্ম যে কি তা মুখে বলা যায় না; তিনি যে ব্যক্তি তাও বলবার যো নাই।'

'জ্ঞানীরা ঐরূপ বলে—যেমন বেদান্তবাদীরা। ভক্তেরা কিন্তু সব অবস্থাই লয়। জাগ্রত অবস্থাও সত্য বলে—জগৎকে স্বপ্নবৎ বলে না। ভক্তেরা বলে এই জগৎ ভগবানের ঐশ্বর্য। আকাশ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য পর্বত সমুদ্র জীবজন্তু এ সব ঈশ্বর করেছেন। তাঁরই ঐশ্বর্য। তিনি অন্তরে হৃদয় মধ্যে আবার বাহিরে। উত্তম ভক্ত বলে, তিনি নিজে এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব—জীব জগৎ হয়েছেন। ভক্তের সাধ যে চিনি খায়, সে চিনি হতে ভালবাসে না।'

শেষের উপমার কথায় সবাই হাসলেন। কিন্তু কেউ যোগ দিতে পারলেন না আলোচনায়। স্বয়ং কেশবচন্দ্রও নয়। সকলে শ্রোতারূপে উপভোগ করতে লাগলেন সেই আশ্চর্য কথকের ভাষণ। আন্তরিকতায়, অনুভবে, গভীরতায় অথচ সহজ সারল্যে অনুপম বাগ্‌বিভূতি।

বহু বিদগ্ধ সভার সিদ্ধ বক্তা কেশবচন্দ্রও শুনতে লাগলেন নীরবে—

'কিন্তু একই বস্তু। নাম ভেদ মাত্র। যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা, তিনিই ভগবান। ব্রহ্ম জ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা, ভক্তের ভগবান।'
'এদিকে আগ্নেয়পোত কলিকাতার দিকে চলিতেছে। ঘরের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে যাঁহারা দর্শন ও তাঁহার অমৃতময়ী কথা শ্রবণ করিতেছেন তাঁহারা জাহাজ চলিতেছে কিনা, একথাও জানিতে পারিলেন না।'
এই মুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে কেশবচন্দ্র সামনেই উপস্থিত। কিন্তু অবিশেষ অন্যতম তিনিও। স্বয়ং ধর্মীয় ক্ষেত্রের মানুষ। কিন্তু এমন প্রাণবন্ত ভগবদ্ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের অংশ নেবার কিছু নেই। শুধু সেই দিব্যবাণীধারায় অবগাহন করতে লাগলেন যেন।
ক্লান্তিহীন ঈশ্বরীয় কথক শ্রীরামকৃষ্ণ। অতি উচ্চ কোটির প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে অবলীলায় সঞ্চরণ করতে লাগলেন। জিহ্বাগ্রে যেন স্বয়ং বাগ্‌দেবী।
স্বচ্ছন্দে ব্যাখ্যা করে চললেন বিবিধ নিগূঢ় বিষয়—
ব্রহ্মজ্ঞানীদের যুক্তি। বিচারের কথা। ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু। শক্তির এলাকার পারে সমাধি অবস্থা। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যে-মন অগ্নি আর দাহ্য শক্তি। নিত্য ও লীলা অঙ্গাঙ্গী। আদ্যাশক্তি লীলা-ময়ী। ব্রহ্ম ও কালী অভেদ।
ভাষ্যের সঙ্গে মাঝে মাঝেই সুবোধ্য সুপরিচিত বিষয়ের উপমা প্রয়োগ করতে লাগলেন। শেষের উপমা হল পুষ্করিণীর নানা ঘাট।
কতক্ষণ পরে বাক্‌স্ফুট করলেন কেশবচন্দ্র। কিন্তু নিজস্ব কোন বক্তব্য প্রকাশ নয়। এ যাবৎ ঠাকুর গত প্রসঙ্গে আলোচনা, ব্যাখ্যা করলেন সে সম্পর্কেও তাঁর কোনো মন্তব্য বা মতামতও জানালেন না।
কেবল জিজ্ঞাসু হয়ে বললেন, 'কালী কত ভাবে লীলা করছেন, সেই কথাগুলি একবার বলুন।' যেন জ্ঞাতার্থী জানাতে বললেন কোন শিক্ষ-ণীয় বিষয়।
শ্রীরামকৃষ্ণ অবশ্যই জানালেন, তখনি। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের, নব বিধান

গোষ্ঠীর আচার্য-জনোচিত প্রশ্ন কিংবা জ্ঞাতব্য বিষয় কি—মহাকালীর লীলা ?

কেশবের এমনি আরো পরিচয়ে ঠাকুর পরে বলেছিলেন, 'কেশব কালী মেনেছিলো।'

এখন প্রশ্ন মাত্র ঝর্ণাধারায় তাঁর উত্তর নির্গলিত হলো,—'তিনি নানা-ভাবে লীলা করছেন। তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। মহাকালী, নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই ; চন্দ্র সূর্য পৃথিবী ছিল না ; তখন কেবল মা নিরা-কারা মহাকালী—মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন।

শ্যামাকালীর অনেকটা কোমল ভাব—বরাভয়দায়িনী। গৃহস্থ বাড়িতে তাঁরই পূজা হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয়, রক্ষাকালী পূজা করতে হয়। শ্মশানকালীর সংহারমূর্তি। শব, শিব, ডাকিনী, যোগিনী মধ্যে শ্মশানের উপর থাকেন। রুধির ধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কটীতে নরহস্তের কোমর-বন্ধ। যখন জগৎ নাশ হয়, মহা-প্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন।'

ধ্বংস ও সৃজনের এই মহা তত্ত্ব। তার কি সহজতম ব্যাখ্যা করে দিলেন, নিতান্ত আটপৌরে একটি উপমা যোগে। পল্লী-গৃহিণীর উদাহরণে, রসিকতার ভঙ্গিমায়—

'গিন্নীর কাছে যেমন একটা ন্যাতাকাতার হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে গিন্নী পাঁচ রকম জিনিস তুলে রাখে।'

সেগুলি কিন্তু নব সৃষ্টির বীজ।

কেশব ও অন্য সবাই হাস্য করলেন।

ঠাকুর সহাস্যে আরো ব্যাখ্যা করে দিলেন—আরো জটিল বিষয়ের অতি সরল ভাষ্য—'··সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন। জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন।'

তা কেমন করে ? এই আপাত-বিরোধী ব্যাপার যে সম্ভব তা বুঝিয়ে দিলেন—মাকড়সার জালের উদাহরণ যোগে—'বেদে আছে' উর্ণ-

নাভি'র কথা ; মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা, ভিতর থেকে জাল তৈরি করে, আবার নিজে সেই জালের উপরে থাকে। ঈশ্বর জগতের আধার আধেয় দুই।'

শাস্ত্রবাক্য। কি সুন্দরভাবে প্রকাশ করলেন এই দার্শনিক সার। তাঁর বিচার শক্তিরও বিশিষ্ট এক নিদর্শন। কালী নির্গুণা আবার সগুণা। কবির ভাষায় সে তত্ত্ব জানালেন, 'কালী কি কালো ? দূরে তাই কালো, জানতে পারলে আর কালো নয়। আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে দেখো, কোন রঙ নাই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখো, কোন রঙ নাই।'

নিপুণ সাহিত্য শিল্পীর চিত্রময় বর্ণনা—চাক্ষুষ, সপ্রাণ।

তবু সুরহীন ছন্দহীন গদ্যে আর তৃপ্ত নয় মন। এবার সঙ্গীতে অন্তরের অঞ্জলি দিলেন—নিরাকার সাকার নির্গুণ সগুণ আদ্যাশক্তি কালীর সাধক পূজক প্রিয় সন্তান। 'প্রেমোন্মত্ত হয়ে' গান ধরলেন—

মা কি আমার কালো রে।
(শ্যামা মা কি আমার কালো)
কালো রূপ দিগম্বরী হৃদপদ্ম করে আলো রে ॥

গান শেষ করেই পুনরায় কথারম্ভ হলো।

এ সংসারের স্বরূপ কি ? তা নির্ধারণ করে দিলেন 'কেশবাদির প্রতি' উক্তিতে,—'বন্ধন আর মুক্তি ; দুয়ের কর্তাই তিনি। তাঁর মায়াতে সংসারী জীব, কামিনী কাঞ্চনে বদ্ধ, আবার তাঁর দয়া হলেই মুক্তি।'

কবির ভাষায় ব্যক্ত করলেন, তিনি—'ভববন্ধনের বন্ধন হারিণী তারিণী।' আবার অন্তরের ভাবধারা সঙ্গীতে রূপ ধারণ করে। অনায়াস ভাষণের তুল্য ইচ্ছা-মাত্র গীত-নির্ঝর সেই 'গন্ধর্ব বিনিন্দিত কণ্ঠে'।

রামপ্রসাদের বাণী ও সুরে বক্তব্যের নিঃসার—ঘুঁড়ির উপমায় মহামায়ার লীলা-বিলাস কথা—

শ্যামা মা উড়াচ্ছ ঘুড়ি (ভব সংসার বাজার মাঝে)।
(ঐ যে) আশা বায়ু ভরে উড়ে, বাঁধা তাহা মায়া দড়ি ॥

কাক গণ্ডি মণ্ডি গাঁথা, পঞ্জরাদি নানা নাড়ী।
ঘুড়ি সগুণে নির্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি॥
বিষয়ে মেজেছ মাঞ্জা, কর্কশা হয়েছে দড়ি।
ঘুড়ি লক্ষের মধ্যে দুটো একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি॥
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি
ভব সংসার সমুদ্র পারে পড়বে গিয়ে তাড়াতাড়ি॥

বিরাট দার্শনিক তত্ত্বের প্রকাশ এই প্রসাদী সঙ্গীতে। গায়ক এবার তার ভাষ্যকার হয়ে বললেন, 'তিনি লীলাময়ী। এ সংসার তাঁর লীলা। তিনি ইচ্ছাময়ী, আনন্দময়ী।'

রামপ্রসাদের একটি প্রধান বক্তব্যের টীকা করে দিলেন একটি বাক্যে, —'তিনি লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন।'

এমন গান ও ব্যাখ্যার পরেও একজন ব্রাহ্মভক্ত প্রশ্ন করলেন, যেমন জিজ্ঞাসা সচরাচর সংসারী লোকের মনে উদয় হয়ে থাকে,—'মহাশয় তিনি তো মনে করলে সকলকে মুক্ত করতে পারেন। কেন তবে আমাদের সংসারে বদ্ধ করে রেখেছেন?'

সমাধানে সদা প্রস্তুত তিনি। ইচ্ছাময়ী লালামরী মহামায়ার মর্মজ্ঞ প্রাজ্ঞ। মহাকালীর ক্রীড়া-বিলাসের কথা জানালেন, 'তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা যে, তিনি এই সব নিয়ে খেলা করেন।...'

ছোটদের 'বুড়ি ছোঁয়া' খেলার তুলনা দিয়ে বললেন, 'সকলেই যদি ছুঁয়ে ফেলে, খেলা কেমন করে হয়? · তাই লক্ষের দুটো একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি।'

লক্ষ মানুষের মধ্যে দু একজন মাত্র ভব বন্ধনের জাল থেকে মুক্তি পেতে পারে, সাধন বলে। সেই কোটিকে গোটিক সিদ্ধ সাধকদের জগন্মাতা পিঠ চাপড়ে দেন, সানন্দে অভিনন্দন জানিয়ে।

শুনে, কেশব প্রমুখ 'সকলের আনন্দ হল।' এমন মনোজ্ঞ ভাষণ, এমন সরস বাচন-ভঙ্গী। কোন্ শ্রোতার না আনন্দ হয়?

এবার মনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা কি অন্তরঙ্গ ভাবে বুঝিয়ে বললেন,

'তিনি মনকে আঁখি ঠেরে ইশারা করে বলে দিয়েছেন, 'যা এখন সংসার করগে যা।' মনের কি দোষ? তিনি যদি আবার দয়া করে মনকে ফিরিয়ে দেন, তাহলে বিষয় বুদ্ধির হাত থেকে মুক্তি হয়। তখন আবার তাঁর পাদপদ্মে মন হয়।'

কত ভাবের আনাগোনা ঠাকুরের চিত্তে। কত ভাবের ভাবুক।

এবার সংসারীর ভাব আরোপ করলেন আপনাতে। যেন সংসারের মায়ায় বিজড়িত হয়ে পড়েছেন। পরম কর্তব্য বিস্মৃত হয়েছেন জগদীশ্বরী সৃষ্ট মোহাবর্তে পতিত হয়ে। সেই ভাবের ব্যঞ্জনায় শ্যামা মায়ের কাছে অভিমান জানালেন। পুনরায় প্রাণের আবেদন প্রকাশ করলেন সঙ্গীতে. রামপ্রসাদের জবানীতে—

আমি ঐ খেদে খেদ করি (শ্যামা)।
তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি ॥
মনে করি তোমার নাম করি কিন্তু সময়ে পাসরি।
আমি বুঝেছি জেনেছি, আশয় পেয়েছি এসব তোমারি চাতুরী ॥
কিছু দিলে না পেলে না, নিলে না খেলে না, সে দোষ কি আমারি।
যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে, দিতাম খাওয়াতাম তোমারি ॥
যশ অপযশ সুরস কুরস সকল রস তোমারি।
(ওগো) রসে থেকে রসভঙ্গ কেন কর রসেশ্বরী ॥
প্রসাদ বলে মন দিয়েছ মনেরে আঁখি ঠারি।
(ওমা) তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া মিষ্টি বলে ঘুরি ॥

গানখানি গেয়েই তার টীকা করলেন অতি সংক্ষেপে—'তাঁরই মায়াতে ভুলে মানুষ সংসারী হয়েছে। প্রসাদ বলে 'মন দিয়েছ মনেরে আঁখি ঠারি।'

স্মরণীয় শাস্ত্রবাক্য—শ্রীশ্রীচণ্ডীর

তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতা।
মহামায়া প্রভাবেন সংসার স্থিতি কারিণা ॥
তন্মাত্র বিস্ময়োঃ কার্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সং মোহ্যতে জগৎ ॥

শ্রীশ্রীচণ্ডীর একটি বাণীই শ্রীরামকৃষ্ণ শোনালেন কথ্য ভাষায়।

আরেকজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন তাঁকে, 'মহাশয়, সব ত্যাগ না করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না ?'

'না গো।' প্রশ্নকর্তাকে আশ্বাস দিলেন ঠাকুর। সহাস্যে বললেন, 'তোমাদের সব ত্যাগ করতে হবে কেন ?'

তাঁর লোকচরিত্রের জ্ঞান ও অনুধাবনও অসামান্য। তিনি বিলক্ষণ বোঝেন —প্রশ্নকারীর মতন এমনি সাধারণ ভক্তেরা কিছুমাত্র ত্যাগী নন। তাঁরা নিমজ্জিত আছেন সর্বপ্রকার সাংসারিক ভোগ সুখে। আবার সমাজ-মন্দিরে উপাসনাদিতেও যোগ দেন। ত্যাগকে ভয় করেন, অথচ ঈশ্বর বন্দনার বাসনা তাঁদের।

ঠাকুর এসবই জানেন। কিন্তু কোনো ঈশ্বর-উপাসককে নিরাশ করেন না তিনি। যথাসম্ভব আশা উৎসাহ সহানুভূতি প্রেরণা দেন। সংসারে থেকেও মন রাখা যায়, মন রাখা উচিত, ঈশ্বরে। এমন কথা তিনি তাঁদের জানিয়েছেন আরও নানা দিনে। সমাজ মন্দিরে অনুষ্ঠানাদিতে যোগ-দানের সময়ে। কিংবা কোনো ব্রাহ্ম ভক্তের বাড়িতে। সরস মন্তব্যও কখনো কখনো করেছেন, দুই কূল রাখার কথায়।

আজো সকৌতুকে বললেন, 'তোমরা রসে বশে বেশ আছো। সারে মাতে।'

তাঁর রসিকতায় সকলে হাসলেন। তিনি সেইভাবেই বলতে লাগলেন, 'তোমরা বেশ আছো। নক্স খেলা জানো ? আমি বেশি কাটিয়ে জ্বলে গেছি। তোমরা খুব সেয়ানা। কেউ দশে আছো ; কেউ ছয়ে আছো ; কেউ পাঁচে আছো। বেশি কাটাও নাই। খেলা চলছে—এ তো বেশ।'

তাঁর পরিহাসের কথায় সবাই পুনরায় হাস্য করলেন। কিন্তু বুঝলেন না তাঁদের এই হাসি নিজেদেরই ব্যয়ে।

তাঁদের স্বরূপ ঠাকুরের সঠিক জানা ছিল। কিন্তু সাধারণ সংসারী জীবের প্রতিও তাঁর গভীর সহানুভূতি। কারো দোষ তিনি দেখেন না, ধরেন না। তিনি যে অধিক কাটিয়ে জ্বলে গেছেন, তেমন জ্বলন্ত বৈরাগ্য আশা

করেন না অপরের কাছে।

তাই আন্তরিক অভয় দিয়ে বললেন, 'সত্যি বলছি তোমরা সংসার করছো এতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। তা না হলে হবে না।'

তারপর যে পথ নির্দেশ দিলেন তা এক অপূর্ব বাণী। তিনি ভিন্ন আর-কে এমন অপরূপ উপদেশ দানে সক্ষম ? এমন আশায় ভরসায় দৈন-ন্দিন পালনীয় কৃত্যকে জানাতে পারেন ?

তাঁর সেই অবিস্মরণীয় অমৃত উক্তি,—'এক হাতে কর্ম করো, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাকো। কর্ম শেষ হলে দুই হাতে ঈশ্বরকে ধরবে।' কর্মযোগ বিষয়ে একটি সার কথা। সংসারে থেকেও নিষ্কাম কর্মের আদর্শ অনুসরণের পন্থা প্রদর্শন। আর তাও অতিশয় হৃদয়স্পর্শীভাবে, ভাষায়। শ্রোতাদের অন্তরে মুদ্রিত করে দেওয়া প্রেরণা।

তার পরের প্রসঙ্গে—মন। বিশ্লেষণ করে, বিচার করে দেখালেন তার যথার্থ প্রকৃতি। বল্‌লেন—'মন নিয়ে কথা। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত।'

অপূর্ব উপমা যোগে মনের স্বরূপ জলবৎ তরল করে দেখালেন—'মন যে রঙে ছোপাবে, সেই রঙে ছুপবে। যেমন ধোপাঘরের কাপড়। লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল, সবুজ রঙে ছোপাও সবুজ। যে রঙে ছোপাও সেই রঙেই ছুপবে। মনকে যদি কুসঙ্গে রাখো, তো সেই রকম কথাবার্তা, চিন্তা হয়ে যাবে। যদি ভক্তের সঙ্গে রাখো, তাহলে ঈশ্বর চিন্তা, হরিকথা, এই সব হবে।'

তারপর আরেক আটপৌরে, গার্হস্থ উপমা দিলেন----মনের কারিকা-শক্তি নির্ধারণ করে—'মন নিয়েই সব। এক পাশে পরিবার, এক পাশে সন্তান। একজনকে একভাবে, সন্তানকে আর এক ভাবে, আদর করে কিন্তু একই মন।'

ব্রাহ্ম ভক্তদের দিকে চেয়ে আবার পরম ভরসার বাণী উচ্চারণ করলেন, ...'আমি বদ্ধ নই, আমি মুক্ত এই কথাটি রোক করে বলতে বলতে তাই

হয়ে যায়। মুক্তই হয়ে যায়।...'

মনের কার্যকর শক্তির এও এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

আশ্চর্যের বিষয়—এত তত্ত্বকথা ঠাকুর অনর্গল বলে চলেছেন। কিন্তু কোন বাক্যস্ফুট করছেন না কেশবচন্দ্র। অন্য সকলের সঙ্গে তিনিও নির্বাক শ্রোতা হয়ে রইলেন। আলোচনায় সক্রিয় যোগ না দিয়ে। অথচ এ এমন দিব্য বাণীধারা যে নিষ্প্রভ হয়ে যায় অপরের বাগ্মীতা-শক্তি।

এবার আরেক প্রসঙ্গ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, পূর্বকথার অনুষঙ্গে।

বাইবেলের নাম না করে বললেন, 'খৃষ্টানদের একখানা বই একজন দিলে, আমি পড়ে শোনাতে বললুম। তাতে কেবল 'পাপ আর পাপ'।

এবার তিনি কেশবকেই লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমাদের ব্রাহ্ম সমাজে-ও কেবল 'পাপ'। যে ব্যক্তি 'আমি বদ্ধ' 'আমি বদ্ধ' বার বার বলে, সে শালা বদ্ধই হয়ে যায়। যে রাত দিন 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' করে, সে তাই হয়ে যায়।'

সেই স্টীমারের মধ্যে, তখনকার শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রায় সকলেই ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত। বিশেষ কেশব সেনের গোষ্ঠীগত। সামনেই তাঁদের নেতা উপবিষ্ট। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁরই অতিথি। কিন্তু কি নিঃসঙ্কোচে তাঁদের এই সমালোচনা করে দিলেন। এটি অবশ্য কোনো ব্যক্তিগত দোষ দর্শন নয়। আত্মিক প্রসঙ্গ। তাঁদের এই ত্রুটি অধ্যাত্ম-জীবনে ক্ষতিকর বিবেচনায় সরল মনে প্রকাশ করলেন, সত্যের তেজে।

তিনটি ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে, সেকালে কেশব সেন পরিচালিত সংস্থায় খৃষ্টান প্রভাব একাধিক বিষয়ে ছিল। এই 'পাপ স্বীকার' তার অন্যতম। শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে আন্তরিক ভালবাসতেন। কিন্তু সেজন্যে স্পষ্ট কথা বলতে পরাঙ্মুখ হন নি কখনো। যে কোনো প্রতিপত্তিবান ব্যক্তির মুখের সামনে ঠাকুর সত্য কথা সরল চিত্তে উচ্চারণ করতেন। তা দেখা গেছে নানা দিনে, নানা জনের প্রসঙ্গে। বর্তমান উক্তি তার এক দৃষ্টান্ত।

তাঁর এই অভিযোগেও কেশবচন্দ্র নিরুত্তর রইলেন।

আর নিরন্তর প্রবাহিত হতে লাগল ঠাকুরের বাচনধারা। অপ্রতিরোধ্য

তার গতি। অপরাজেয় তার শক্তি। উপলব্ধির সত্যের শক্তিতে অমোঘ।
প্রদীপ্ত প্রত্যয়ে তিনি বললেন, 'ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই —কি, আমি তাঁর নাম করেছি, আমার আজও পাপ থাকবে! আমার আবার পাপ কি। আমার আবার বন্ধন কি!...'

'ভগবানের নাম করলে দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়।'

'কেবল পাপ আর নরক এই সব কথা কেন? একবার বল যে অন্যায় কর্ম যা করেছি আর করবো না। আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর।'

পুনরায় ভাবের আবেগ সঙ্গীতে মুক্তি পায়। এবার অনুকূল ভাবে মত্ত হয়ে তিনি গাইতে লাগলেন 'নাম মাহাত্ম্য'—

আমি দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।

আখেরে এ দীনে না তারো কেমনে জানা যাবে গো শঙ্করী॥ ...'

উদ্ধার লাভের প্রশস্ত পথ ভক্তিবাদের আশ্রয়। সেই মার্গে উপনীত হওয়া প্রয়োজন। সংসারীদের সেই সহজ উপায়ের সন্ধান দিলেন, আপন উদাহরণে—'আমি মার কাছে কেবল ভক্তি চেয়েছিলাম। ফুল হাতে করে মার পাদপদ্মে দিয়েছিলাম; বলেছিলাম, 'মা এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও...'

আন্তরিকতায়, আত্মনিবেদনে, ভাষণ পারিপাট্যে কবিপ্রাণের প্রকাশ। ঈশ্বর কোটির আত্ম উদঘাটন নয় কেবল। সেই সঙ্গে নান্দনিক আবেদনে পূর্ণ।

কণ্ঠে আবার ভর করে এলো অনুরূপ অপরূপ ভাবের গান। এবার সঙ্গীতের ভঙ্গীতে ভক্তিপন্থার ব্যাখ্যা। ব্রাহ্মভক্তদের দিকে চেয়ে বললেন, 'একটি রামপ্রসাদের গান শোন'—

আয় মন বেড়াতে যাবি।

কালী কল্পতরু মূলে রে (মন) চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, (তার) নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।

ওরে বিবেক নামে তার বেটা, তত্ত্ব কথা তায় শুধাবি॥

শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে পীরিত হবে তখন শ্যামা মাকে পাবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, পিতা মাতায় তাড়িয়ে দিবি।
যদি মোহ গর্তে টেনে লয়, ধৈর্য খোঁটা ধ'রে র'বি॥
ধর্মাধর্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ, তবে জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি॥
প্রথম ভার্যার সন্তানেরে দূর হতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, তবে জ্ঞানসিন্ধু মাঝে ডুবাইবি॥
প্রসাদ বলে এমন হলে কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর, মঁনের মত মন হবি॥

গান শুনিয়ে, আবার আশ্বাস দিলেন সকলকে। রাজর্ষি জনকের উদাহরণ দিয়ে বললেন—'সংসারে ঈশ্বর লাভ হবে না কেন? জনক রাজার হয়েছিল। এ সংসার 'ধোঁকার টাটি' প্রসাদ বলেছিল। তাঁর পাদপদ্মে ভক্তিলাভ করলে—'

রামপ্রসাদের সেই গীতাংশ এবার শোনালেন—

'এই সংসারই মজার কুটি আমি খাই-দাই আর মজা লুটি।
জনক রাজা মহা তেজা তার বা কিসের ছিল ত্রুটি।
সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি।'

দুধ খাবার সাধ অনেকেরই। তাঁরা ভাবেন, মুখে বললেই হল যে, আমি ঈশ্বরকে চাই, তাঁকে ভালবাসি, তাঁকে ডাকি। অথচ সংসারেও রয়েছি। আমরাও জনকের মতন।

ব্রাহ্ম সমাজেরও অনেকের এমন ধারণা। শ্রীরামকৃষ্ণ জানেন তাঁদের। তাই জনক রাজার গুরুত্ব বুঝিয়ে দেন।

সাধারণ গৃহস্থ কি জনক রাজার তুল্য? রাজর্ষি জনকের কত সাধন ছিল। কি কঠোর তপশ্চর্যা তিনি করেছিলেন আগে। তাঁর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলেও, সংসারীর কি করণীয়—নির্জনে সাময়িক বাস ও বিবেক প্রসঙ্গে এবার ঠাকুর বললেন। সংসারীদের পক্ষে মুক্তি লাভের বাস্তব

উপায় নির্দেশ করে দিলেন সেই সঙ্গে—

'কিন্তু ফস্ করে জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক রাজা নির্জনে অনেক তপস্যা করেছিলেন। সংসারে থেকেও এক-একবার নির্জনে বাস করতে হয়। সংসারের বাহিরে একলা গিয়ে যদি ভগবানের জন্য তিন দিনও কাঁদা যায় সেও ভাল। এমন কি অবসর পেয়ে একদিনও নির্জনে তাঁর চিন্তা যদি করা যায়, সেও ভাল। লোকে মাগ ছেলের জন্য এক ঘটি কাঁদে, ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে বল? নির্জনে থেকে মাঝে মাঝে ভগবানের জন্য সাধন করতে হয়। সংসারের ভিতর, বিশেষ কর্মের মধ্যে থেকে, প্রথমাবস্থায় মন স্থির করতে অনেক ব্যাঘাত হয়। যেমন ফুটপাতের গাছ; যখন চারা থাকে, বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে। প্রথমাবস্থায় বেড়া দিতে হয়, গুঁড়ি হলে আর বেড়ার দরকার থাকে না। তখন গুঁড়িতে হাতি বেঁধে দিলেও কিছু হয় না।

তেমনি সংসারীর অভয় অবস্থা, বিবেক জাগ্রত হলে। ঈশ্বরই একমাত্র অবিনশ্বর এবং অবলম্বন, এই জ্ঞান লাভ করলে। ঈশ্বরে আন্তরিক অনু-রাগ এলে।'

তাই বললেন, 'বিবেক বৈরাগ্য লাভ করে সংসার করতে হয়। সংসার সমুদ্রে কাম ক্রোধাদি কুমীর আছে। হলুদ গায়ে মেখে জলে নামলে কুমীরের ভয় থাকে না। বিবেক বৈরাগ্য হলুদ। সদসদ বিচারের নাম বিবেক। ঈশ্বরই সৎ, নিত্য বস্তু। আর সব অসৎ, অনিত্য; দুই দিনের জন্য। এইটি বোধ। আর ঈশ্বরে অনুরাগ। তাঁর উপর টান—ভাল-বাসা। গোপীদের কৃষ্ণের উপর যেরূপ টান ছিল।'

গোপীদের কৃষ্ণভক্তির অনুষঙ্গে আবার সঙ্গীতের উদ্‌বোধন হল অন্তরে। কৃষ্ণ-কীর্তনের অনুভাব। এবার আর শ্যামা মায়ের গান না—কৃষ্ণ-ভক্তির কীর্তন ধারা।

'একটা গান শোন' বলে, কীর্তন গাইতে আরম্ভ করলেন। কীর্তন সঙ্গীতও তাঁর প্রাণের প্রিয়। মাধুর্য-মণ্ডিত কণ্ঠে গাইতে লাগলেন, আখর যোগে—

বংশী বাজিল সই বিপিনে।
(আমার তো না গেলে নয়)
(শ্যাম পথে দাঁড়ায়ে আছে)
তোরা যাবি কি না যাবি বল গো॥
তোদের শ্যাম কথার কথা।
আমার শ্যাম অন্তরের ব্যথা (সই)॥
তোদের বাজে বাঁশি কানের কাছে।
বাঁশি আমার বাজে হৃদয় মাঝে॥
শ্যামের বাঁশি বাজে, বেরাও রাই।
তোমা বিনা কুঞ্জের শোভা নাই॥'

গানের ভাবে গায়ক নিজেই অভিভূত। কিন্তু তার মধ্যেও এই বোধ আছে যে, রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব হয়ত ব্রাহ্ম শ্রোতাদের মনঃপূত হবে না।

তাই 'ঠাকুর অশ্রুপূর্ণ নয়নে এই গান গাইতে গাইতে কেশবাদি ভক্তদের বললেন, 'রাধাকৃষ্ণ মানো আর নাই মানো, এই টানটুকু নাও; ভগবানের জন্য কিসে এই ব্যাকুলতা হয়, চেষ্টা করো।'

ভক্তিমার্গের সেই অন্তরের উপায় নির্দেশ—'ব্যাকুলতা থাকলেই তাঁকে লাভ করা যায়।'

মূল লক্ষ্যকে সব দিক থেকে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। আগে কত যুক্তিযুক্ত ভাষণ দিয়েছিলেন, উপযুক্ত উপমা যোগে। নীতিগতভাবে কত বিচক্ষণ বিচার করেছিলেন। অবশেষে উপসংহার করলেন কীর্তনের হার্দিক আবেদনে।

সর্বপ্রকারে উপস্থাপিত বক্তব্য তাঁর। তর্কে অপ্রতিরোধ্য, অনিবার্য। চিত্ত আকর্ষক—আবেগে, বিশ্বাসে, অনুভবে। সানন্দে বরণীয়, গ্রহণীয়। স্বীকৃতিতে পরম শান্তি।

সমস্ত সম্প্রদায়ের উর্ধ্বচারী, সর্বজনীন তাঁর মানস। ভারতীয় সনাতন ধর্মাদর্শের, বিশ্বজনীন ধারণার, সর্বজনবোধ্য প্রবক্তা শ্রীরামকৃষ্ণ।

সেই প্রজ্ঞা-বিগ্রহের সামনে এক মুগ্ধ শ্রোতা কেশবচন্দ্র। এখন মৌন

তাঁর বাগ্ বৈদগ্ধ্য।

এমনি নিরন্তর ভগবদ্ প্রসঙ্গে কতক্ষণ অতিবাহিত হয়ে যায়, 'কতদূর পর্যন্ত জাহাজ গিয়াছিল, অনেকেরই জ্ঞান নাই—তাঁহারা মগ্ন হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনিতেছেন। কোন্ দিক দিয়া সময় যাইতেছে, হুঁশ নাই।'

এবার জলপানের জন্যে খানিক বিরতি। মুড়ি নারকেল বিতরণ করা হতে লাগল সকলকে। আনন্দের হাট। এই অবকাশে শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টি পড়ল কেশবচন্দ্র এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর দিকে।

তিনি লক্ষ্য করলেন—তাঁরা দুজনে সঙ্কুচিত ভাবে রয়েছেন। বুঝলেন তাঁদের সঙ্কোচের কারণও।

বিজয়কৃষ্ণ আজ ঠাকুরের কাছে এসেছিলেন, দক্ষিণেশ্বরে। তারপর তিনি যখন কেশবের স্টীমারে উপস্থিত হলেন, বিজয়কৃষ্ণও থাকেন তাঁর সঙ্গীরূপে। এতক্ষণও ক্যাবিনে ছিলেন, কেশবের অনতিদূরে।

কিন্তু কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তার অনেক আগে থেকেই তাঁর সম্প্রদায়গত বিচ্ছেদ ঘটেছিল। তিনি কেশবের গোষ্ঠী ত্যাগ করে যোগ দেন কেশব বিরোধী সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে। কুচবিহার বিবাহ উপলক্ষে সেই দলা-দলির ফলে। সেসব বৃত্তান্তও ঠাকুরের কিছু কিছু জানা।

বিজয়কৃষ্ণ প্রসঙ্গে বলে রাখা যায় যে, অনতিকাল পরেই তাঁর তপশ্চর্যা এবং সাধন জীবনেরও সূত্রপাত হয়। গয়ার নিকটে আকাশ গঙ্গায়। সেখানে তিনি গুরুলাভ করেন। দীক্ষিত হন সাধক জীবনে। পরে হিন্দু ধর্মের মূল ধারায় ফিরে আসেন। বহু শিষ্যের গুরু হন স্বয়ং। পুরীতে 'জটিয়া বাবা' নামে তাঁর প্রসিদ্ধি এবং সেখানকার নরেন্দ্র সরোবরের আশ্রমে পরিণত বয়সের ধর্মজীবন যাপিত হয়। ব্রাহ্ম সমাজ ও ব্রাহ্ম আন্দোলন থেকে তাঁর হিন্দু ধর্মে পুনরাবর্তনে কিছু ক্রিয়া করে শ্রীরাম-কৃষ্ণের সংস্পর্শ, দৃষ্টান্ত ও সাক্ষাৎ প্রভাব।

সেদিন, সেই স্টীমারে উৎসবের সময় বিজয়কৃষ্ণ ছিলেন কেশবের বিরুদ্ধ বাদী সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ভুক্ত। অথচ, ঠাকুরের সঙ্গে এসে পড়েছেন

তাঁর নিকটে। এ জন্যে তিনি যেমন সংকোচ বোধ করছেন, তেমনি কেশবও।

এইসব সাম্প্রদায়িক বা দলগত কলহ যে কি তুচ্ছ তা ঠাকুরের চেয়ে আর বেশি কার জানা।

তাই তিনি কেশব ও বিজয়ের মনোমালিন্য দূর করতে চাইলেন—'যেন দুই অবোধ ছেলেকে ভাব করিয়ে দিবেন।'

তাঁর ব্যক্তিত্বকে এমন বিপুল ভাবে দেখা গেল সে সময়। কারণ কেশবচন্দ্র তখনই দিকপাল এবং বিজয়কৃষ্ণ এক দিকপাল আচার্য হন ক বছর পরেই।

সেই দুজনের বিবাদ ঠাকুরের কাছে যেন পরিহাসের বিষয়। এতক্ষণের উচ্চকোটির ভগবদ প্রসঙ্গের পর বাকপতির আরেক রূপ। কৌতুক রসের বিচ্ছুরণ। তাঁদের কলহকে লঘু করে দিতে চাইলেন।

রহস্য করে বললেন কেশবকে, 'ওগো! এই বিজয় এসেছেন। তোমাদের ঝগড়া বিবাদ যেন শিব ও রামের যুদ্ধ। রামের গুরু শিব। যুদ্ধও হলো, দুজনে ভাবও হলো। কিন্তু শিবের ভূত প্রেতগুলো আর রামের বানরগুলো, এদের ঝগড়া কিচিমিচি আর মেটে না।'

রসিকতায় এবং বলার ভঙ্গীতে সবাই উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। এসব সময়ে প্রকাশ পায় ঠাকুরের নাট্যক্ষমতা। কথনীয় বিষয়ের সঙ্গে তাঁর যথোপযোগী ভাব ও অঙ্গ-ভঙ্গিমা। ফলে তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং কথনীয় আরো চিত্তাকর্ষক হয় শ্রোতাদের কাছে।

লোকচরিত্রে প্রাজ্ঞ তিনি। এখানে এই ইঙ্গিত করলেন যে, দলাদলি জীইয়ে রাখে নেতাদের চেয়ে অনুগামীরাই বেশি।

আবার আরেক বিষয়ে তাঁর অদ্ভুত পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় দিলেন। সেই সঙ্গে প্রখর বাস্তবতা বোধ, প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান এবং মানব-মনের অভিজ্ঞতাও।

তাই কেশবচন্দ্রকে আরেকটি অভাবিত উপদেশ দিলেন।

এবার 'ঠাকুর কেশবচন্দ্রকে বলিতেছেন, 'তুমি প্রকৃতি দেখে শিষ্য

করো না তাই ভেঙে ভেঙে যায়।'

আশ্চর্য ব্যাপার। কেশব সেনের তুল্য এত বড় সংগঠক, যিনি আযৌবন কত সংগঠন সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলেছেন, ব্রাহ্ম সমাজের শাখা প্রশাখা বিস্তার করেছেন সমগ্র ভারত ব্যাপী, স্বয়ং প্রবর্তন করেছেন 'ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ', 'ভারত সংস্কারক সভা', 'ভারত আশ্রম' 'প্রচারক সভা', 'নব বিধান' প্রভৃতি সংস্থা—তাঁকেই এমন সুস্পষ্ট সমালোচনা করলেন সাংগঠনিক বিষয়ে! ভেঙে ভেঙে যায় বলতে কেশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠানে দল ভাঙার কথাই বোঝাতে চাইলেন। কেশবের 'ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ' ভেঙেছে, কারণ তিনি অনুগামীদের গোষ্ঠীভুক্ত করেন তাঁদের স্বভাব লক্ষ্য না করে।

মনুষ্যচরিত্রে কতখানি পারঙ্গম শ্রীরামকৃষ্ণ। তার পরিচয়স্বরূপ বল-লেন, 'মানুষগুলি দেখতে সব একরকম, কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি। কারু ভিতর সত্বগুণ বেশি, কারু রজোগুণ বেশি, কারু তমোগুণ। পুলিগুলি দেখতে সব একরকম, কিন্তু কারু ভিতর ক্ষীরের পোর, কারু ভিতর নারিকেল ছাঁই, কারু ভিতরে কলায়ের পোর।'

এত বড় মণ্ডলীর সামনে তার দলপতিকেই অদূরদর্শিতার কথা জানা-লেন। কিন্তু নিরুত্তর রইলেন কেশবচন্দ্র, বিনা আপত্তিতে। কারণ ঠাকুরের কথায় এমন সারল্য, সততা এবং সহৃদয়তা। কেশব ক্ষুব্ধও বোধ করলেন না। কারণ ঠাকুর তাঁর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তাঁর হিতের জন্যে, নিঃস্বার্থভাবে এবং উচ্চলোক থেকে এই ভূয়োদর্শন উচ্চারণ করলেন। মান্য করা ভিন্ন গত্যন্তর নেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে।

এই সূত্র ধরেই আরেক মহৎ তত্ত্ব শোনালেন,—'গুরু এক সচ্চিদানন্দ। তিনিই শিক্ষা দিবেন।·· লোকশিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। যদি তিনি সাক্ষাৎকার হন আর আদেশ দেন, তাহলে হতে পারে।'

এটি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম প্রধান বাণী। ঈশ্বরের আদিষ্ট না হলে সে ব্যক্তির উপদেশ বা শিক্ষার কোন ফল হবে না। ভগবৎ অনুজ্ঞা বিনা কোন কার্য স্থায়ী হতে পারে না। আরো অনেককে একথা বলেছেন

তিনি।

এখনো তেমনি কেশব সেনের তুল্য ভারত-বিখ্যাত কর্মী-পুরুষকে জানিয়ে দিলেন, 'আদেশ না হলে তোমার কথা কে শুনবে? কলকাতার হুজুগ তো জানো! যতক্ষণ কাঠ জ্বলে, দুধ ফোঁস করে ফোলে। কাঠ টেনে নিলে কোথাও কিছু নাই। কলকাতার লোক হুজুগে।...' শুধু লেকচার? দিন কতক লোক শুনবে, তারপর ভুলে যাবে।...

কলকাতাবাসীদের সম্পর্কে কি নির্মোহ মন্তব্য। তাঁর লোকপ্রজ্ঞার আরেক সমুজ্জ্বল নিদর্শন।

পুনরায়, আরো স্পষ্ট ভাষায় 'কেশবাদি ভক্তের প্রতি' বললেন,—'তোমরা বলো 'জগতের উপকার করা।' জগৎ কি এতটুকু গা। আর তুমি কে, যে জগতের উপকার করবে।'

তেমনি সত্যের তেজে প্রকৃত করণীয় নির্ধারণ করলেন—তাঁর অন্তর উৎসারী উপদেশ—'তাঁকে সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎকার করো। তাঁকে লাভ করো। তিনি শক্তি দিলে তবে সকলের হিত করতে পারো। নচেৎ নয়।'...

এমনি কথায় কথায় সেদিন দীর্ঘক্ষণের স্টীমার যাত্রা শেষ হলো। সমগ্র সময়ে একক বক্তা দেখা গেল শ্রীরামকৃষ্ণকে। আদ্যোপান্ত শ্রোতা কেশবচন্দ্র।

তাদের নানাদিনের সাক্ষাৎকার বিবরণী আছে 'কথামৃত' লিপিমালায়। প্রত্যেক দিনেই ঠাকুর ও কেশবকে একই ভূমিকায় দেখা যায়। যথাক্রমে বক্তা এবং শ্রোতা। সুতরাং অধিক উৎকলন নিষ্প্রয়োজন। শুধু দু'এক দিনের কথা উল্লেখ্য।

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে রয়েছেন রাখাল, অধরলাল, মণি মল্লিক, শ্রীম প্রভৃতির সঙ্গে (২২ জুলাই ১৮৮৩)।

একজন ভক্ত (সম্ভবত শ্রীম.) প্রশ্ন করলেন—'ব্রহ্মজ্ঞান হলে কি দলটল থাকে?'

উত্তরে ঠাকুর কেশবচন্দ্রের প্রসঙ্গ করলেন। আর শোনালেন সেই চির-

স্মরণীয় চির-পালনীয় উক্তি 'কাঁচা আমি' ও 'পাকা আমি' সম্পর্কে। বললেন, অন্য একদিনের কথায়—'কেশব সেনের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা হচ্ছিল। কেশব বললে, আরো বলুন। আমি বললুম, আর বললে দলটল থাকে না। তখন কেশব বললে, তাহলে আর থাক, মশাই। তবু কেশবকে বললুম, 'আমি' 'আমার' এটি অজ্ঞান। 'আমি কর্তা' আর আমার স্ত্রী, পুত্র, বিষয়, মান, সম্ভ্রম, এ ভাব অজ্ঞান না হলে হয় না। তখন কেশব বললে, মহাশয় 'আমি' ত্যাগ করলে যে আর কিছুই থাকে না। আমি বললুম, কেশব, তোমাকে সব 'আমি' ত্যাগ করতে বলছি না, তুমি 'কাঁচা আমি' ত্যাগ কর। 'আমি কর্তা' 'আমার স্ত্রী পুত্র', 'আমি গুরু' এসব অভিমান, 'কাঁচা আমি'—এইটি ত্যাগ কর। এইটি ত্যাগ করে 'পাকা আমি' হয়ে বসে থাকো। আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর ভক্ত, আমি অকর্তা, তিনি কর্তা।'

একজন ভক্ত অর্থাৎ শ্রীম জিজ্ঞাসা করলেন—'পাকা আমি' কি দল করতে পারে?'

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন কেশবের প্রসঙ্গ করেই—'কেশব সেনকে বললুম, আমি দলপতি দল করেছি, আমি লোকশিক্ষা দিচ্ছি, 'এ আমি কাঁচা আমি।' মত প্রচার বড় কঠিন। ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতিরেকে হয় না। ··যেমন শুকদেব ভাগবত কথা বলতে আদেশ পেয়েছিলেন। যদি ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার করে কেউ পায়, সে যদি প্রচার করে, লোকশিক্ষা দেয়, দোষ নাই। তার 'আমি' 'কাঁচা আমি' নয়, 'পাকা আমি।' কেশবকে বলেছিলাম, 'কাঁচা আমি' ত্যাগ কর। 'দাস আমি', 'ভক্তের আমি' এতে দোষ নাই। ··

আর কেশবকে বলেছিলাম, তুমি আদ্যাশক্তিকে মানো। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ—যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। যতক্ষণ দেহবুদ্ধি, ততক্ষণ দুটো বলে বোধ হয়।···কেশব কালী (শক্তি) মেনেছিল।'···

শ্রীম-র বিবরণ অনুসারে তাঁদের শেষ সাক্ষাৎকার হয় কমল কুটীরে। ১৮ নভেম্বর ১৮৮৩ কেশব ভবনে ঠাকুর তাঁকে দেখতে আসেন। তিনি

তখন গুরুতর পীড়িত। তার পাঁচ সপ্তা পরেই প্রয়াত হন কেশবচন্দ্র (৮ জানুয়ারী ১৮৮৪)।

দোতলায় 'বৈঠকখানার বারান্দায় ঠাকুরকে বসান হইল।'...

খানিকক্ষণ পরে—'কেশব ঘরে প্রবেশ করিতেছেন।...যাঁহারা তাঁহাকে ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে বা টাইন হলে দেখিয়াছিলেন তাঁহার অস্থিচর্মসার মূর্তি দেখিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। কেশব দাঁড়াইতে পারিতেছেন না, দেয়াল ধরিয়া ধরিয়া অগ্রসর হইতেছেন। অনেক কষ্টের পর কৌচের সম্মুখে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন।...কেশব ঠাকুরের দর্শনলাভ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিতেছেন। প্রণামান্তর উঠিয়া বসিলেন।...

এইবার কেশব উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন 'আমি এসেছি', 'আমি এসেছি।' এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাম হাত ধরিলেন ও সেই হাত বুলা-ইতে লাগিলেন। ঠাকুর ভাবে গর্গর মাতোয়ারা। আপনা আপনি কত কথা বলিতেছেন। ভক্তেরা সকলে হাঁ করিয়া শুনিতেছেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'যতক্ষণ উপাধি, ততক্ষণই নানা বোধ। যেমন কেশব, প্রসন্ন, অমৃত এই সব। পূর্ণ জ্ঞান হলে এক চৈতন্যবোধ হয়। আবার পূর্ণ জ্ঞানে দেখে যে, সেই এক চৈতন্য, এই জীব জগৎ চতু-র্বিংশতিতত্ত্ব হয়েছেন।...

পূর্ণ জ্ঞানের পর আরো কিছু প্রসঙ্গ করবার পর কেশবকেই লক্ষ্য করে বললেন, 'যার অন্ধকার জ্ঞান আছে; তার আলো জ্ঞানও আছে। তুমি ওটা বুঝেছ?'

কেশব সহাস্যে বললেন, 'হাঁ বুঝেছি।'

শ্রীরামকৃষ্ণ...কেশবের সহিত সহাস্যে কথা কহিতেছেন।...সকলে অবাক যে, 'তুমি কেমন আছ' ইত্যাদি কথা আদৌ হইতেছে না। কেবল ঈশ্বরের কথা!

কেশবকেই শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'ব্রহ্মজ্ঞানীরা অতো মহিমা বর্ণনা করে কেন? 'হে ঈশ্বর, তুমি চন্দ্র করিয়াছ, সূর্য করিয়াছ, নক্ষত্র করিয়াছ।'

এসব কথা এত কি দরকার ? অনেকে বাগান দেখেই তারিফ করে। বাবুকে দেখতে চায় কজন। বাগান বড় না বাবু বড়।' ··আমরা ভুলে যাই যে, ঈশ্বরই বড়, তিনিই প্রকৃত বস্তু। তাই আরো বুঝিয়ে বললেন—'কি জান ? মানুষ নিজে ঐশ্বর্যের আদর করে বলে, ভাবে ঈশ্বরও ঐশ্বর্যের আদর করেন।···(কিন্তু) ঈশ্বর কি ঐশ্বর্যের বশ ? তিনি ভক্তির বশ। তিনি কি চান ? টাকা নয়। ভাব, প্রেম, ভক্তি, বিবেক. বৈরাগ্য এইসব চান।' ··

তারপর আবার সহাস্যে কেশবকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমার অসুখ হয়েছে কেন তার মানে আছে। শরীরের ভিতর দিয়ে অনেক ভাব চলে গেছে, তাই ঐ রকম হয়েছে।' ·

এমন আশ্চর্য কথা কেশবচন্দ্রের ব্যাধি সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অপর কেউ বলেননি—এমন ভাবের কথা।

কিছুক্ষণ পরে কেশব-জননীর পক্ষে উমানাথ বললেন. ঠাকুরকে, 'মা বলছেন, কেশবকে আশীর্বাদ করুন।'

এতক্ষণ সহাস্যে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। একথা শুনে কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন। গম্ভীর কণ্ঠে স্মরণ করিয়ে দিলেন, ভগবানই কর্তা। বললেন, 'আমার কি সাধ্য। তিনিই আশীর্বাদ করবেন। ঈশ্বর দুইবার হাসেন। একবার হাসেন যখন দুই ভাই জাম বখরা করে · 'এদিকটা আমার, ও দিকটা তোমার।' ··ঈশ্বর আর একবার হাসেন। ছেলের অসুখ সঙ্কটাপন্ন। মা কাঁদছে। বৈদ্য এসে বলছে, ভয় কি মা, আমি ভাল করবো। বৈদ্য জানে না, ঈশ্বর যদি মারেন, কার সাধ্য রক্ষা করে।'

একথা শুনে 'সকলেই নিস্তব্ধ।'

কি তাৎপর্যপূর্ণ ঠাকুরের শেষ বাক্যটি। কেশব জননীর উদ্দেশেই উচ্চারিত। কেশবের অন্তিমকাল ঘনিয়ে এসেছে তা তিনি বুঝেছিলেন। সেজন্যেই তাঁর এই উক্তি।

'ঠিক এইসময় কেশব অনেকক্ষণ ধরিয়া কাশিতে লাগিলেন। সে কাশি আর থামিতেছে না। সে কাশির শব্দ শুনিয়া সকলের কষ্ট হইতেছে।···

কেশব আর থাকিতে পারিতেছেন না। ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।...অনেক কষ্টে দেয়াল ধরিয়া...নিজের কামরায় পুনরায় গমন করিলেন।'

কেশবের মৃত্যুর মাত্র চার দিন আগে তাঁর কথা উঠেছিল দক্ষিণেশ্বরে। 'সংবাদ আসিয়াছে। শ্রীযুক্ত কেশব সেনের অসুখ বাড়িয়াছে। তাঁহারই কথাপ্রসঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের কথা হইতেছে।'

মণি (শ্রীম-রই ছদ্মনাম) মন্তব্য করলেন, 'কেশববাবু প্রথম প্রথম যদি এখানে আসতেন তাহলে সমাজ সংস্কার নিয়ে ব্যস্ত হতেন না। জাতি-ভেদ উঠানো, বিধবা বিবাহ, অন্য জাতে বিবাহ, স্ত্রী শিক্ষা ইত্যাদি সামাজিক কর্ম লয়ে অত ব্যস্ত হতেন না।'

শ্রীম. প্রথমে ছিলেন কেশবের অনুগামী, ঠাকুরের কাছে আসার আগে। তিনি কেশবচন্দ্রের আত্মীয়ও। ব্রাহ্ম সমাজে প্রথম যৌবনে যেতেন কেশবচন্দ্রের আকর্ষণে।

আজ তিনিই বলছেন—কেশব প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে উপনীত হলে, সমাজসংস্কারের কাজে এত জড়িত হতেন না। অর্থাৎ অধিক মগ্ন থাকতেন ধর্মজীবনে।

একথার তাৎপর্য এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর ভাবে প্রভাবিত করেন কেশবের ধর্মজীবন। আর তা শ্রীম-র প্রত্যক্ষ গোচর।

শ্রীম-র এই কথার উত্তরে ঠাকুর বললেন, 'কেশব এখন কালী মানেন —চিণ্ময়ী কালী—আদ্যাশক্তি। আর মা মা বলে তাঁর নামগুণ কীর্তন করেন।' (কথামৃত, চতুর্থ ভাগ—১৩, ৩)।

কেশব প্রয়াণের সাড়ে চার মাস পরের কথা। সেদিন দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কাছে ছিলেন অধর সেন, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল প্রমুখ।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথাপ্রসঙ্গে বললেন, 'কেশব সেন খুব আসত। এখানে এসে অনেক বদলে গেল। ইদানিং খুব লোক হয়েছিল। এখানে অনেকবার এসেছিল দলবল নিয়ে। আবার একলা একলা আসবার ইচ্ছা ছিল। কেশবের আগে তেমন সাধুসঙ্গ হয় নাই।...তারা এলেই আমি নম-

স্কার করতুম, তখন ওরা ক্রমে ভূমিষ্ঠ হয়ে নমস্কার করতে শিখলে। আর কেশবকে বললাম, 'তোমরা হরিনাম করো, কলিতে তাঁর নাম কীর্তন করতে হয়। তখন ওরা খোল করতাল নিয়ে হরিনাম ধরলে।'

শ্যামাসঙ্গীতও আরম্ভ করেন কেশব, শ্রীরামকৃষ্ণরই প্রভাবে ও দৃষ্টান্তে। তার আগে কেশবচন্দ্র শুধু ব্রহ্ম সঙ্কীর্তন করতেন সদলে।

শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর মান্য করা সম্পর্কে আরেকটি তথ্যও জানা যায়, ঠাকুরেরই স্মৃতিচারণে—'দেখ কেশব এত বড় পণ্ডিত ইংরাজিতে লেকচার দিত, কত লোক তাকে মানত; স্বয়ং কুইন ভিক্টোরিয়া তার সঙ্গে কথা কয়েছে। সে কিন্তু এখানে যখন আসত, শুধু গায়ে; সাধু দর্শন করতে হলে হাতে কিছু আনতে হয়, তাই ফল হাতে করে আসত। ' (৫ম-১৫,৪)

কেশব সম্পর্কে ঠাকুরের বিশ্লেষণ সর্বাত্মক। তার পরিচয় আছে তাঁর নানাদিনের উক্তিতে। যেমন—

কেশবের 'ধ্যানটুকু ছিল বলে ঈশ্বরেচ্ছায় যেগুলো মনে করেছিল (মান-টানগুলো) হয়ে গেল।'

একদিন তিনি সদলে এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। কথায় কথায় রাত দশটা বেজে গেল। তখন প্রতাপ ও তাঁর আরো কোনো কোনো সঙ্গী বললেন, 'আজ এখানে থেকে যাব।'

কিন্তু কেশবচন্দ্র রাজী হলেন না—'না, কাজ আছে, যেতে হবে।'

অমনি শ্রীরামকৃষ্ণ সকৌতুকে বললেন, 'আঁশ্‌চুপড়ির গন্ধ না হলে কি ঘুম হবে না?'

সেই মেছুনী ও ফুলের গন্ধের উপমা দিলেন সহাস্যে। মেছুনী তার বন্ধু মালিনীর ঘরে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে ঘুমোতে পারছিল না ফুলের গন্ধে। তখন তার আঁশ্‌চুপড়িটা পাশে এনে দিলে, ঘুমোতে পারে। তেমনি কেশবকেও গৃহস্থের অভ্যস্ত ভোগের ইঙ্গিত করলেন ঠাকুর। এত রাত্রে বাড়ি ফিরে আর কি কাজ? বিবাহিত জীবনের নিশিভোগ নিয়ে রহস্য করলেন—এত বিখ্যাত নেতাকে, তাঁর অনুগামীদেরই

ামনে। সরস আকারে হলেও ব্যাপারটি লঘু নয় কেশবের পক্ষে। কিন্তু পরিহাস হলেও তিনি প্রতিবাদ করতে পারলেন না, যদিও স্বয়ং সুরসিক বাক্‌পটু।

আরেকদিনের বিবরণে আছে—'শ্রীযুক্ত কেশব সেনের দ্বারা লোকশিক্ষা হল না কেন' এই প্রসঙ্গে—

শ্রীযুক্ত কেশব সেন কামিনী কাঞ্চনের ভিতর ছিলেন। তাই লোক-শিক্ষার ব্যাঘাত হইল। ঠাকুর এই কথা বলিতেছেন।···

শ্রীরামকৃষ্ণ—এদিক ওদিক দুদিক রাখতে গিয়ে তেমন কিছু পারলেন না।' (চতুর্থ—১৩,৪)।

কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ কথোপকথনের উপসংহারে প্রতাপ মজুমদারের প্রসঙ্গও বর্ণনীয়। ঠাকুর ও মজুমদার মহাশয়ের একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার।

কেশব সেনের প্রধান সহযোগী, একান্ত অনুগামী এবং দক্ষিণহস্ত স্বরূপ প্রতাপচন্দ্র (১৮৪০-১৯০৫)। অধিনায়কের পরবর্তী স্বনামপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম নেতা তিনি। যেমন বাগ্মী তেমনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে অক্লান্তকর্মা। প্রচারকরূপে তিনিও ভারতের নানাস্থান কেবল পরিভ্রমণ করেন নি, গিয়েছিলেন ইউরোপ, আমেরিকা এবং জাপানেও। শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনেও তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন। 'ইন্টার প্রেটার' নামে ইংরেজী মাসিক পত্রের সম্পাদক প্রতাপচন্দ্র। সাংবাদিক এবং ইংরেজীতে লেখকরূপেও পরিচিত। 'ওরিয়েন্টাল ক্রাইস্ট', 'স্পিরিট অফ্ গড', 'লাইফ্ এ্যাণ্ড টাইম্স্ অফ্ কেশবচন্দ্র সেন' প্রভৃতি পুস্তকের রচয়িতা তিনি।

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তিনি যেতেন দক্ষিণেশ্বরে। নেতার মৃত্যুর পরেও ঠাকুরের কাছে যাতায়াত রাখেন।

এমনি একদিনের (১৫ জুন, ১৮৮৪) কথা। কেশবচন্দ্র গত হয়েছেন তার পাঁচ মাস আগে।

ঠাকুর সেদিন সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের কাঁকুড়গাছি বাগানে এসেছেন।

সংবাদ পেয়ে প্রতাপচন্দ্র উপস্থিত হয়েছেন সেখানে।

শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক প্রসঙ্গ করলেন প্রতাপের সঙ্গে। কেশব এবং ব্রাহ্ম আন্দোলনের কথাও উঠলো।

ঠাকুর বললেন প্রতাপকে, 'দেখ, তোমায় বলি, তুমি লেখাপড়া জান বুদ্ধিমান গম্ভীরাত্মা। কেশব আর তুমি ছিলে, যেন গৌর নিতাই দু ভাই। লেকচার দেওয়া, তর্ক, ঝগড়া, বাদ বিসম্বাদ এসব তো অনেক হলো। আর কি এসব তোমার ভাল লাগে? এখন সব মনটা কুড়িয়ে ঈশ্বরের দিকে দাও। ঈশ্বরেতে এখন ঝাপ দাও।'

প্রতাপচন্দ্র অস্বীকার করতে পারলেন না এমন সদুপদেশ ও অকাট্য যুক্তি। তবু বললেন, 'আজ্ঞা হা, তায় সন্দেহ নাই, তাই করা কর্তব্য। তবে এ সব করা যাতে তাঁর নামটা থাকে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, 'তুমি বলছো বটে, তাঁর নাম রাখবার জন্য সব করছো, কিন্তু কিছুদিন পরে এ ভাবও থাকবে না। একটা গল্প শুন।' বলে, সেই ঝড়ের মুখে কুড়ে ঘরটির উপমা দিলেন।

তারপর বললেন, 'কেশবের নাম তোমায় রক্ষা করতে হবে না। যা কিছু হয়েছে, জানবে—ঈশ্বরের ইচ্ছায়। তাঁর ইচ্ছাতে হলো, আবার তাঁর ইচ্ছাতে যাচ্ছে, তুমি কি করবে?' একেবারে সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁদের প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলন সম্পর্কে প্রকাশ করলেন তাঁর বহুদর্শী ধারণা। আর প্রতাপচন্দ্রের কি করণীয় তার সর্বোত্তম নির্দেশ দিলেন,—'তোমার এখন কর্তব্য যে ঈশ্বরেতে সব মন দাও। তাঁর প্রেমের সাগরে ঝাপ দাও।'

প্রতাপচন্দ্র কোনো প্রকার দ্বিমত প্রকাশ করতে অপরাগ হলেন।

তারপর তিনি বিদায় নেবার সময় পুনরায় বললেন তাঁকে, 'আর কি বলবো তোমায়? তবে এই বলা যে আর ঝগড়া বিবাদের ভিতর থেকো না।'

শ্রীরামকৃষ্ণের কি বিরাট ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় এই ধরনের কথাবার্তা এমন সব ব্যক্তিকে শোনাবার সময়।

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৩১—১৯০৮)। শ্রীরামকৃষ্ণের সমসাময়িক বাংলার আরেক স্বনামধন্য ব্যক্তি। চিত্তে এবং বিত্তের নানা গুণে, যশে মানে পারিবারিক গৌরবে দেশের প্রথম সারির অন্যতম প্রসিদ্ধ পুরুষ যতীন্দ্রমোহন।

পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর বংশের এক সমুজ্জ্বল প্রতিভূ। ধনকুবের গোপীমোহনের পৌত্র তিনি। হরকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপেও যথেষ্ট সম্পদশালী ছিলেন যতীন্দ্রমোহন। উপরন্তু কনিষ্ঠ তাত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উত্তরাধিকারী হয়েছেন। পূর্ব-যুগের সদর দিওয়ানী সদর নিজামত আদালতের (কলিকাতা হাইকোর্টের পূর্ব-সূরী) শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবীরূপে প্রভূত উপার্জন করেছিলেন প্রসন্নকুমার। তাঁর পৈত্রিক জমিদারী ইত্যাদি যাবতীয় ধনসম্পত্তি সমেত সোপার্জিত সমস্তই পোষ্য পুত্র যতীন্দ্রমোহনকে প্রদত্ত। একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করায় প্রসন্নকুমার তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন এবং আইনত পোষ্যপুত্র নেন যতীন্দ্রমোহনকে।

একদিকে পারিবারিক ঐতিহ্যে এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যতীন্দ্রমোহনের গণ্যমান্য অবস্থান। অপরদিকে ইংরেজ সরকারী মহলে, রাষ্ট্রীয় জগতে প্রভূত প্রতিপত্তি তাঁর সামাজিক আর্থিক প্রতিষ্ঠার কারণে।

ভারতীয় সঙ্গীত ও সঙ্গীত-গুণীদের মুক্তহস্ত পৃষ্ঠপোষক তিনি। ভ্রাতা সৌরীন্দ্রমোহনের সহযোগে তাঁর সঙ্গীত-সভা তখনকার ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকেন্দ্র। নানা প্রথম শ্রেণীর কলাবতের যোগদানে সমৃদ্ধ। তাঁর প্রধান নিযুক্ত সভা-গায়ক স্বনামপ্রসিদ্ধ গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী। বারাণসীর কৃতী বীণকার ও ধ্রুপদীদের সমাগমে উচ্চমানের চর্চা তাঁর সঙ্গীত সভায়, সঙ্গীত-দরবারের তুল্য যার মর্যাদা। বহু গায়ক বাদকদের আসরে ধন্য।

কলকাতায় সৌখীন নাট্যশালারও অন্যতম স্থাপনকর্তা যতীন্দ্রমোহন। শহরে পেশাদার রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার পূর্বে চারটি অব্যবসায়ী মঞ্চের একটি তাঁর 'পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়।' নাটকাভিনয় এবং সঙ্গীতের জন্যে

বিদগ্ধজনের স্বীকৃতি পায়, স্বল্পজীবী হলেও।

যতীন্দ্রমোহন স্বয়ং গীতরচয়িতা এবং নাট্যকারও। অনেক গান তাঁর রচনা। একটি গীত-পুস্তকও তাঁর প্রকাশিত হয়েছিল। 'বিদ্যাসুন্দর' গীতি-নাট্যের তিনি প্রণেতা।

কাব্য-সাহিত্যপ্রেমী যতীন্দ্রমোহন। মাইকেল মধুসূদনের গুণগ্রাহী সুহৃদ। তাঁরই সঙ্গে ছন্দোবিষয়ে বিতর্কের উপলক্ষে মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্য রচনা। মধুসূদন কাব্যটি যতীন্দ্রমোহনকেই উৎসর্গ করেন। মহারাজা তার প্রকাশক তথা পুরস্কারদাতাও। 'তিলোত্তমা'র মূল পাণ্ডুলিপিও মাইকেল উপহার দেন যতীন্দ্রমোহনকে, কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ।

অন্য পক্ষে ভূস্বামী সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা ঠাকুর মহোদয। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র প্রভাবে এবং সম্মানে দেশীয়দের মধ্যে একজন শীর্ষস্থানীয়। প্রথমে (১৮৭০) প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হন। পরে মনোনীত সভ্য হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভারও। স্বদেশীযদের এক মাননীয় নেতারূপে বহুজন হিতকর কাজে তাঁর বদান্যতাও সুবিদিত। নানা জাতীয়তাপোষাক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যুক্ত তিনি।

কবি এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নবীনচন্দ্র সেনের আত্মজীবনী 'আমার জীবন' সেকালের নানা কৌতূহলোদ্দীপক ও জ্ঞাতব্য বিবরণে পূর্ণ, লেখকের অহং-ভাবের কিছু আধিক্য সত্ত্বেও। বিশেষ উল্লেখযোগ্য নানা বিখ্যাত ব্যক্তির চরিত্র-চিত্রণ নবীনচন্দ্রের লেখনীতে। তাঁর লেখা থেকে যতীন্দ্রমোহনের কিছু বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত হলো :—

> 'আর এ সময়ে বঙ্গের বরপুত্রেরা সকলেই খর্বাকৃতি—শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর। ইঁহাদের মধ্যে আরেকটি সাদৃশ্য—তাঁহাদের simple life, বিলাসশূন্য জীবন। যতীন্দ্রমোহন রাজপ্রাসাদবাসী হইলেও যে কক্ষে সমস্ত দিবস অতিবাহিত করেন তাহাতে একখানি পুরাতন 'ছোপা', কয়েকটি চেয়ার ও একটি

শ্বেত প্রস্তরের টেবেল মাত্র আছে।...যতীন্দ্র প্রকৃত জ্যোতির ইন্দ্র,—একখণ্ড অমূল্য হীরক। তিনি যৌবনে মাইকেলের বন্ধু এবং নিজে বাংলা সাহিত্যসেবী ছিলেন এবং বাংলা সাহিত্যের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার মার্জিত শিক্ষা, মার্জিত রুচি এবং মার্জিত ও শাণিত বুদ্ধি। এই বুদ্ধি-বলেই ইনি বাবু যতীন্দ্রমোহন হইতে আজ স্যার মহারাজা হইয়াছেন। অনেক উপাধিধারীদের মত তিনি কেবল খোসা-মুদীর দ্বারা বিলাতী বুটের পূজা করিয়া, কিম্বা অর্থের দ্বারা যথা মূল্যে কিনিয়া উপাধি লন নাই। ক্ষুদ্র অবয়বটিতে ঈশ্বর অসাধারণ চতুরতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং চরিত্রের দৃঢ়তা দিয়াছেন।' (আমার জীবন, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ১৩৯-১৪০, ১৫৩—নবীনচন্দ্র সেন)।

এ হেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্তা হয় শ্রীরামকৃষ্ণের। তাঁর চেয়ে পাঁচ-ছ বছর বয়োজ্যেষ্ঠ যতীন্দ্রমোহন।

তাঁদের সেই সাক্ষাৎকারের স্থান—যদুলাল মল্লিকের বাগানবাড়ি, দক্ষিণেশ্বরে। রাণী রাসমণির মন্দির উদ্যানের পাশেই।

ঠাকুরের এক প্রিয় গৃহীভক্ত যদুলাল মল্লিক। তিনিও মহাধনী এবং পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীট নিবাসী। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অতি নিকট প্রতি-বেশী যদু মল্লিক। পরস্পরের ঘনিষ্ঠ পরিচয়।

সেদিন যতীন্দ্রমোহন এসেছিলেন যদুলালের দক্ষিণেশ্বর বাগানে। শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থান রাণী রাসমণির কালী মন্দির এলাকার সংলগ্ন মল্লিক মহাশয়ের বাগান।

তিনিও তখন সেখানে ছিলেন এবং ঠাকুরও উপস্থিত। যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে সেই তাঁর প্রথম আলাপ এবং পরিচয়।

তাঁদের সেই সাক্ষাৎকারের উল্লেখ আছে, 'কথামৃত'তে, ১৮৮২ সালের ১৬ অক্টোবর তারিখে। কিন্তু তা ঘটেছিল অনেক পূর্বে। ওই বছরের প্রায় দু যুগ আগেকার সে কথা। শ্রীম. তা বিবৃত করেছেন 'পূর্বকথা'

হিসাবে। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের কথিত। যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে তাঁর সেই সাক্ষাৎ হয় ১৮৫৮ সালে, কিংবা তার অব্যবহিত পরে। তারিখ জানা যায় নি। ঠাকুরের বয়স তখন বছর বাইশ হবে এবং যতীন্দ্রমোহনের সাতাশ আটাশ।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে তা হলো '.প্রেমোন্মাদ' অবস্থাকালীন। তাঁর সাধন পর্বের প্রথম দিকের কথা। তার বহু বছর পরে ঠাকুর স্বয়ং তার বিবৃতি দেন দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীম. প্রমুখের সামনে, ওই ১৮৮২ সালে। অনন্য স্মরণ-শক্তি তাঁর এখানেও সুপ্রকাশ। জীবনের বহু পূর্ব প্রসঙ্গ, কত বছর আগেকার কত খ্যাত অখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথনের প্রতিবেদন দিয়েছেন। কত ঘটনাদির উল্লেখ করেছেন অন্যান্য সময়ে। সেদিনও তেমনি। তখন নরেন্দ্র এসেছিলেন। তাই ঠাকুরের বড় আনন্দ। আরো উপস্থিত রাখাল, শ্রীম, রামলাল, আর কোনো কোনো ভক্ত।

নরেন্দ্রের দিকে চেয়ে ঠাকুর 'পূর্বকথায়' সেই 'প্রেমোন্মাদ' অবস্থার বর্ণনা করছিলেন—

'আমার এই অবস্থার পর কেবল ঈশ্বরের কথা শুনবার জন্যে ব্যাকুলতা হতো। কোথায় ভাগবত, কোথায় অধ্যাত্ম, কোথায় মহাভারত খুঁজে বেড়াতাম।...

উন্মাদ অবস্থায় লোককে ঠিক ঠিক কথা, হক কথা, বলতুম। কাউকে মানতাম না। বড লোক দেখলে ভয় হতো না।'

এমন একদিনে যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে তাঁর আলাপ।

ঠাকুর সে বিষয়ে বলেন, 'যদু মল্লিকের বাগানে যতীন্দ্র এসেছিল। আমিও সেখানে ছিলুম।'

পরিচয়াদির পর যতীন্দ্রমোহনকে একটি প্রশ্ন করেছিলেন—'আমাদের কর্ত্তব্য কি ?'

শুধু জিজ্ঞাসা করেই ক্ষান্ত হন নি। উত্তরও দিয়ে দেন প্রশ্নের সঙ্গেই। যে উত্তর দানের জন্যে, যে বাণী সকলের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে তাঁর জগতে অবতরণ—তা স্বয়ং জানিয়ে দেন যতীন্দ্রমোহনকে, প্রশ্ন-

চ্ছলেই। বলেন—'ঈশ্বর চিন্তাই আমাদের কর্তব্য কিনা?'
যতীন্দ্রমোহন কিন্তু তা অনুধাবন করলেন না। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেন পথ নির্দেশ পেয়েও। তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি বৃথা প্রমাণিত হলো।
তিনি উত্তর দিলেন নিতান্ত সাধারণ লোকের নিরিখে, অপরাধ স্বীকারের কৈফিয়তে—'আমরা সংসারী লোক। আমাদের কি আর মুক্তি আছে। রাজা যুধিষ্ঠীরই নরক দর্শন করেছিলেন।'
এই উত্তর শুনে—শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বলছেন পূর্বকথায়, 'আমার বড় রাগ হল। বললাম, তুমি কিরকম লোক গা? যুধিষ্ঠীরের কেবল নরক দর্শনই মনে করে রেখেছো? যুধিষ্ঠীরের সত্য কথা, ক্ষমা, ধৈর্য, বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরভক্তি এসব কিছু মনে হয় না?'
যতীন্দ্রমোহনকে তিরস্কারের তুল্যই শোনাল ঠাকুরের এই স্পষ্ট ভাষণ। বাস্তবিক যতীন্দ্রমোহনের কৈফিয়তে যুক্তির ফাঁকি ছিল। জ্ঞানকৃত এটিকে মেনে নেওয়া। ইচ্ছাকৃত অকর্তব্যকে প্রশ্রয় দেওয়া। মানব জীবনের পরম লক্ষ্য থেকে সাধ করে ভ্রষ্ট হওয়া।
শ্রীরামকৃষ্ণ ধিক্কার দিলেন এই বিচ্যুতিকে। মানুষের আদর্শকে সর্বদা সামনে রাখা কর্তব্য। লক্ষ্য থাকবে উচ্চ দিকে। যুধিষ্ঠীরের জীবনের প্রধান স্মরণীয় নয়—নরক দর্শন। তাঁর মহৎ গুণাবলী—ঈশ্বরভক্তি, ন্যায়পরায়ণতা, ক্ষমা, বিবেক, বৈরাগ্য—স্মরণ অনুসরণ করা উচিত। বিচ্যুতির বিষয়ে, ত্রুটির বিষয়ে মন নিবিষ্ট রাখলে অধোগামী হয়ে পড়ে। এই শিক্ষা ঠাকুর দিতে চাইলেন তাঁকে।
এমন সতেজ প্রত্যুত্তর যতীন্দ্রমোহনের অভাবিত ছিল নিশ্চয়। তিনি যুধিষ্ঠীরের নরক দর্শনের উল্লেখে হয়ত ভেবেছিলেন বিনয়ও প্রকাশ করা হলো আর অকাট্য যুক্তিরও বাক্য। কিন্তু কার সঙ্গে তিনি প্রসঙ্গ করছেন তা তাঁর ধারণার অতীত।
এই তিরস্কার মিশ্রিত দৃপ্ত ভাষণে যতীন্দ্রমোহন নির্বাক হয়ে রইলেন। শুধু তাই নয়, অচিরেই পলায়নপর হলেন, 'আমার একটু কাজ আছে' বলে। শুধু ঠাকুরের সান্নিধ্য কিংবা সেই কক্ষ থেকেই নয়, একেবারে

যদু মল্লিকের বাগান ত্যাগ করে গেলেন।
সেই একদিনের সাক্ষাতেই শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি এমনই মনে রাখেন যে পরেও আর উপস্থিত হতে পারেন নি তাঁর সমক্ষে।
ওই ঘটনার অনেক পরবর্তীকালে ঠাকুর একদিন তাঁদের পাথুরিয়াঘাটা ভবনে এসেছিলেন। তখন যতীন্দ্রমোহনকে সংবাদ দেওয়া হয় শ্রীরাম-কৃষ্ণের উপস্থিতির কথা জানিয়ে।
কিন্তু যতীন্দ্রমোহন অন্দর মহল থেকে বলে পাঠালেন, 'আমার গলায় বেদনা হয়েছে।'
ঠাকুরের সঙ্গে আর কখনো তাঁর সাক্ষাৎ হয় নি।

শ্রীরামকৃষ্ণের এমনি তেজস্বী ভাষণ শুধু 'প্রেমোন্মাদ' পর্যায়ের অন্ত-র্গতই নয়। তাঁর এই স্বভাব জীবনের সব পর্বেই সুপ্রকাশ। বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ নানা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির প্রসঙ্গেই তার পরিচয় পাওয়া গেছে। ওই একই প্রশ্ন শ্রীরামকৃষ্ণ করেছিলেন কৃষ্ণদাস পালকেও—'আমাদের কর্তব্য কি ?'
মনে হয়, এই জিজ্ঞাসা দিয়ে তিনি উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে পরীক্ষা করতেন। হয়ত বুঝতে চাইতেন তাঁর অন্তর প্রকৃতি। জানতে চাইতেন তাঁর প্রকৃত জ্ঞান বুদ্ধি কি প্রকার।
বঙ্কিমচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহনের মতন তিনি কৃষ্ণদাস পালকে (১৮৩৮–১৮৮৪) অনুরূপ প্রশ্ন করেন। আর কোনো ব্যক্তিকে সেকথা জিজ্ঞাসা করেন কিনা তা অজ্ঞাত। তাঁর বাণীর কতটুকু অংশ লিপিবদ্ধ আছে শ্রীমর বিবরণীতে? জীবনের শেষ চার বছরের ১৭৯টি মাত্র দিনের প্রতিবেদন। অবশিষ্ট মুখর কালের অজস্র কথোপকথনে আর কাকেও এই জিজ্ঞাস্যের সম্মুখীন করেন কিনা, কে জেনেছে!
যে কৃষ্ণদাস পালকে প্রশ্নটি করলেন, তিনি সেকালের এক বহু বিখ্যাত পুরুষ, যদিও একালে প্রায় বিস্মৃত, অপরিচিত। বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর বা কেশবচন্দ্রের তুল্য তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল না বটে। কিন্তু কৃষ্ণদাসের যা

বিশিষ্ট কর্মক্ষেত্র—রাজনীতিক জগৎ—সেখানে তিনি যথেষ্ট কীর্তিত। মহা করিৎকর্মা ব্যক্তিরূপে প্রখ্যাতনামা, সুপ্রতিষ্ঠিত। যেমন কুশলী রাজনীতিজ্ঞ, তেমনি কৃতী বাগ্মী। সাংবাদিক পরিচয়েও সমধিক প্রসিদ্ধ। হরীশ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে প্রতিপত্তিশালী পত্রিকা 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কৃষ্ণদাসের সম্পাদকীতায়ও আপন গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শেই হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক নিযুক্ত হন কৃষ্ণদাস। আর বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন তাঁর সুদীর্ঘকালের রাজনৈতিক কার্য-ধারার কেন্দ্র ও মাধ্যম হয়ে থাকে।

অল্প বয়স থেকেই তাঁর মেধা, কার্যক্ষমতা প্রকাশ পায়। মাত্র বিশ বছর বয়সে দায়িত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে তিনি যুক্ত। তার সহ-সম্পাদক রূপে সেই ১৮৫৮ থেকে। দীর্ঘ একুশ বছর পরে তার স্থায়ী সম্পাদক হলেন (১৮৭৯)।

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনে সক্রিয়তার জন্যেই কৃষ্ণদাস রাজনীতিক জগতে এত প্রভাবশালী হয়েছিলেন। তাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল শাসক মহলেও। কারণ তিনি নরমপন্থী রাজনীতির সেবক ও ধারক।

কৃষ্ণদাসের উদযোগেই হিন্দু পেট্রিয়টের মালিকানা আসে বৃটিশ ইণ্ডি-য়ান এ্যাসোসিয়েশনের হাতে।

ইংরেজ সরকারী মহলে কৃষ্ণদাসের স্বীকৃতি লাভের আর এক সাক্ষর তাঁর 'জাস্টিস্ অফ দি পীস' পদের সম্মান প্রাপ্তি। তা হলো ১৮৬৩ সালে। তা ভিন্ন, তিনি মিউনিসিপাল কমিশনারও হয়েছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন ১৮৭২ সালে। তাঁর পাঁচ বছর পরে (১৮৭৭) রায় বাহাদুর খেতাবও পান।

তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভারও সদস্য হন শেষ জীবনে। ১৮৮৩তে। তার পরের বছরেই মৃত্যু হয় কৃষ্ণদাসের। মাত্র ৪৬ বছর তাঁর পরমায়ু। কেশব সেনের তিনি শুধু সমবয়সী নন। জন্মসনের মতন তাঁদের প্রয়াণ সালও একই—১৮৮৪। বঙ্কিমচন্দ্রেরও সমবয়সী কৃষ্ণদাস, শ্রীরামকৃষ্ণের দু বছরের কনিষ্ঠ।

অপেক্ষাকৃত অল্পায়ু হলেও সে যুগের বাংলার এক স্মরণীয় সন্তান কৃষ্ণদাস পাল। পরে তাঁর স্মারকরূপে কলেজ স্ট্রীট-হ্যারিসন রোডের সংযোগ স্থলে একটি মর্মর মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল। সেটি আজো স্বস্থানে বিদ্যমান, যদিও লোকচক্ষুর অন্তরালে, অবহেলিত অবস্থায়।

সেকালে কৃষ্ণদাসের মৃত্যুতে একটি শোকগাথা রচনা করেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। কবিতাটি শুধু মর্মস্পর্শী নয়। প্রয়াত নেতার নানামুখীন গুণবান চরিত্রের, বিশেষ তাঁর দেশসেবার প্রতি কবি, মনস্বী, দেশভক্ত, নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ। নাট্যাচার্যের 'কবিতাবলী', প্রথম ভাগ থেকে সেটি এখানে স্মরণ করা যায়—

শুয়েছ পুরুষ সিংহ অনন্ত শয়নে,
নিদ্রা যাও বৃন্তহীন কুসুম-শয্যায়,
নিদ্রা যাও ভারতের গোপন স্বপনে,
জাগিয়াছ আজীবন জন্মভূমি দায়।
নিদ্রা যাও কুসুম শয্যায়।

অবিশ্রান্ত রণে ক্লান্ত ঢালিয়াছ কায়,
নিদ্রা যত দৃঢ়ব্রত স্বদেশবৎসল,
বিশ্রাম কর হে স্বীয় কীর্তি গরিমায়,
আছে তো ভারত-ভাগ্যে রোদন কেবল।
নিদ্রা যাও স্বদেশ-বৎসল।

কর্মক্ষেত্রে মহা কৃতি আদর্শ মানব,
সহায সম্পদ মাত্র আত্ম-বলিদান;
মাতৃকোলে শুয়ে শিশু শুনিবে গৌরব,
ভয়ে ভীত উত্তেজিত হবে কত প্রাণ,—
আদর্শ এ আত্ম-বলিদান!

সুখে দুঃখে অটল নির্ভীক মৃত্যুদ্বারে,
জন্মভূমি-অনুরাগ কার্য উচ্চ আশ;
প্রত্যয় না করে বঙ্গ শুধে বারে বারে,

সত্তা নাহিক আর—নাহি কৃষ্ণদাস?
'নাহি কৃষ্ণদাস' কহে কঠোর নৈরাশ।

অন্য একটি লেখায়ও কৃষ্ণদাসকে 'আদর্শ পুরুষ' আখ্যাত করেছেন স্বদেশ প্রেমিক গিরিশচন্দ্র। সাংবাদিকব্রত রূপে পাল মহাশয়কে শ্রেষ্ঠ সম্পাদকদের সঙ্গে আসন দিয়ে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। 'সম্পাদক' নামে একটি প্রবন্ধে লেখেন গিরিশচন্দ্র—'বঙ্গদেশেও এরূপ মহানুচেতা সম্পাদকের উদ্ভব হইয়াছিল। সম্পাদক ব্যবসায়ী নহে, দেশহিতৈষী—সম্পাদক কষ্টার্জিত অর্থব্যয়ে নীলকর পীড়িত প্রজাদিগের অন্ন জোগাইয়া প্রজাপীড়ন দমন করিয়া 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র নাম বিশ্বব্যাপী করিয়াছিলেন। আদর্শ-পুরুষ কৃষ্ণদাস সেই সম্পাদকীয় আসন গ্রহণে ও মহা যোগ্য ব্যক্তির সাহায্যে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনকে রাজপ্রতিনিধির রাজকার্যে উপদেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।'

সেকালের স্বদেশ-সচেতন বিশিষ্ট কবি নবীনচন্দ্র সেন। তিনিও আরেক প্রকার গৌরবে কৃষ্ণদাস পালের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কবিতায় নয় অবশ্য। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্রের যে আত্মজীবনীর কথা বলা হয়েছে, সেই 'আমার জীবন' গ্রন্থে। পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ সেই আত্মকাহিনীতে তাঁর সঙ্গে পরিচিত সেকালে নানা কৃতী ব্যক্তির প্রসঙ্গও আলোচিত। সমকালীন অনেকের স্মৃতিচিত্রণ রূপেও মূল্যবান নবীনচন্দ্রের এই গদ্যসাহিত্য, লেখকের সুপরিস্ফুট অহমিকা সত্ত্বেও।

'আমার জীবন' পঞ্চম ভাগে কৃষ্ণদাস সম্পর্কে নবীনচন্দ্র মন্তব্য করেছেন, তির্যকভাবে। সেকালীন স্বদেশের প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'বিধাতার কিরূপ নির্বন্ধ জানি না। একসময়ে বঙ্গদেশের প্রধান তিন ব্যক্তি ছিলেন, তিন জনেই কদাকার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণদাস পাল, প্যারীচরণ সরকার।' (আমার জীবন, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ১৩৯-৪০—নবীনচন্দ্র সেন)।

অপ্রিয় ভাষণ হলেও, নবীনচন্দ্রের এই অভিমতে, কৃষ্ণদাস পাল তৎকালীন বাংলায় তিন প্রধান পুরুষের অন্যতম। উচ্চ রাজকর্মচারী নবীন চন্দ্রের এমন শ্রদ্ধাজ্ঞাপন স্মরণ রাখবার যোগ্য। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-

সাগরের সঙ্গে একসূত্রে উল্লেখিত হয়েছেন কৃষ্ণদাস।

'কথামৃত' অনুসারে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মাত্র একদিন সাক্ষাৎকার হয় কৃষ্ণদাসের। তার তারিখও সঠিক জানা যায় নি। তবে তা 'কথামৃত' রচনা আরম্ভ হবার সময়ের (ফেব্রুয়ারি ১৮৮২) কয়েক বছর পূর্ববর্তী। শ্রীম. 'পূর্বকথা' নামে ঠাকুরের যত উক্তি ও ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন, কৃষ্ণদাস পাল প্রসঙ্গত তার মধ্যে একটি।

১৮৮৪ সালের ১১ অক্টোবর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই সাক্ষাৎকারের স্মৃতিচারণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সেই দেখা হয় সম্ভবত ১৮৭৫-এর পরে কোনো সময়ে। ঐ বছর থেকে কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' প্রমুখ পত্র-পত্রিকায় প্রচার করতে থাকেন। তারপর থেকেই কলকাতায় নানা শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহলী হন এবং তাঁকে সাক্ষাৎ করতে যেতেন দক্ষিণেশ্বরে। কৃষ্ণদাসও হয়ত সেই ভাবে উপনীত হন তাঁর কাছে।

ব্যক্তিচরিত্র অনুধাবনে ঠাকুরের লোকোত্তর অন্তর্দৃষ্টি। কৃষ্ণদাসের সঙ্গে এই একটি দিনের সাক্ষাৎকারও তার এক বিশিষ্ট নিদর্শন।

তিনি এক একজনকে বিচার করতেন, পরীক্ষা করতেন তাঁর নিজস্ব কষ্টিপাথরে। সেদিনও তার ব্যতিক্রম হয় নি। আর, এত বড় মনস্বী কৃষ্ণদাস উত্তীর্ণ হতে পারেন নি সে পরীক্ষায়।

সেদিন (১১ অক্টোবর, ১৮৮৪) দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর প্রসঙ্গ করছিলেন শ্রীম. ও প্রিয় মুখুজ্যের সঙ্গে।

তিনি নানা কথার মধ্যে কৃষ্ণদাস পালের আসার কথা উল্লেখ করলেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস যে ক' বছর আগে তাঁর কাছে এসেছিলেন, তা জানবার উপায় নেই। ঠাকুরের স্মৃতিশক্তি এত প্রখর যে অনেক বছরের পূর্ববর্তী ঘটনা, কথাবার্তা হুবহু বর্ণনা করেছেন নানা দিনে। এখানেও তেমনি। বললেন, 'কৃষ্ণদাস পাল এসেছিল। দেখলাম রজোগুণ! তবে হিন্দু. জুতো বাইরে রাখলে। একটু কথা কয়ে দেখলুম, ভিতরে কিছুই নাই। জিজ্ঞাসা করলুম, মানুষের কর্তব্য কি? তা বলে, 'জগতের উপকার

করব।' আমি বললুম, হ্যাঁগা তুমি কে? আর কি উপকার করবে? আর জগৎ কতটুকু গা, যে তুমি উপকার করবে?'

এই ধরনের উপলক্ষে ঠাকুরের ব্যক্তিত্ব কি দীর্ঘায়ত হয়ে প্রকাশ পায়। বিরুদ্ধবাদী এমনি সব নেত্রীস্থানীয় স্বনাম-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে তিনি নস্যাৎ করে দেন বিচক্ষণ তর্ক শক্তিতে। প্রতিপক্ষ একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে যান। কি বিস্ময়কর! এমন মহা মহা বিদ্বান নিরুত্তর হয়ে যাচ্ছেন এমন এক পুরুষের যুক্তিতে, যিনি পুঁথিনির্ভর বিদ্যাবিহীন। অথচ তাঁর উক্তি সত্যের অভিজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

আর তেমনি অপরিমেয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্যক্তিচরিত্র বিশ্লেষণী ক্ষমতা। অল্প কালের মধ্যেই তিনি মূল্যায়ন করে নেন বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র প্রমুখ দিকপালদের। কখনো কিছুক্ষণের আলাপে। কখনো দর্শন মাত্রে, বিনা কথোপকথনে।

কৃষ্ণদাসকেও তদ্দণ্ডে কেমন বিশ্লেষণ করেছিলেন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের এক কর্মাধ্যক্ষ, ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক, সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী, রাজনীতিক নেতা পাল মহাশয়। নিজের মান সম্পর্কে স্বভাবত সচেতন। অহং ভাবও সম্ভবত প্রকট। সুতরাং ঠাকুর তাঁর অন্তর-পরিচয় দিলেন—'রজোগুণ।'

কৃষ্ণদাস বাইরে পাদুকা রেখেছিলেন। তাই তাঁকে মন্তব্য করলেন 'হিন্দু' ভাবাপন্নরূপে।

সন্ধানী কথাবার্তায় বুঝে নিলেন—আগন্তুকের ওই সব লৌকিক গুণাবলী নিতান্ত বাহ্য। তাই অভিমত জানালেন—'ভিতরে কিছুই নাই।' অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানের অভাব তাঁর। তা ধারণা করলেন একটি মাত্র অন্তর্ভেদী প্রশ্নে—'মানুষের কর্তব্য কি?'

রজোগুণ অনুসারে কৃষ্ণদাস উত্তর দিলেন—'মানুষের উপকার করা।' আর তা-ই তাঁর লক্ষ্য।

তাঁর কথায় বিরক্ত হলেন ঠাকুর। একটি চোখা এবং অমার্জিত গ্রাম্য শব্দ প্রয়োগ করে, বিধবার সন্তানের বুদ্ধির সঙ্গে তুলনা করলেন। হীন

বুদ্ধি দেখা যায় অসহায়ার পুত্রের। কেন না ভাগ্য দোষে বিড়ম্বিত ছেলেটি। তাকে অনেকের তোষামোদ ইত্যাদি নীচ উপায়ে নিজের পথ করে নিতে হয়। তাঁর সেই কথা হলো—'তোমার ওরূপ রাড়ি পুতি বুদ্ধি কেন?'

তারপরেই বিরাটত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বললেন—'জগতের দুঃখনাশ তুমি কি করবে? জগৎ কি এতটুকু?'

সঙ্গে সঙ্গে উপমা যোগ করে সেই ব্রহ্মাণ্ডের আভাস দিলেন—'বর্ষা-কালে গঙ্গায় কাঁকড়া হয় জানো? এইরূপ অসংখ্য জগৎ আছে। এই জগতের পতি যিনি তিনি সকলের খবর নিচ্ছেন। তাঁকে আগে জানা—এই জীবনের উদ্দেশ্য। তারপর যা হয় কোরো।'

গিরিশচন্দ্র কথিত পুরুষ সিংহ', বিখ্যাত বাগ্মী কৃষ্ণদাস মৌন রইলেন এই তেজোদৃপ্ত ভাষণের সামনে। আপন বক্তব্যের সমর্থনে কোনো যুক্তিদানে কিংবা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিবাদে অক্ষম।

ঠাকুরের তত্ত্ববিচার প্রসঙ্গে নন্দ বসু, পশুপতি বসুদের কথাও উল্লেখ-নীয়। কারণ তাঁদেরও একদিন প্রতিবাদী রূপে দেখা যায়।

বাগবাজারের দুই রীতিমত প্রতিষ্ঠাবান সহোদর নন্দ বসু ও পশুপতি বসু।

তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগর কেশবচন্দ্র যতীন্দ্রমোহন কৃষ্ণদাসের তুল্য বিদ্যা, মনীষা বাগ্মীতা, দয়া দাক্ষিণ্য, দেশহিতৈষণা, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক গুণাবলীর জন্যে খ্যাতনামা নন বটে। কিন্তু সম্ভ্রান্ত এবং প্রভূত বিত্ত-শালী বনিয়াদী পরিচয় রূপে বহুমান্য। সেকালের ধনী বাঙালী সমাজে বিশেষ কায়স্থকুলে নন্দ বসু, পশুপতি বসুর নাম শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে গণ্য হতো। বিরাট চত্বরের মধ্যে শোভমান তাঁদের প্রাসাদোপম অট্টা-লিকা। কলকাতার অন্যতম দর্শনীয় বস্তু তাঁদের সেই ভবনে সংগৃহীত দেশী ও বিদেশী চিত্রসম্ভার।

সেই সব ছবি দেখবার জন্যেই সে গৃহে উপস্থিত হন শ্রীরামকৃষ্ণ।

সকল ললিতকলার অনুরাগী তিনি শুধু নন। বহুমুখী তাঁর নিজেরও নন্দন চিত্তের স্ফূর্তি। সঙ্গীত ও অভিনয়ে যেমন পারঙ্গম, তেমনি মূর্তি গঠনে ও আলেখ্য রচনায়ও সুপটু। চিত্রদর্শনও তাঁর শিল্পীসত্তার বিশেষ প্রিয়।

নারায়ণ প্রমুখ কোনো কোনো ভক্তের মুখে শোনেন যে, নন্দ বসুর গৃহে বহু ঈশ্বরীয় বিষয়ের ছবি আছে। তাই তিনি সেখানে এলেন (২৮ জুলাই, ১৮৮৫), বোসপাড়ার বলরাম বসুর বাড়ি থেকে।

কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে নন্দ বসুদের দোতলা হলঘরে উপস্থিত হলেন। সেই সুবৃহৎ কক্ষেই ছিল দেশীয় চিত্রসম্ভার। চতুর্দিকের দেওয়াল জুড়ে দেবদেবীর দীর্ঘাকার ছবি।

পশুপতি বসুর সঙ্গে ঠাকুর চিত্রগুলি দেখতে লাগলেন। নিবিষ্ট চিত্তে, একটির পর একটির নিকটস্থ হয়ে। কখনো ভাবে বিভোর ইষ্ট দেবদেবীর প্রতিকৃতি দর্শনে।

চতুর্ভুজ বিষ্ণু। হনুমানকে আশীর্বাদরত রামচন্দ্র। কদমতলায় দণ্ডায়মান বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণ। বামন অবতার, শিরে ছত্র, বলির যজ্ঞে গমনরত। নৃসিংহ অবতার। রাখালদের সঙ্গে গোষ্ঠবিহারী গোচারণকারী কৃষ্ণ। ধূমাবতী—একেকটি ছবির নাম ঠাকুর নিজেই উচ্চারণ করছেন। ষোড়শী। ভুবনেশ্বরী। তারা। কালী।

কয়েকটি মূর্তি দেখে ঠাকুর মন্তব্য করলেন, গৃহস্থের মঙ্গলের জন্যে—'এ সব উগ্রমূর্তি। এ সব মূর্তি বাড়িতে রাখতে নাই। এ মূর্তি বাড়িতে রাখলে পুজো দিতে হয়। তবে আপনাদের অদৃষ্টের জোর আছে, আপনারা রেখেছেন।'

তারপর, শ্রী অন্নপূর্ণা। দেখে ঠাকুর ভাবে বললেন, 'বা! বা!' আগে যেমন 'আহা'! 'আহা!' বলেছিলেন—হনুমানের মাথায় হাত দিয়ে শ্রীরামের আশীর্বাদ এবং রামচন্দ্রের পাদপদ্মে হনুমানের দৃষ্টি নিবদ্ধ দেখে।

পরের ছবি—রাই রাজা, নিকুঞ্জবনের সিংহাসনে উপবিষ্টা, সখীপরিবৃতা, কুঞ্জ দ্বারে কোটাল বেশী শ্রীকৃষ্ণ।

তারপর দোললীলার চিত্র। পরের মূর্তি—বীণাপাণি দেবীর। কাঁচের বাক্সের মধ্যে—বীণাবাদিনীর রাগ আলাপরতা বিগ্রহ।

চিত্রদর্শন শেষ করে গৃহস্বামীকে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'আজ খুব আনন্দ হল। বা! অপনি তো খুব হিন্দু। ইংরাজী ছবি না রেখে যে এই ছবি রেখেছেন—খুব আশ্চর্য।'

নন্দ বসু জানালেন—'ইংরাজী ছবিও আছে।'

ঠাকুর সহাস্যে বললেন—'সে সব অমন নয়। ইংরাজীর দিকে তোমার তেমন নজর নাই।'

এক দিকের দেওয়ালে কেশবচন্দ্রের নববিধানের ছবিও দৃশ্যমান। ঠাকুরের এক প্রিয় গৃহী শিষ্য সুরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রস্তুত করান সেই বৃহৎ চিত্রখানি। সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের প্রতীকস্বরূপ অঙ্কিত। মন্দির গীর্জা মসজিদের আলেখ্যর সঙ্গে ভারতের তাবৎ ধর্মসম্প্রদায়ের নানা আচার্যস্থানীয় পুরুষদের প্রতিকৃতি চিত্রিত। পরমহংসদেব এবং কেশবও তার এক পার্শ্বে উপস্থিত। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদর্শন করছেন কেশবকে—পথ পৃথক হলেও সব ধর্মাবলম্বীরাই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যাত্রী। পথ ভিন্ন—কিন্তু গন্তব্যস্থল অভিন্ন, ভগবানের সন্নিধানে। ঠাকুরের অন্যতম মূল বাণী।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছবিটি দেখেই বললেন—'ও যে সুরেন্দ্রের পট।'

প্রসন্নর পিতা সহাস্যে বললেন—'আপনি ওর ভিতর আছেন।'

ঠাকুরও সহাস্যে, কিন্তু সবিনয়ে বললেন—'ওই এক রকম, ওর ভিতর সবই আছে।—ইদানীং ভাব!'

আরো কিছু প্রসঙ্গের পর বললেন, ঈশ্বরীয় মূর্তি সকল দেখে বড় আনন্দ হল।'

আবার বললেন—(কিন্তু বাড়িতে) 'উগ্রমূর্তি, কালী, তারা (শব শিবা-মধ্যে শ্মশানবাসিনী) রাখা ভাল নয়, রাখলে পূজা দিতে হয়।'

পশুপতি, সম্ভবত কিছু অহমিকার সঙ্গে হেসে বললেন—'তা তিনি যতদিন চালাবেন, ততদিন চলবে।'

'তা বটে,' ঠাকুর মন্তব্য করলেন, সেই সঙ্গে মনে করিয়ে দিলেন স্মরণীয়

কথাটিও—'কিন্তু ঈশ্বরেতে মন রাখা ভাল ; তাঁকে ভুলে থাকা ভাল নয়।'

এবার নন্দ বসু উত্তর দিলেন, যেমন সচরাচর লোকে বলে লঘুভাবে কিংবা জ্ঞানপাপীর মতন—'তাঁতে মতি হয় কই ?'

নিত্য ঈশ্বর প্রসঙ্গে উৎসুক ঠাকুর। তখনি আরেকটি পরম কথা শোনালেন, 'তাঁর কৃপা হলে হয়।'

'তাঁর কৃপা হয় কই ?' নন্দ বসু কুতর্কের অবতারণা করলেন, 'তাঁর কি কৃপা করবার শক্তি আছে ?'

বিরক্ত হলেন না শ্রীরামকৃষ্ণ। সহাস্যে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, 'তোমার পণ্ডিতদের মত—'যে যেমন কর্ম করবে সে সেরূপ ফল পাবে।' ওগুলো ছেড়ে দাও। ঈশ্বরের শরণাগত হলে কর্ম ক্ষয় হয়।'

কলিতে আচরণীয় ভক্তিবাদের কথা শোনালেন, অপূর্ব প্রেরণায়। সর্বস্ব ত্যাগ করে জগজ্জননীর কাছে নিজে কেমন শুদ্ধা ভক্তির প্রার্থনা করেছিলেন, তাও জানালেন—'আমি মার কাছে ফুল হাতে করে বলেছিলাম—'মা ! এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পুণ্য ; আমি কিছুই চাই না, তুমি আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও তোমার ধর্ম, এই লও তোমার অধর্ম ; আমি ধর্মাধর্ম কিছুই চাই না, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও তোমার জ্ঞান, এই লও তোমার অজ্ঞান ; আমি জ্ঞান অজ্ঞান কিছুই চাই না, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও তোমার শুচি, এই লও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।'

এমন অন্তর-উৎসারী মর্মস্পর্শী বাণীর পরেও নন্দ বসু প্রশ্ন করলেন, 'আইন তিনি ছাড়াতে পারেন ?'

'সে কি !' জ্বলন্ত প্রত্যয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ জানালেন, 'তিনি ঈশ্বর, তিনি সব পারেন ; যিনি আইন করেছেন তিনি আইন বদলাতে পারেন।'

তারপর তিনি সেই বিচার আনলেন—ঈশ্বরের দয়ায় মানুষের চৈতন্যলাভ হয়, না ভোগ পূর্ণ হওয়ার পরে ?

'তবে ওকথা বলতে পার তুমি।' নন্দ বসুকে নিঃসঙ্কোচে বললেন,

'তোমার নাকি ভোগ করবার ইচ্ছা আছে, তাই তুমি অমন কথা বলছ। ও এক মত আছে বটে, ভোগ শান্তি না হলে চৈতন্য হয় না।'

সঙ্গে সঙ্গে ভোগবাদী মতের অসারতা বর্ণনা করলেন—'তবে ভোগই বা কি করবে ? কামিনী কাঞ্চনের সুখ—এই আছে. এই নাই, ক্ষণিক। কামিনী কাঞ্চনের ভিতর আছে কি ? আমড়া আঁটি আর চামড়া ; খেলে অম্লশূল হয়। সন্দেশ, যাই গিলে ফেললে আর নাই।'

পার্থিব সুখ সম্ভোগের অনিত্যতার কথা শ্রোতা শুনলেন বটে। কিন্তু তার মর্মগ্রহণ করতে পারলেন না। খানিক মৌন থেকে নন্দ বসু পুন রায় তর্ক ওঠালেন, 'ওসব তো বলে বটে। ঈশ্বর কি পক্ষপাতী ? তাঁর কৃপাতে যদি হয়, তাহলে বলতে হবে ঈশ্বর পক্ষপাতী ?

বৃহৎ পটভূমিকায় ঠাকুর বিষয়টিকে সমগ্রভাবে তুলে ধরলেন, 'তিনি নিজেই সব, ঈশ্বর নিজেই জীব, জগৎ সব হয়েছেন। যখন পূর্ণ জ্ঞান হবে, তখন ঐ বোধ। তিনি মন, বুদ্ধি, দেহ—চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সব হয়েছেন। তিনি আর পক্ষপাত কার উপর করবেন ?'

এই দার্শনিক তত্ত্ব ধারণা করতে অক্ষম নন্দ বসু। যা বলা অতি সহজ সেই প্রচলিত কথাই বললেন, 'তিনি নানারূপ কেন হয়েছেন। কোন-খানে জ্ঞান, কোনখানে অজ্ঞান ?'

'তাঁর খুশি'। যথোচিত উত্তর দিলেন ঠাকুর।

বলেই, ব্যাখ্যাকারী গান আরম্ভ করলেন—

সকলি তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি
তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি ॥
পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি।
কারে দাও মা ব্রহ্মপদ ! কারে কর অধোগামী ॥
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী।
আমি রথ তুমি রথী, যেমন চালাও তেমনি চলি ॥

গানখানি শুনিয়ে, সেইভাবে বললেন, 'তিনি আনন্দময়ী। এই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের লীলা করছেন। অসংখ্য জীব, তার মধ্যে দুই একটি

মুক্ত হয়ে যাচ্ছে,—তাতেও আনন্দ। 'ঘুড়ির লক্ষের দুটো একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপাড়ি'—রামপ্রসাদের এই পঙ্‌ক্তিটি পুনরাবৃত্তি করে বুঝিয়ে দিলেন, 'কেউ সংসার বদ্ধ হচ্ছে, কেউ মুক্ত হচ্ছে।'

আবার সঙ্গীতের বাণীতেই ভূমার ভাব প্রকাশ করলেন—

'ভব সিন্ধু মাঝে মন উঠেছে ডুবছে কতুতরী।'

নন্দ বসু কিছুই বুঝলেন না। তিনি প্রচলিত স্থুলভাবেই বললেন, 'তাঁর খুসি! আমরা যে মরি।'

পুনরায় পরম জ্ঞানের তত্ত্ব ঠাকুর জানালেন, 'তোমরা কোথায়? তিনিই সব হয়েছেন। যতক্ষণ না তাঁকে জানতে পাচ্ছ, ততক্ষণ 'আমি আমি' করছ!'

তারপর চূড়ান্ত আশ্বাসবাণী শোনালেন—'সকলে তাকে জানতে পারবে—সকলেই উদ্ধার হবে, তবে কেহ সকাল সকাল খেতে পায়, কেহ দুপুরবেলা, কেউ বা সন্ধ্যার সময়; কিন্তু কেহ অভুক্ত থাকবে না।'

কারণ—'সকলেই আপনার স্বরূপকে জানতে পারবে।'

পশুপতি এতক্ষণ পরে বললেন, 'আজ্ঞা হাঁ, তিনিই সব হয়েছেন বোধ হয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ আরো বিশ্লেষণ করে বললেন, 'আমি কি এটা খোজো দেখি। আমি কি হাড়, না মাংস, না রক্ত, না নাড়িভুঁড়ি? আমি খুঁজতে খুঁজতে তুমি এসে পড়ে, অর্থাৎ অন্তরে সেই ঈশ্বরের শক্তি বই আর কিছুই নাই। 'আমি' নাই।—তিনি।...যে 'আমি' কামিনী কাঞ্চনে আসক্ত হয়। সেই 'আমি' কাঁচা আমি, সে 'আমি' ত্যাগ করতে হয়।'

তাঁর এই কথায়—শ্রীম লিপিবদ্ধ করেছেন—'অহঙ্কারের এইরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া গৃহস্বামী ও অন্যান্য সকলে সাতিশয় প্রীতিলাভ করলেন।'

ঠাকুর বলতে লাগলেন স্থুল ভোগের অসারতার কথা। ধনসম্পদের মত্ততা ও অহঙ্কারের কথা—'বেশি ঐশ্বর্য হলে, ঈশ্বরকে ভুল হয়ে যায়; ঐশ্বর্যের স্বভাবই ঐ। যদু মল্লিকের বেশি ঐশ্বর্য হয়েছে, সে আজ-কাল ঈশ্বরীয় কথা কয় না। আগে আগে বেশ ঈশ্বরের কথা কইত।'

কাম এবং অর্থকে ধিক্কার দিয়ে বললেন, 'কামিনী কাঞ্চন এক প্রকার মদ। অনেক মদ খেলে খুড়া-জ্যাঠা বোধ থাকে না, তাদেরই বলে ফেলে তোর গুষ্টির, মাতালের লঘু গুরু বোধ থাকে না।'

নন্দ বসু স্বীকার করলেন, 'তা বটে।'

এবার পশুপতি আরেক অবাস্তব প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন, 'মহাশয়। এগুলো কি সত্য Spiritualism, Theosophy? সূর্যোলোক, চন্দ্র-লোক? নক্ষত্রলোক?'

ঠাকুর বেশ বললেন, 'জানিনা বাপু।'

আর এই সব ব্যাপার জানা যে নিষ্প্রয়োজনও, সেকথা বললেন একটি সুযোগ্য উপমা দিয়ে, 'অত হিসাব কেন? আম খাও, কত আম গাছ, কত লক্ষ ডাল, কত কোটি পাতা, এ হিসাব করা আমার দরকার কি? আমি বাগানে আম খেতে এসেছি, খেয়ে যাই।'

ওই ধরণের জিজ্ঞাসা অবুঝ মনের পরিচায়ক। প্রকৃত জ্ঞাতব্য হলেন ঈশ্বর। সেই নিত্য বস্তুর উল্লেখ করে বললেন, 'চৈতন্য যদি একবার হয়, যদি একবার ঈশ্বরকে কেউ জানতে পারে তা হলে ওসব হাবজা গোবজা বিষয় জানতে ইচ্ছাও হয়না।'

ওসব যেন মানসিক বিকৃতির লক্ষণ। তেমনি রোগীর সঙ্গে তুলনা দিলেন, 'বিকার থাকলে কত কি বলে,—'আমি পাঁচ সের চালের ভাত খাবো রে।'—'আমি এক জ্বালা জল খাবো রে।'—বৈদ্য বলে, 'খাবি? আচ্ছা খাবি।'—এই বলে বৈদ্য তামাক খায়। বিকার সেরে, যা বলবে তাই শুনতে হয়।'

পশুপতি এবার পথে এসেছেন। জানতে চাইলেন, 'আমাদের বিকার চিরকাল বুঝি থাকবে?'

ঠাকুর অভয় দিলেন—'কেন, ঈশ্বরেতে মন রাখো, চৈতন্য হবে।'

পশুপতি স্বীকার করলেন, 'আমাদের ঈশ্বরের যোগ ক্ষণিক।' তাই সপরিহাসে বললেন, 'তামাক খেতে যতক্ষণ লাগে।'

'তা হোক; ঠাকুর তবু ভরসা দিয়ে বললেন—'ক্ষণকাল তার সঙ্গে যোগ

হলেই মুক্তি।'

আর প্রয়োজন আন্তরিক ভক্তির।

তাই অহল্যার প্রার্থনা শোনালেন—'হে রাম! শূকর যোনিতেই জন্ম হোক আর যেখানেই হোক যেন তোমার পাদপদ্মে মন থাকে, যেন শুদ্ধা ভক্তি হয়।'

ভক্ত নারদের সেই প্রার্থনার কথাও অপরূপভাবে বললেন—'রাম, তোমার কাছে আর কোন বর চাইনা, আমাকে শুদ্ধা ভক্তি দাও, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই, এই আশীর্বাদ করো।'

এই দুই দৃষ্টান্ত দিয়ে ঠাকুর পুনরায় বললেন, 'আন্তরিক তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে, তাঁতে মন হয়,—ঈশ্বরের পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়।'

পরম আশ্বাসের বাণী শোনালেন। পরিত্যাগ করতে বললেন মানসিক দুর্বলতা—

আমাদের কি বিকার যাবে। 'আমাদের আর কি হবে'—'আমরা পাপী' —এসব বুদ্ধি ত্যাগ করো।'

তারপর নন্দ বসুর দিকে চেয়ে বললেন, 'আর এই চাই—একবার রাম বলেছি, আম'ব আবার, পাপ।'

নন্দ বসু এবার প্রশ্ন করলেন, 'পরলোক কি আছে? পাপের শাস্তি?'

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন মূল বস্তু, মূল লক্ষ্য, মূল করণীয়, মূল উপায়। এবারেও আমের উপমায় বললেন, 'আম খাও। 'আম' প্রয়োজন,—তাঁতে ভক্তি—'

প্রশ্নকর্তা জানতে চাইলেন, 'আম গাছ কোথা? আম পাই কোথা?'

'গাছ?' আশার আলো দেখালেন পূর্ণজ্ঞানী, তাৎক্ষণিক জবাবে—'তিনি অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম! তিনি আছেনই, তিনি নিত্য! তবে একটি কথা আছে—তিনি 'কল্পতরু—'

রামপ্রসাদী গানের জবানীতে তারই সন্ধান দিলেন—

'কালী কল্পতরু মূলে রে মন, চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।'

'কিন্তু'—আরো বুঝিয়ে বললেন, 'কল্পতরুর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করতে

হয়, তবে ফল পাওয়া যায়,—তবে ফল তরুর মূলে পড়ে,—তখন কুড়িয়ে লওয়া যায়। 'চারি ফল,—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।'

তার মধ্যে আবার 'জ্ঞানীরা মুক্তি (মোক্ষফল) চায়, ভক্তেরা ভক্তি চায়,—অহেতুকী ভক্তি। তারা ধন, অর্থ কাম চায় না।'

এত কথার মধ্যেও নন্দ বসুর প্রথম প্রশ্নটি ভোলেন নি—পরলোক আছে কিনা।

এবার সেই প্রসঙ্গে প্রাঞ্জল ভাবে বলতে লাগলেন,—'পরলোকের কথা বলছ? গীতার মত,—মৃত্যুকালে যা ভাববে তাই হবে। ভরত রাজা 'হরিণ' 'হরিণ' করে শোকে প্রাণত্যাগ করেছিল। তাই তার হরিণ হয়ে জন্মাতে হল।' সেজন্যে, মুক্তিলাভের পক্ষে কি করণীয় তার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিলেন—

'তাই জপ, ধ্যান, পূজা এ সব রাতদিন অভ্যাস করতে হয়,—তাহলে মৃত্যুকালে ঈশ্বর চিন্তা আসে—অভ্যাসের গুণে। এরূপে মৃত্যু হলে ঈশ্বরের স্বরূপ পায়।'

কেশবচন্দ্রও ঠাকুরকে পরলোকের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সে-কথার উল্লেখ করে, তাঁকে কি উত্তর দিয়েছিলেন তাও বললেন এখানে —'যতক্ষণ না ঈশ্বর লাভ হয়, ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতাযাত করতে হবে।'

এমন পরম তত্ত্বটি আবার বুঝিয়ে দিলেন অতি পরিচিত লৌকিক জীবনের এক উপমার সাহায্যে—'কুমোরেরা হাঁড়ি সরা রৌদ্রে শুকাতে দেয়, ছাগল গরুতে মাড়িয়ে যদি ভেঙ্গে দেয় তাহলে তৈরি লাল হাঁড়িগুলো ফেলে দেয়। কাঁচাগুলো কিন্তু আবার নিয়ে কাদা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে ও আবার চাকে দেয়।'

তারপরেও আরো কিছু প্রসঙ্গ হল। আর তর্ক ওঠালেন না বসু ভ্রাতারা।

বিদায়কালে ঠাকুর তাঁদের একটি ব্যবহারিক উপদেশ দিলেন, 'আর একটা সাবধান। মোসাহেবরা স্বার্থের জন্যে বেড়ায়।' অর্থাৎ তাদের

সঙ্গ পরিত্যাজ্য।

এত ভগবদ বিষয়ে আলোচনার পর এমন একটি বাস্তব ব্যাপারে নির্দেশ দান, এও এক আশ্চর্য। ধনীরা এ ধরণের সতর্কীকরণ পছন্দ করেন না। কিন্তু স্পষ্টবক্তা শ্রীরামকৃষ্ণ সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেন তাঁদের মঙ্গলার্থে। প্রিয় হবার চিন্তা না করে। এই উচিত বাক্যেরও প্রতিবাদে কিছু বললেন না নন্দ, পশুপতি।

এই ধারায় মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত অর্থাৎ শ্রীমকেও অন্তর্ভূক্ত করা যায়, ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর প্রথম কথাবার্তার সূত্রে। শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্কে পূর্বোল্লিখিত বঙ্কিম প্রমুখের সঙ্গে অবশ্যই শ্রীমর পার্থক্য ছিল। পরেও তিনি ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ গৃহী ভক্ত, শিষ্যে পরিণত হন অল্পকালের মধ্যেই। তাঁরই 'কথামৃত' সংগ্রহের কল্যাণে উত্তরকালে অসংখ্য লোক শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও ভাবধারার পরিচয় পায়। কিন্তু প্রথমে ঠাকুর সম্পর্কে ক্ষণিক দ্বন্দ্ব জেগেছিল তাঁর মনে। কিছু বিতর্কেরও সৃষ্টি হয়, যদিও বিরুদ্ধভাবে নয়।

মহেন্দ্রনাথ যখন প্রথম আসেন দক্ষিণেশ্বরে, তখন তিনি ছিলেন কেশবচন্দ্রের প্রভাবে তাঁর নিরাকার মতের অনুগামী। কেশবচন্দ্র এবং তাঁরও আত্মীয় নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের কথায় মহেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দর্শন করতে আসেন। তার কিছু পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ করেন, তাঁর অমৃত ভাষণ এবং গান শোনেন, সমাধিও দেখেন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। তিনি চমৎকৃত হন। আর সেই অভিজ্ঞতার ফলে ধর্মোৎসুক মহেন্দ্রনাথকে পরামর্শ দেন দক্ষিণেশ্বরে উপনীত হতে।

এ বিষয়ে পরবর্তীকালে নগেন্দ্রনাথ তাঁর Reminiscences and Recollections পুস্তকে লেখেন—'After seeing and hearing Ramakrishna, I went to see Mahendra Nath Gupta, who was related to me and was my senior by several years, and told him everything and urged him to

go to Dakshineswar. This he did the following year, and he was so much impressed by the Paramhansa's maner of speaking that he began keeping a diary in which he jotted down everything that the Saint said ··These diaries were the beginning of the Gospel of Sri Ramakrishna according to 'M'. In the original Bengali it is known as Sri Ramakrishna Kathamrita'—the 'Nectar of the words of Ramakrishna' (P, 48–49 —Nagendra Nath Gupta).

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ১৮৮১ সালের শেষদিকে নগেন্দ্রনাথ দেখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে, স্টীমার যাত্রায়। সে প্রসঙ্গ তিনি ওই গ্রন্থেই উল্লেখ করেছেন—'In 1881, Keshab Chandra Sen, accompanied by a fairly large party, went on board a steam yacht belonging to his Son-in-law, Maharaja Nripendra Narayan Bhup of Kuch Behar, to Dakshineswar to meet Ramakrishna Paramahansadeva. I had the good fortune to be included in the party· ' (Ibid, p. 45)

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০) সে সময় বিশ-একুশ বছরের তরুণ উদীয়মান সাহিত্যিক তিনি। কবি ও গল্প-লেখক। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট সুহৃদ। জেনারেল এ্যাসেম্ব্লীজ ইন্স্টিটিউশনে বিবেকানন্দের সহপাঠী, বন্ধু। আবার পরবর্তীকালে আমেরিকা থেকে ফেরার পর স্বামীজী পাঞ্জাব গমনকালে নগেন্দ্রনাথের অতিথি থাকেন লাহোরে। প্রথম জীবনে কবিতা, গল্প এবং পরে উপন্যাস রচনার জন্যেও খ্যাতনামা হন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। কিন্তু তিনি সাংবাদিক রূপে বিপুল যশস্বী হয়েছিলেন, সমগ্র ভারতে। ১৮৮৪ সালে করাচীর 'ফিনিক্স' পত্রিকার সম্পাদক। ১৮৯১-তে লাহোরের 'ট্রিবিউন' সংবাদপত্রের সম্পাদক। ১৯০১ সালে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সহযোগিতায় 'টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরি' ইংরেজী

মাসিকের সম্পাদক। ১৯০৫-এ এলাহাবাদের 'ইণ্ডিয়ান পীপ্‌ল'-এর সম্পাদক এবং পরে তা দৈনিক 'লীডার'-এর সঙ্গে সংযুক্ত হলে, যুগ্ম-সম্পাদক হন তিনি। বাংলা সাপ্তাহিক 'প্রভাত' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা এবং এক বছর সম্পাদকও থাকেন নগেন্দ্রনাথ। উত্তর জীবনে তিনি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার ইংরেজী অনুবাদও করেন। ১৯১০ সালে পুনরায় ভারত-প্রসিদ্ধ 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদনা করেন লাহোর থেকে।

তাঁরই প্রেরণায় মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আসেন। ১৮৮২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীম-র সেই প্রথম সাক্ষাৎকার। মহেন্দ্রনাথের (জন্ম ১৪ জুলাই, ১৮৫৪, মৃত্যু ১৯৩২) বয়স তখন আটাশ বছর। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্যামপুকুর ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। আবাল্য মেধাবী ছাত্র মহেন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় তৃতীয়, এফ. এ.তে পঞ্চম (অঙ্কের একটি খাতা না দিয়েও) এবং বি. এ.তে তৃতীয় স্থান পেয়েছিলেন। তিনি অধ্যাপনাও করেন রিপন, সিটি এবং মেট্রো-পলিটান কলেজে; ইংরেজী, মনোবিজ্ঞান ও অর্থনীতিতে। রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ), পূর্ণ, নারায়ণ, বিনোদ, বঙ্কিম, তেজচন্দ্র, ক্ষীরোদ প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য ও ভক্তরা মহেন্দ্রনাথের স্কুলের ছাত্র।

কেশব সেন সেসময় স্বনামধন্য ধর্মপ্রচারক। 'নববিধান' প্রতিষ্ঠাতা। অসাধারণ তাঁর বাগ্মীতা। মহেন্দ্রনাথের পত্নী কেশবের ভগ্নী সম্পর্কীয়া। মহেন্দ্রনাথ কেশবের সঙ্গ করতেন, নববিধানের উপাসনায় যোগ দিতেন। কেশবচন্দ্র তখন তাঁর আদর্শ পুরুষ। 'তিনি বলিয়াছিলেন যে এক এক-দিন উপসনাকালে কেশব সেন এমন মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রার্থনা করিতেন যে তৎকালে তাঁহাকে যেন একটি দেবতা বলিয়া তাঁহার বোধ হইত। মহেন্দ্রনাথ বলিতেন যে পরে ঠাকুরের কাছে আসিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, কেশবের ঐ হৃদয়-মুগ্ধকারী ভাব ঠাকুরের নিকট হইতে প্রাপ্ত।' ('কথামৃত' প্রথম ভাগে প্রকাশিত গ্রন্থ-

কারের সংক্ষিপ্ত জীবনী, পৃঃ ২)।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের বিবরণে এই সমস্ত কথাও জানিয়েছেন শ্রীম। তা তাঁর দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার। তিনি বিবাহিত এবং সন্তানের জনক জেনে ঠাকুর আক্ষেপ করলেন। আর 'তিরস্কৃত হইয়া…তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ হইতে লাগিল।'

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর 'সস্নেহে' বললেন, 'দেখ, তোমার লক্ষণ ভাল ছিল, আমি কপাল, চোখ, এসব দেখলে বুঝতে পারি। আচ্ছা, তোমার পরিবার কেমন? বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি।'

শ্রীম উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞা ভাল, কিন্তু অজ্ঞান।'

ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আর তুমি জ্ঞানী?'

'মাস্টারের অহঙ্কারে আবার বিশেষ আঘাত লাগিল'—তিনি স্বয়ং লিখেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ এবার প্রশ্ন করলেন—'আচ্ছা তোমার সাকারে বিশ্বাস না নিরাকারে?'

মহেন্দ্রনাথ অবাক হযে ভাবতে লাগলেন—সাকারে বিশ্বাস থাকলে কি নিরাকারে বিশ্বাস হয়? ঈশ্বর নিরাকার এ বিশ্বাস থাকলে ঈশ্বর সাকার এ বিশ্বাস কি হতে পারে? দুটি বিরুদ্ধ অবস্থা কি সত্য হতে পারে?

তারপর বললেন, 'আজ্ঞে নিরাকার, আমার এটি ভাল লাগে।'

ঠাকুর বললেন, 'তা বেশ। একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হল। নিরাকারে বিশ্বাস, তা তো ভালই। তবে এ বুদ্ধি ক'রো না যে—এইটি কেবল সত্য আর সব মিথ্যা। এইটি জেনো যে, নিরাকারও সত্য আবার সাকারও সত্য। তোমার যেটি বিশ্বাস, সেইটিই ধরে থাকবে।'

দুই সত্য—একথা এমনভাবে শুনে হতবাক হয়ে রইলেন শ্রীম। কারণ 'একথা তো তাঁর পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে নাই।'

'তাঁহার অহঙ্কার তৃতীয়বার চূর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। তাই আবার একটু তর্ক করিতে অগ্রসর হইলেন।'

বললেন, 'আজ্ঞা, তিনি সাকার এ বিশ্বাস যেন হল! কিন্তু মাটির

প্রতিমা তিনি তো নন—'

শ্রীরামকৃষ্ণ জানালেন—'মাটি কেন গো ! চিন্ময়ী প্রতিমা ।'

'চিন্ময়ী প্রতিমা' বুঝতে পারলেন না মহেন্দ্রনাথ।

তাই বললেন, 'আচ্ছা যারা মাটির প্রতিমা পূজা করে, তাদের তো বুঝিয়েদেওয়া উচিত যে মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নয়, আর প্রতিমার সম্মুখে ঈশ্বরকে উদ্দেশ করে পূজা করা : মাটিকে পূজা করা উচিত নয়।'.

ঠাকুর এবার বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোমাদের কলকাতার লোকের ওই এক। কেবল লেকচার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া। আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নাই। তুমি বুঝাবার কে ? যাঁর জগৎ, তিনি বুঝাবেন।...'

ঈশ্বরজ্ঞানী পুরুষই বুঝিয়ে দিলেন গুরুরূপে। শুধু তিরস্কার করলেন না। কেশব প্রভাবিত মহেন্দ্রনাথের এই আপাত জটিলতা ভেদ করলেন অতি সরল ভাবে। উপাসনার নানা পদ্ধতি। বিভিন্ন উপায়। পৃথক পথ।

বললেন, 'যদি বুঝাবার দরকার হয় তিনিই বুঝাবেন। তিনি তো অন্তর্যামী। যদি ঐ মাটির প্রতিমা পূজা করাতে, কিছু ভুল হয়ে থাকে, তিনি কি জানেন না—তাঁকেই ডাকা হচ্ছে ? তিনি ঐ পূজাতেই সন্তুষ্ট হন। ওর জন্য তোমার মাথা ব্যথা কেন ? তুমি নিজের যাতে জ্ঞান হয়, ভক্তি হয়, তার চেষ্টা কর।'

মহেন্দ্রনাথ আগে কখনো শোনেন নি এমন সত্য, এমন শক্তিতে।

'এইবার তাঁহার অহঙ্কার বোধহয় একেবারে চূর্ণ হইল।'

তিনি ভাবতে লাগলেন—উনি যা বলেছেন তা তো ঠিক ! আমার বুঝাতে যাবার কি দরকার ? আমি কি ঈশ্বরকে জেনেছি—না আমার তাঁর উপর ভক্তি হয়েছে।...একি অঙ্কশাস্ত্র, না ইতিহাস, না সাহিত্য যে পরকে বুঝাব ? এ যে ঈশ্বর তত্ত্ব। ইনি যা বলেছেন, বেশ মনে লাগছে। ঠাকুরের সহিত তাঁহার এই প্রথম ও শেষ তর্ক।'

বিগ্রহ পূজা এবং সর্ব প্রকার উপাসনার পক্ষে মহেন্দ্রনাথ অপূর্ব যুক্তি

শুনলেন সেইদিনই, অকাট্য উপমাযোগে—'তুমি মাটির প্রতিমা পূজা বলছিলে। যদি মাটিরই প্রতিমা হয়, সে পূজাতে প্রয়োজন আছে। নানা রকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন করেছেন। যাঁর জগৎ তিনিই এসব করেছেন—অধিকারী ভেদে। যার পেটে যা সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন।

এক মার পাঁচ ছেলে। বাড়িতে মাছ এসেছে। মা মাছের নানা রকম ব্যঞ্জন করেছেন। যার পেটে যা সয়। কারও জন্য মাছের পোলোয়া. কারও জন্য মাছের অম্বল, মাছের চড়চড়ি, মাছ ভাজা, এইসব করেছেন। যেটি যার ভাল লাগে। যেটি যার পেটে সয়—বুঝলে?'

সর্বজনবোধ্য বক্তব্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় স্থানের অধিকারী স্নাতক তা নিশ্চয় বুঝলেন।

একাসনে বসেই পর পর চারটি প্রশ্ন করলেন মহেন্দ্রনাথ। সেগুলির উত্তর ও ব্যাখ্যা শুনে মন প্রাণ পূর্ণ হয়ে গেল তাঁর। সব সন্দেহ, অবিশ্বাস, সংশয়ের নিরসন হলো। পরম তৃপ্তিতে, সানন্দে উপলব্ধি করলেন জীবনের প্রকৃত সাধন এবং লক্ষ্যবস্তু। গন্তব্যস্থল এবং সেখানে উপনীত হবার মার্গ। সেইসঙ্গে দৈনন্দিন করণীয় বিষয়ও।

সবিনয়ে তাঁর প্রথম জিজ্ঞাস্য—'ঈশ্বরে কি করে মন হয়?'

ঠাকুর জানালেন—'ঈশ্বরের নাম গুণগান সর্বদা করতে হয়। আর সৎসঙ্গ —ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু এঁদের কাছে মাঝ মাঝে যেতে হয়। সংসারের ভিতর ও বিষয়-কাজের ভিতর রাতদিন থাকলে ঈশ্বরে মন হয় না। মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার। প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জন না হলে ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন। যখন চারা গাছ থাকে, তখন তার চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে।

ধ্যান করবে মনে, কোণে ও বনে। আর সর্বদা সদসৎ বিচার করবে। ঈশ্বরই সৎ, কিনা নিত্যবস্তু, আর সব অসৎ, কিনা অনিত্য। এই বিচার করতে করতে অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ করবে।'

শ্রীম.-র দ্বিতীয় প্রশ্নও 'বিনীতভাবে'—'সংসারে কি রকম করে থাকতে হবে ?'

অদ্বিতীয় গুরু নির্দেশ দিলেন—'সব কাজ কর, কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা, সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে। যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে জানবে যে তারা তোমার কেউ নয়।' যেমন—'বড় মানুষের বাড়ির দাসী সব কায কচ্ছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ির দিকে মন পড়ে আছে। মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলের মত মানুষ করে। বলে 'আমার রাম' 'আমার হরি'। কিন্তু মনে বেশ জানে —এরা কেউ আমার নয়।··· •

ঈশ্বরে ভক্তি লাভ না করে যদি সংসার করতে যাও তাহলে আরও জড়িয়ে পড়বে। বিপদ, শোক, তাপ এ সবে অধৈর্য হয়ে যাবে। আর যত বিষয় চিন্তা করবে ততই আসক্তি বাড়বে।

তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙতে হয়। তা না হলে হাতে আঠা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।···

সংসার জল আর মনটি যেন দুধ। যদি জলে ফেলে রাখ, তাহলে দুধে জলে মিশে এক হয়ে যায়, খাঁটি দুধ খুঁজে পাওয়া যায় না। দুধকে দই পেতে মাখন তুলে যদি জলে রাখা যায়, তাহলে ভাসে। তাই নির্জনে সাধনা দ্বারা জ্ঞানভক্তিরূপ মাখন লাভ করবে। সেই মাখন সংসার জলে ফেলে রাখলে মিশবে না ; ভেসে থাকবে।

সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার। কামিনী কাঞ্চন অনিত্য। ঈশ্বরই এক মাত্র বস্তু। টাকায় কি হয় ? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়, এই পর্যন্ত। কিন্তু এতে ভগবান লাভ হয় না। তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না—এর নাম বিচার।···'

মহেন্দ্রনাথের তৃতীয় জিজ্ঞাস্য—'ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায় ?'

তাৎক্ষণিক উত্তর—'হ্যাঁ, অবশ্য করা যায়।'

চতুর্থ প্রশ্ন—'কি অবস্থাতে তাঁকে দর্শন হয় ?'

ঠাকুর জানালেন—'খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়। মাগ ছেলের জন্য লোকে এক ঘটি কাঁদে, টাকার জন্য লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়; কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে? ডাকার মত ডাকতে হয়।'

এবার সেই ভাবের গান ধরলেন—

> ডাক দেখি মন ডাকার মতন কেমন শ্যামা থাকতে পারে।
> কেমন শ্যামা থাকতে পারে, কেমন কালী থাকতে পারে॥
> মন যদি একান্ত হও, জবা বিল্বদল লও,
> ভক্তি চন্দন মিশাইয়ে (মার) পদে পুষ্পাঞ্জলি দাও॥

আবার বলতে লাগলেন, কবির ভাষায়—'ব্যাকুলতা হলেই অরুণ উদয় হল। তারপরে সূর্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বর দর্শন।'

অতিশয় বাস্তব উপমা দিয়ে বললেন, 'বিষয়ীর বিষয়ের উপর, মায়ের সন্তানের উপর, আর সতীর পতির উপর, টান। এই তিন টান যদি কারও একসঙ্গে হয়, সেই টানের জোরে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে। কথাটা এই, ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে। মা যেমন ছেলেকে ভালবাসে, সতী যেমন পতিকে ভালবাসে, বিষয়ী যেমন বিষয় ভালবাসে। এই তিনজনের ভালবাসা, এই তিন টান, একত্র করলে যতখানি হয়, ততখানি ঈশ্বরকে দিতে পারলে তাঁর দর্শন লাভ হয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী শোনার প্রতিক্রিয়া কি হলো, তা শ্রীম. স্বয়ং জানিয়েছেন—'সর্বক্ষণ তাঁহারই চিন্তা। সর্বদাই যেন সেই আনন্দময় মূর্তি দেখিতেছেন ও তাঁহার সেই অমৃতময়ী কথা শুনিতেছেন। ভাবিতে লাগিলেন, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিরূপে এই সব গভীরতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেন ও জানিলেন? আর এত সহজে এই সকল কথা বুঝাইতে তিনি এ পর্যন্ত কাহাকেও কখনও দেখেন নাই। . '

সুভাষিত রত্নমালা

'কত মণি মুক্তা পড়ে আছে আমার মায়ের নাচ দুয়ারে।'

শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বিশিষ্ট উক্তি, তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিমায়। অশ্রুতপূর্ব এই ধরনের বাণী। জগজ্জননীর এমন নান্দনিক ঐশ্বর্যের আভাস আর কে দিয়েছেন? শ্রীঠাকুরেরই নন্দন-চিত্তের এক অপরূপ দ্যোতনা প্রকাশ পেয়েছে বাক্যটিতে। জগন্মাতার নাট-মন্দিরে অজস্র রত্নাবলী বিকীর্ণ। সে বহু-বিচিত্র সম্ভার থেকে শুধু চয়ন করে নেবার অপেক্ষা।

বাগ্‌দেবীর তেমনি ষড়ৈশ্বর্যময় বাঙ্ময় বরপুত্র তিনি। তাঁর প্রদীপ্ত বাণীর নির্ঝরিণীতে মুক্তা মাণিকের লহরী। আর কি অপ্রমেয় সেই অলৌকিকী ভাষণ-মালা।

শ্রীঠাকুর দৈনিক কুড়ি ঘণ্টা কথা বলতেন—পরবর্তীকালে স্বামীজী জানিয়েছেন (মদীয় আচার্যদেব—স্বামী বিবেকানন্দ)।

সেই দিব্য ভাষণ-ধারার একটি ভগ্নাংশ মাত্র শ্রীম. লিখিত বিবরণীতে বিবৃত। কারণ গুপ্ত মহেন্দ্রনাথ কেবল শনি, রবি ও ছুটির বারে শ্রীরাম-কৃষ্ণ সমীপে উপনীত হতেন। তাও পরমহংসদেবের জীবনে শেষ চার বছরে। এইভাবে মোট ১৭৯ দিনে তাঁর ভাষণ লিপিবদ্ধ করেন শ্রীম.। (অবশ্য সেই সঙ্গে কিছু 'পূর্বকথা'ও যুক্ত হয়েছে।) সুতরাং সেই চার বছরেরও অধিকাংশ দিনের উক্তি অলিখিত বা অসংগৃহীত থাকে। উক্ত দিনগুলিতেও শ্রীঠাকুরের সমগ্র উক্তি কি রক্ষিত আছে শ্রীম-র দিন-লিপিতে? কারণ সেই স্থলেই মহেন্দ্রনাথ অনুলিখন করতেন না। তিনি গৃহে ফিরে সে রাতে কিংবা তার একদিন বা দুদিন পরেও লিপিবদ্ধ করে রাখতেন শ্রুতিস্মৃতি থেকে। সুতরাং তার মধ্যেও কিছু অংশ লুপ্ত হবার বিশেষ সম্ভাবনা।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধারণ্যে কথোপকথন পর্যায়ের কাল-

পরিধি দশ বছর। ১৮৭৫-৭৬ সাল থেকে ১৮৮৫-র শেষ অর্থাৎ তাঁর কণ্ঠ ব্যাধির আগে পর্যন্ত। সুতরাং তাঁর শ্রীমুখ নিঃসৃত রত্নরাজির সিংহ-ভাগই রক্ষিত হতে পারে নি।

কিন্তু সেই নিতান্ত খণ্ডিত সংরক্ষণের মধ্যেও কি বিপুল ভাবৈশ্বর্যময় দিব্যবাণী প্রকাশিত। ভগ্নাংশেও এই বিপুলকায় 'কথামৃত' রচনাবলী সংগৃহীত হয়েছে, বাংলা সাহিত্যে যা এক অনন্য সম্পদ। আর অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসুদের পক্ষে অন্তরঙ্গ দিশারী স্বরূপ। বহু সমস্যা সংশয় সঙ্কট নিরা-করণের নির্দেশনামা তাঁর সুভাষিতাবলী।

পুঁথিগত বিদ্যা বর্জিত হয়েও পূর্ণজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বর-দর্শন বা আত্ম-জ্ঞানে অর্জিত তাঁর অপরিমেয় প্রজ্ঞা। আর তারই উৎসার তাঁর দৈবী বাণীবৎ অমিয় বর্ষণ। কোন্ সে অজ্ঞাত জ্ঞানবাপী থেকে অবারিত নির্ঝর —'মা রাশ ঠেলে দেন।' দেবী ভর করেন তাঁর কণ্ঠে। শাস্ত্রীয় কোনো গ্রন্থাদি তিনি পাঠ করেন নি। অথচ তাঁর সমস্ত মৌল বক্তব্য, নির্দে-শিকা উপদেশ শাস্ত্রবাক্য অনুসারী। প্রাচীন কালাগত ঋষি যোগীদের সাধনলব্ধ উপলব্ধিগত তত্ত্বনিচয় শ্রীঠাকুরের বাক্যে অনুস্যূত। ভারতীয় দর্শন তথা শ্রেষ্ঠ চিন্তার ধারক বাহক বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা. ভাগবত। সেই সব শাস্ত্রে বিধৃত ধ্যান ধারণার সারাৎসার পাওয়া যায় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রবচনে। তাঁর অমৃতকথন এ জন্যেই মণি মাণিক্য খচিত। অতি দুরূহ অধ্যাত্ম তত্ত্ব, পারমার্থিক জটিলতম প্রশ্নের সদুত্তর প্রাঞ্জল-তম ভাষায় তিনি সাধারণের মনোলোকে স্থান করে দিয়েছেন। তাঁর অমিয় বাণীর পরম সার্থকতা এই লোক-কল্যাণে।

বাগবাদিনীর প্রিয় সন্তানরূপে তাঁর এক শ্রেণীর কথোপকথন নিদর্শন ছিল পূর্ববর্তী স্তবকে। দেশের নানা শীর্ষস্থানীয় বিদ্বান মনস্বী, সমাজের পুরোধা ব্যক্তিদের সঙ্গে অবলীলায় তিনি বিচার বিতর্ক করেছেন। অপনোদন করে দিয়েছেন তাঁদের ভ্রান্তি তথা বিভ্রান্তি। নীতি বিগর্হিত তার্কিক কিংবা অবিশ্বাসী কিংবা সংশয়বাদী কারো নিস্তার নেই তাঁর জ্বলন্ত সত্যার্থ প্রকাশের সামনে। যত পাণ্ডিত্যের অধিকারীই হোন

প্রতিপক্ষ, এই আপাত বিদ্যা-বিহীনের যুক্তি খণ্ডনে সকলকেই অসমর্থ দেখা গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাক-সৌকর্যের আরেক প্রকার পরিচয় উপস্থাপিত করা হবে বক্ষ্যমান অধ্যায়ে। এ সব ক্ষেত্রে কোনো বিবাদী পক্ষ নেই। তবে উদ্দিষ্ট শ্রোতাদের মধ্যে আছেন বিশিষ্ট পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক তথা ধর্ম সংস্কৃতি জগতের নানা জ্ঞানী গুণীজন। তাঁরা তাঁর বিচিত্র অধ্যাত্ম প্রসঙ্গ শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ বাগ্ বিভূতিতে ও প্রজ্ঞার বিচ্ছুরণে অভিভূত বোধ করেছেন। দিগ্বিজয়ী বাগ্মী পণ্ডিত পদ্মলোচন তর্কালঙ্কার, ন্যায়-শাস্ত্রের বিদ্বান নারায়ণ স্বামী, গৌরীদাস পণ্ডিত ও শশধর তর্কচূড়ামণি, বেদবিদ্ সাধক-সংস্কারক দয়ানন্দ সরস্বতী, সাধু মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বিজ্ঞান-তাপস চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার, নাট্যকার-নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ, যাত্রাধিকারী-গায়নশিল্পী নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, চিত্রশিল্পী অন্নদাচরণ বাগচী, নাট্যকার-গীতিকার রাজকৃষ্ণ রায়, সুকণ্ঠ গায়ক গীত-রচয়িতা ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল, কবি মাইকেল মধুসূদন প্রমুখ মোহিত হয়েছেন তাঁর সুবচনে, সঙ্গলাভে বা সঙ্গীতে।

দৈনন্দিন কত অমূল্য বাণীই তিনি অজস্রধারে বিতরণ করেছেন। সাধারণ ভক্ত কিংবা বিশিষ্ট জিজ্ঞাসুর উপলক্ষ্যে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কত তত্ত্বালোচনা, ভাষ্য, অর্থবোধক। আপাত সহজ কিন্তু সুগভীর ভাবাত্মক ভাবোদ্দীপক প্রসঙ্গ সমূহ। নানা সময়েই সে সব ভাষণ ঐশ্বর্যে মাধুর্যে ব্যঞ্জনায় রীতিমত ভাষাশিল্পের পর্যায়ে উন্নীত। অনুভবের দ্যোতনায় গদ্যাকারেও মনোরম কাব্য-গুণ মণ্ডিত। কখনো অপরূপ কল্পনায় বর্ণনায় রূপকল্পে নান্দনিক সৃষ্টি। কখনো আটপৌরে কথ্যভাষার প্রাকৃতশক্তিতে, লৌকিক উপমার অব্যর্থ প্রয়োগে সর্বজনগ্রাহ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের নানা উক্তিই সত্যের তেজে এবং বিষয়ে, বিন্যাসে, বৈদগ্ধে প্রবাদে পরিণত হয়েছে। যেমন জ্ঞানগর্ভ তেমনি সুরম্য সুভাষিত। সে মণিমাণিক্য সম্ভার এমনই মূল্যমানের যে আদ্যোপান্ত অপরিত্যাজ্য।

তাদের মধ্যে নির্বাচনও নিষ্প্রয়োজন। যথা ইচ্ছা চয়ন সঞ্চয়ন করে নেওয়া কেবল। অঞ্জলি ভরলেই মিলে যাবে রত্ন।

ভাষণ ভঙ্গিমাতেও চিত্তাকর্ষক তিনি। যত জটিল আর অলৌকিক তত্ত্বই হোক, হৃদয়স্পর্শীভাবে তিনি তার ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর সমস্ত কথনীয় বিষয়ই ঈশ্বর সম্পর্কিত। অন্য কোনো প্রসঙ্গে যদি কথোপকথনের সূচনাও হয়, তা অচিরেই উপনীত হয় ভগবদ সাগরে। যেমন দুকূলপ্লাবী ভাগবতী ধারায় নিষিক্ত বক্তা, তেমনি আপ্লুত হয় শ্রোতৃমণ্ডলী।

ঈশ্বরলাভই যে মানবজীবনের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং ভক্তিযোগই যে বর্তমান যুগে ভগবানকে পাবার প্রকৃষ্ট উপায় সাধারণের পক্ষে—একথা প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে অবতারকল্প শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব। সর্ব মতের সহিষ্ণু এবং সমন্বয়ী হয়েও ভক্তিমার্গের মহান প্রবক্তা এবং দৃষ্টান্ত তিনি। আবার স্বয়ং বেদান্তের জীবন্ত বিগ্রহও। জ্ঞান ও ভক্তির, বৈরাগ্য ও প্রেমের অপূর্ব সমাহার তাঁর ব্যক্তিত্বে। সেই স্বরূপের এবং বিভিন্ন মতে দুশ্চর সাধনা ও পরম উপলব্ধির ধারক বাহক তাঁর ভগবদ্ প্রসঙ্গ, অমূল্য তত্ত্বকথা।

কি ঈশ্বরাভিলাষী পণ্ডিত ব্যক্তি, কি সাধারণ জন সকলের অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার তিনি সমাধান করেন। সংসারী মানুষের প্রতিও সহানুভূতির অভাব নেই তাঁর। তাঁদের তিনি অভয় দেন, পথ দেখান ভজন প্রার্থনা ঈশ্বরানুরাগে। সর্বসাধারণের চৈতন্য জাগাতে তাঁর অবতরণ। ভাগবতী বার্তা শ্রোতাদের মনের কন্দরে পৌঁছে দিয়ে যান অন্তরঙ্গভাবে, সর্বাঙ্গীণভাবে।

এমন মনোরঞ্জনী আবেগে ভগবদ্ প্রসঙ্গ করতে আর কোন্ ধর্মোপদেষ্টাকে দেখা গেছে? ঈশ্বরপ্রেমে এমন প্রমত্ত? যেমন ক্বচিৎদৃষ্ট, তেমনি ভাগবতী কথার এমন বিরাম-বিহীন কথকও সুদুর্লভ। ঈশ্বরীয় বিষয় যেন তাঁর প্রাণবায়ু। তত্ত্বালোচনা তাঁর সঙ্গীতের তুল্য শ্রেষ্ঠ আনন্দ, প্রাণারাম। ভগবদ্মুখীনতা এবং ব্যাকুলতার মূর্ত দৃষ্টান্ত তিনি। আর সেই ব্যক্তিত্ব তাঁর দিব্য বাণীতে ধ্বনিত, প্রতিফলিত।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাক সৌকর্য তাঁর আশ্চর্য প্রজ্ঞার বাহনস্বরূপ। বৈদগ্ধ্যে, দৈবী বক্তব্যে, সর্বাত্মক জ্ঞান বৈভবে অনন্য। বাকপতি তিনি।

তাঁর নানা দিনের সুভাষিত সংগ্রহ থেকে কয়েকটি উদ্ধৃত করা হলো, স্মরণ মননের জন্যে। স্থান কাল পাত্রের পরিচয় দিয়ে বিস্তারিত করা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

'অমৃত সাগরে যাবার অনন্ত পথ। যে কোনো প্রকারে হউক এ সাগরে পড়তে পারলেই হল। মনে কর অমৃতের একটি কুম্ভ আছে। কোন রকমে এই অমৃত একটু মুখে পড়লেই অমর হবে; তা তুমি নিজে ঝাঁপ দিয়েই পড় বা সিঁড়িতে আস্তে আস্তে নেমে একটু খাও, বা কেউ তোমায় ধাক্কা মেরে ফেলেই দিক। একই ফল। একটু অমৃতের আস্বাদন করলেই অমর হবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বলছিলেন পণ্ডিত শশধর প্রমুখ শ্রোতাদের। ঈশ্বর তো শ্রেষ্ঠ লাভের বস্তু। তাই ভগবানকে তিনি অমৃত সাগরের সঙ্গে তুলনা করলেন। ঈশ্বরকে পাওয়া বা অমৃত আস্বাদ করাই লক্ষ—উপায় যা-ই হোক। ভগবদ্ সান্নিধ্য লাভ করলেই অমৃত পানের তুল্য অমরত্ব বা মোক্ষ বা মুক্তি। জিহ্বায় অমৃত স্পর্শ হলেই অমর হওয়া যায়—তা নিজেই কষ্ট করে কিংবা অপরের সাহায্যে—যে ভাবেই হোক—ফল এক প্রকার—অমরত্ব লাভ। ভগবদ্ দর্শন।

অমৃত সাগরে উপনীত হওয়া বা ঈশ্বর লাভই অভিন্ন লক্ষ্য বা গন্তব্যস্থল। কিন্তু তার পথ বা উপায় ভিন্ন ভিন্ন। সব পথেই পৌঁছানো যায় সেখানে। অন্যত্রও শ্রীঠাকুর ছাদে ওঠার উপমা যোগে এই তত্ত্ব বুঝিয়েছেন। সিঁড়ি দিয়ে কিংবা মই বেয়ে কিংবা দড়ি ধরেও ওঠা যায় ছাদে। ভগবৎ লাভেরও সহজ, কঠিন নানা উপায় বা পন্থা বর্তমান। এক এক প্রকার যোগে ঈশ্বর-জ্ঞান সম্ভব। একনিষ্ঠভাবে যদি কেউ ভগবানকে চায়, যে কোনো পথেই তাঁকে পাওয়া যায়। সেইসব পথের সন্ধানও তিনি দিলেন—

'অনন্ত পথ—তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি—যে পথ দিয়ে যাও আন্ত-

রিক হলে ঈশ্বরকে পাবে।' আন্তরিকতা বলতে ভগবানের প্রতি এক নিষ্ঠ মনোবৃত্তি কর্তব্য। মানুষ আন্তরিক হতে পারে, মন ও মুখ এক করলে অর্থাৎ সত্যকার সরল হলে। এই মন ও মুখ এক করা বা সরল হওয়ার কথা শ্রীরামকৃষ্ণ অন্যত্রও বলেছেন বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে। সরল স্বভাব না হলে মন ঈশ্বরমুখীন হয় না।

ভগবৎ সান্নিধ্য লাভের জন্যে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিমার্গের পরিচয় তিনি দিয়েছেন এখানে। সেই সব পথ বা যোগ কয় প্রকার, কি তাদের সাধন ও প্রকৃতি—সে প্রসঙ্গও আরম্ভ করলেন—মোটামুটি যোগ তিন প্রকার—'জ্ঞান যোগ, কর্ম যোগ আর ভক্তি যোগ।'

ঈশ্বর লাভের পথই যোগ। যোগ অর্থ পরমাত্মার সঙ্গে যোগ বা মিলন। যোগের সাধন বিভিন্ন হলেও লক্ষ্য এক—ভগবানকে পাওয়া। আরো বিস্তারিত করে শ্রীঠাকুর বললেন, 'জ্ঞান যোগ—জ্ঞানী, ব্রহ্মকে জানতে চায়। 'নেতি নেতি' বিচার করে। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এই বিচার করে। সদাসদ্ এই বিচার করে। বিচারের শেষ যেখানে, সেখানে সমাধি হয়, আর ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ হয়।

'কর্মযোগ—কর্ম দ্বারা ঈশ্বরে মন রাখা। তুমি যা শিখাচ্ছ। অনাসক্ত হয়ে প্রাণায়াম, ধ্যান ধারণাদি কর্মযোগ। সংসারী লোকেরা যদি অনাসক্ত হয়ে ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে, তাঁতে ভক্তি রেখে, সংসারের কর্ম করে, সেও কর্মযোগ। ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে পূজা জপাদি কর্ম করার নামও কর্মযোগ। ঈশ্বর লাভই কর্মযোগের উদ্দেশ্য।

'ভক্তিযোগ—ঈশ্বরের নাম গুণ কীর্তন এইসব করে তাঁতে মন রাখা। কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ সহজ পথ। ভক্তিযোগই যুগধর্ম।'

অবশেষে, তিনটি যোগের কার্যকারিতা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যও জানালেন, এক একটি যোগপন্থার উল্লেখ করে—

'কর্মযোগ বড় কঠিন—প্রথমতঃ, আগেই বলেছি, সময় কই? শাস্ত্রে যেমন কর্ম করতে বলেছে, তার সময় কই? কলিতে আয়ু কম। তার পর অনাসক্ত হয়ে, ফল কামনা না করে, কর্ম করা ভারি কঠিন। ঈশ্বর লাভ

না করলে ঠিক অনাসক্ত হওয়া যায় না। তুমি হয়ত জান না, কিন্তু কোথা থেকে আসক্তি এসে পড়ে।

'জ্ঞান যোগও—এ যুগে ভারি কঠিন। জীবের একে অন্নগত প্রাণ ; তাতে আয়ু কম। আবার দেহ বুদ্ধি কোনমতে যায় না। এদিকে দেহ বুদ্ধি না গেলে একেবারে জ্ঞানই হবে না। জ্ঞানী বলে, আমি সেই ব্রহ্ম, আমি শরীর নই, আমি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, এ সকলের পার। যদি রোগ, শোক, সুখ, দুঃখ এসব বোধ থাকে, তুমি জ্ঞানী কেমন করে হবে? এদিকে কাঁটায় হাত কেটে যাচ্ছে, দর্‌দর্‌ করে রক্ত পড়ছে, খুব লাগছে—অথচ বলছে, কৈ হাত তো কাটে নাই। আমার কি হয়েছে?'

সুতরাং শ্রীঠাকুরের নির্দেশ—জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগ ঠিক যুগোপযোগী নয়—'তাই এ যুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। এতে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগ আর অন্যান্য পথ দিয়েও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এসব পথ ভারি কঠিন।'

ভক্তিমার্গের আরো ব্যাখ্যা করে বললেন, 'ভক্তিযোগ যুগধর্ম'—তার এ মানে নয় যে, ভক্ত এক জায়গায় যাবে, জ্ঞানী বা কর্মী আর এক জায়গায় যাবে। এর মানে যিনি ব্রহ্ম জ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তিপথ ধরেও যান, তাহলেও সেই জ্ঞান লাভ করবেন। ভক্তবৎসল মনে কর-লেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন।'

তবে ভক্তি মার্গীরও ব্রহ্মজ্ঞান হতে পারে, তিনি কি ধরনের কর্ম ও প্রার্থনা করেন, এসব বিষয়েও শ্রীরামকৃষ্ণ জানালেন—'ভক্ত ঈশ্বরের সাকার রূপ দেখতে চায় ও তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চায় ;—প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। তবে ঈশ্বর ইচ্ছাময়, তাঁর যদি খুশি হয় তিনি ভক্তকে সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী করেন। ভক্তিও দেন, জ্ঞানও দেন।'

ঈশ্বর দর্শনকে তিনি বাইরে থেকে কলকাতায় আগমনের সঙ্গে তুলনা করলেন। আর গড়ের মাঠ, মিউজিয়াম প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থান যেন ভগ-

বানের ঐশ্বর্য—'কলকাতায় যদি কেউ একবার এসে পড়তে পারে তাহলে গড়ের মাঠ, সুসাইটি সবই দেখতে পায়।'

'কথাটা এই, কলকাতায় কেমন করে আসি।'

অর্থাৎ কিভাবে ঈশ্বরলাভ হবে, তা-ই প্রশ্ন। শ্রীঠাকুরের ভগবান হলেন জগজ্জননী, চিন্ময়ী কালী। সন্তান-ভাব তাঁর প্রার্থিত। তাঁর প্রিয় মাধ্যম ঈশ্বরের অনুষঙ্গে তিনি মাতৃভাবে ভাবিত। এই ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গেও বিশ্ব-জননীর উল্লেখ করে বললেন, 'জগতের মাকে পেলে, ভক্তিও পাবে, জ্ঞানও পাবে। জ্ঞানও পাবে, ভক্তিও পাবে। ভাবসমাধিতে রূপ দর্শন, নির্বিকল্প সমাধিতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন হয়, তখন অহং, নাম, রূপ থাকে না।

'ভক্ত বলে, মা, সকাম কর্মে আমার বড় ভয় হয়। সে কর্মে কামনা আছে। সে কর্ম করলেই ফল পেতে হবে। আবার অনাসক্ত হয়ে কর্ম কঠিন। সকাম কর্ম করতে গেলে তোমায় ভুলে যাবো। তবে এমন কর্মে কায নাই। যতদিন না তোমায় লাভ করতে পারি, ততদিন পর্যন্ত যেন কর্ম কমে যায়। যেটুকু কর্ম থাকবে সেটুকু কর্ম যেন অনা-সক্ত হয়ে করতে পারি, আর সঙ্গে সঙ্গে যেন খুব ভক্তি হয়। আর যত-দিন না তোমায় লাভ করতে পারি, ততদিন কোন নূতন কর্ম জড়াতে মন না যায়। তবে যখন তুমি আদেশ করবে তখন তোমার কর্ম করবো, নচেৎ নয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ এই প্রসঙ্গ আরম্ভ করেছিলেন তাঁর পরম উদার ও সম্প্র-দায়-উত্তীর্ণ বাণী প্রচারে—ঈশ্বরলাভের বহু উপায় আছে। অন্যদিনেও যেমন তিনি চিরস্মরণীয় উক্তি করেছেন—'যত মত তত পথ।'

কিন্তু তার মধ্যেও, সাধারণের পক্ষে এবং বর্তমান যুগে ভক্তিমার্গই সহজ ও উপযোগী, একথাও জানিয়েছেন। তিনি নিত্যসিদ্ধ হয়েও স্বয়ং সাধনা করেছিলেন বিবিধ পন্থায়। তাই তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি ছিল—ভগবৎ আরাধনার মত ও পথ বিবিধ হলেও লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অভিন্ন।

বিশ্বাত্মা অন্তর্যামীরূপে ব্রহ্মাণ্ডের সকল জীবে, সমস্ত বস্তুতে, অণু পর-

মাণুতে বিদ্যমান। তার যাবতীয় বহিঃপ্রকাশের যত বিভিন্ন নামই হোক, সবার মূলে সেই এক ও অদ্বিতীয়। এই অনুভবের পরিণতিতে আত্মদর্শন বা ঈশ্বরদর্শন। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে, ভালবাসায় সেই উপলব্ধি সব চেয়ে সহজে আসে, জানিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

ঈশ্বর তো সর্বব্যাপী। জগতের যাবতীয় প্রাণীতে ও স্থানে তিনি অবস্থিত। তবু কেন আমরা তাঁকে দেখতে পাই না ? তাঁর এবং আমাদের মধ্যে কিসের অন্তরায় এবং কেন ?

শ্রীঠাকুর সেবিষয়ে বলেন, 'জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ করে রেখেছে।' 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।' যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্তা' এই বোধ হয়ে গেল, তা হলে সে ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল। তার আর ভয় নেই।'

তারপর ঈশ্বরকে সূর্য এবং অহঙ্কার বা মায়াকে মেঘের সঙ্গে উপমিত করে, বুঝিয়ে দিলেন, 'এই মায়া বা অহঙ্কার যেন মেঘের স্বরূপ। সামান্য মেঘের জন্য সূর্যকে দেখা যায় না—মেঘ সরে গেলেই সূর্যকে দেখা যায়। যদি গুরুর কৃপায় একবার অহং বুদ্ধি যায় তাহলে ঈশ্বর দর্শন হয়।...

একেবারে চাক্ষুষ উপমা যোগে জলবৎ তরল করে দেখালেন—'এই দেখ, আমি এই গামছাখানা দিয়ে মুখের সামনে আড়াল করছি আর আমায় দেখতে পাচ্ছ না। তবু আমি এত কাছে। সেইরূপ ভগবান সকলের চেয়ে কাছে, তবু এই মায়া বা আবরণের দরুণ তাঁকে দেখতে পারছ না।'

নিখিল বিশ্বে ভগবান পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন চিৎশক্তি এবং অখণ্ডরূপে। আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্ব বোধের জন্যে আমরা খণ্ডিত হয়ে থাকি। সেই 'আমি'-রূপ অহঙ্কার আড়াল করে আমাদের মহত্তর বৃহত্তর স্বরূপ। সেই অন্তরাল দূর হয়ে যায় যদি আমরা সেই অখণ্ড সত্তার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে দিই। এই ক্ষুদ্র আমিত্ববোধ ঘুচে গেলেই মনের সব

জঞ্জালও মুক্ত হবে। পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার একাত্মবোধ জাগবে। বিদুরিত হয়ে যাবে প্রবৃত্তির জাল। বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি আসবে. অজ্ঞানের তন্তে জ্ঞান।

তিনি বলেছেন, 'আমি অকর্তা' এই বোধ হলেই জীবন্মুক্ত হয়ে যায় .স ব্যক্তি। কারণ 'আমি অকর্তা' এই জ্ঞান থেকেই ধারণা হয় যে, ঈশ্বরই কর্তা। আমি যন্ত্র মাত্র। এই বিচার ও জ্ঞানে অধিষ্ঠিত থাকলেই আত্ম-জ্ঞান লাভ হয়। সেই তার পরম প্রাপ্তি। তখন 'তার আর ভয় নাই।' কারণ তখন তো তার সংসার বন্ধন, মায়ার বন্ধন সব ছেদ হয়েছে। সমস্ত পাশ থেকে মুক্তিলাভ করে যুক্ত হতে পেরেছে ঈশ্বরের সঙ্গে।

'জীবন্মুক্ত' হবার কথায় মৌল তত্ত্বটিও শোনালেন—'জীব তো সচ্চিদা-নন্দস্বরূপ। কিন্তু এই মায়া বা অহঙ্কার তাদের সব নানা উপাধি হয়ে পড়েছে, আর তারা আপনার স্বরূপ ভুলে গেছে। '

মানুষ বা জীব প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের অংশ—যে ব্রহ্ম মায়ার অতীত—যে শিব, চিরমুক্ত। কিন্তু অজ্ঞান বশে মানুষ এ সত্য ভুলে থাকে বা বুঝতে পারে না। মায়া বা মিথ্যা জ্ঞান বা অজ্ঞানের জন্যে ভ্রমে পড়ে অর্থাৎ বিভ্রান্ত হয়। তখন সে ভুলে যায় কি সৎ বা নিত্য আর কি অসৎ বা অনিত্য অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী, বিকারগ্রস্ত। অর্থাৎ নিজের সৎ চিৎ আনন্দ-স্বরূপ বিস্মৃত হয়। কিন্তু যদি তার অজ্ঞান বা মায়া বা অহঙ্কার দূর হয়, সে উপলব্ধি করতে পারে তার আপন সত্তা, যে সে চৈতন্যস্বরূপ। চিৎ শক্তিরূপে যা অখিল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত আছে—সে তারই অংশ।

তাই মায়ার পারে গেলে তার মুক্তিলাভ হয় বিশ্বচৈতন্যে। এখানে গুরুর কৃপার কথাও শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন। গুরু কে? যিনি মলিনতা বা অজ্ঞানতা দূর করেন, যিনি মায়ার বন্ধন মুক্ত করেন, তিনিই গুরু। যিনি স্বয়ং মায়াতীত হয়ে আত্মদর্শন করেছেন, যাঁর আত্মজ্ঞান হয়েছে গুরুরূপে তাঁরই অধিকার।

অজ্ঞান অর্থ ঈশ্বরকে না জানা। জ্ঞান অর্থ তাঁকে জানা বা লাভ করা। ঈশ্বর—বিশ্বব্যাপী চৈতন্য। সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ তিনি।

ঈশ্বর সর্বদাই 'অস্তি' বা সৎরূপে বিদ্যমান। তিনিই সর্ব বস্তু ও প্রাণীতে ব্যাপ্ত চৈতন্যরূপে চরাচরে সুপ্রকাশ।
তিনি নিত্য, শুদ্ধ। তিনি একমাত্র অপরিবর্তনীয়। অক্ষর অর্থাৎ যাঁর ক্ষয় নেই। আর সকল কিছুই পরিবর্তনশীল অর্থাৎ অসার বা মিথ্যা। ঈশ্বর যে পরম চৈতন্যস্বরূপ এই উপলব্ধি বা বোধই জ্ঞান। ঈশ্বরের সত্তা যিনি ধারণা করেছেন, যাঁর ঈশ্বরলাভ হয়েছে তিনিই পূর্ণ জ্ঞানী।

'আমি মনে ত্যাগ করতে বলি, সংসার-ত্যাগ বলি না। অনাসক্ত হয়ে সংসারে থেকে আন্তরিকভাবে চাইলে তাঁকে পাওয়া যায়।'
শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বলছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে। 'যত মত তত পথ' আদর্শের প্রবক্তা সাধনমার্গ সম্বন্ধে যেমন পরম উদার, তেমনি সংসারীদের প্রতিও গভীর সহানুভূতি সম্পন্ন। গৃহীও তাঁর অবজ্ঞার পাত্র নয়। গৃহস্থাশ্রমে থেকেও লোকে ধর্মজীবন যাপন করতে পারে, ঈশ্বরানু-রাগ সম্ভব, ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ করা যায়—এই অভয়বাণী তাঁর। ঈশ্বর দর্শনের জন্যে সংসার ত্যাগ আবশ্যিক নয়—বৈরাগ্য সাধনের তুল্য সমান গুরুত্ব দিয়েই তিনি একথা বলেছেন।
সকলেই পেতে পারে ঈশ্বরকে। তবে সেজন্যে সংসারে অনাসক্ত হয়ে বাস করা প্রয়োজন। আসক্তিবিহীন হয়ে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করলে, ভগবদ্ ভক্তিতে একান্ত নিষ্ঠা থাকলে, তাঁকে লাভ সম্ভব। নানা দিনে নানা কথায় শ্রীঠাকুর এই আশ্বাস দিয়েছেন।
নিরাসক্ত হলে মনে ত্যাগ করা যায়। অন্তরে ত্যাগই বড় কথা। সংসারে থেকেও নিরাসক্তি হতে পারে, মনে ত্যাগী হলে। আরো নানাভাবে তিনি একথা জানিয়েছেন। পাঁকাল মাছের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন অমনি অমলিন থাকতে, পঙ্ক সলিলে বাস করেও। বিবেক বৈরাগ্যের হলুদ গায়ে মেখে, সংসার সমুদ্রে কুমীরের সঙ্গে বসবাস করবার উপমাও তাঁরই। বিবেকী, বৈরাগ্যবান হলে কামনা বাসনা জয় করা সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং যে পত্নীকে ত্যাগ করেন নি, সংসার-আশ্রমকে স্বীকার

করেছেন, মর্যাদা দিয়েছেন, তাও তো গৃহস্থ ঈশ্বরাভিলাষীদের সামনে আদর্শ দৃষ্টান্তস্বরূপ।

আর সাধারণ মানুষ সংসার ত্যাগ করে যাবে কোথায়? বরং সংসারে স্ত্রী যদি অবিদ্যারূপিণী না হয়, অন্নাদি সংস্থানে নিশ্চিন্ত থেকে ঈশ্বরে মন রাখা সুবিধা। নচেৎ সংসার ত্যাগ করলে শত বাস্তব অসুবিধা। যেখানে যাবে বা থাকবে সেখানেই নানা প্রয়োজন দেখা দেবে। আর একটা সংসার গড়ে উঠবে একের পর এক উপকরণ যোগে। 'কৌপীন্‌কো ওয়াস্তে' সেই সাধুর দুর্গত অবস্থার গল্পও তো এই সম্পর্কেই শুনিয়েছেন। আনুষঙ্গিক নানা উপকরণ জমা হয়ে গড়ে ওঠে আরেকটা সংসার। প্রয়োজনের বিভিন্ন দাবি মেটাতে ভগবানকে আরাধনায় আর সময় সুযোগ থাকে না।

এজন্যে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, সংসারের কেল্লায় থেকেই যুদ্ধ করতে। আহারাদির সমস্যায় আর তাহলে বিব্রত হতে হবে না। তবে ঈশ্বরে সদা জাগ্রত রাখতে হবে চিত্তকে। সংসারে করণীয় সব কাজ করে যেতে হবে। কিন্তু মনে ধারণা থাকবে যে ভগবানই একমাত্র আপন। এই বোধেরও উপমা দিয়েছেন ধনী গৃহের পরিচারিকার দৃষ্টান্তে। সে যেমন মনিবের পুত্র-কন্যাকে আপনার ভাব দেখিয়ে কর্তব্য করে, কিন্তু মনে মনে জানে তার আপনজন দেশে থাকে, তেমনি সংসারী ব্যক্তিরা ঈশ্বরকে যথার্থ অন্তরঙ্গ মনে রেখে অপর সকলের প্রতি কর্তব্য করে যাবে নিরাসক্তভাবে। মনের ত্যাগ অভ্যাসে পরিণত হবে। সংসারের মায়ায় জড়িত, বিভ্রান্ত না হয়ে, ভগবানই যে সবচেয়ে আপন এই বোধে থাকবে অবিচল। ঈশ্বরই একমাত্র আশ্রয়, সহায় এবং অবলম্বন এই ভাব অন্তরে গ্রথিত রাখতে হবে সব বাহ্য কায ও কর্তব্যের মধ্যে। তাহলে আর সংসারের মায়ায় মন আবদ্ধ হবে না। আসবে না আসক্তি।

ভগবানে মন প্রাণ সমর্পিত রাখতে হবে। ঈশ্বরে যদি শরণাগতি থাকে তাহলে আর অভিভূত করতে পারবে না আমিত্ব বা অহঙ্কার।

গৃহস্থাশ্রমে থেকেও ভগবানকে ডাকা যায়, আরাধনা করা যায়। সেই উপায়ে ঈশ্বরলাভের আশ্বাস শ্রীঠাকুর দিয়েছেন নানাভাবে। মাতৃসাধক রামপ্রসাদের বাণী স্মরণ করে বলেছেন, 'কালী নামে দাও রে বেড়া ফসলে তছরূপ হবে না।' কালী নাম অর্থ তাঁর ঈশ্বরের ইষ্ট নাম। রামপ্রসাদ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের কালী হলেন ব্রহ্মময়ী বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারণস্বরূপিণী। তাঁর কর্তৃত্বে যদি একান্তভাবে নিজেকে অর্পণ করা যায় তিনি অবশ্যই সন্তানের ভার নেন। কিন্তু তাঁর নিকটে সম্পূর্ণ শরণাগতি প্রয়োজন।

শরণ নিলে, ব্রহ্মময়ী কালী, ভাষান্তরে ঈশ্বর, হন রক্ষা-কবচ। তিনি জাগতিক সকল দুর্বিপাকে আশ্রয় দেন, রক্ষা করেন। তখন শান্তিও পায় সংসারী জীব। অন্তরে ত্যাগও আর কষ্টকর বোধহয় না। 'ফসলে তছরূপ হবে না'—অর্থাৎ সুখ ও শান্তি থাকবে। 'ঈশ্বরে শরণাগতি হও, সব পাবে'—শ্রীঠাকুরের অভয়বাণীর এই তাৎপর্য।

ঈশ্বরে একনিষ্ঠ অনুরাগী হলে আর ভয় কি? যে সত্যকার ভক্ত সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে একমাত্র ভক্তি, শুদ্ধা ভক্তি। অন্য কিছুই তার কাম্য নয়। আর ভগবান তো 'ভাবগ্রাহী', এও শ্রীরামকৃষ্ণেরই বাণী। ঈশ্বর অন্তর্যামী। তিনি দেখেন সকলের অন্তর। যে যা মনে করে সাধনপর হয়, তার তেমনি হয়ে থাকে। অর্থাৎ ভগবান তেমনি ভাব দেন তাকে। শ্রীঠাকুরেরই আরেকটি অমৃত উক্তি—'যেমন ভাব তেমনি লাভ।'

ভগবানকে পাবার জন্যে সকলকে উদ্‌বুদ্ধ করতে, সাধারণ সংসারী মানুষদের মনকে ঈশ্বরমুখী করতে শ্রীরামকৃষ্ণ কতভাবেই নির্দেশ দিয়েছেন। কত অনুসরণযোগ্য বাস্তব পন্থার সন্ধান না দিয়েছেন লোকশিক্ষার জন্যে। একেবারে বৈরাগ্য কিংবা সাধনমার্গ অবলম্বন না করেও যে ধর্ম জীবনযাপন করা যায়, ঈশ্বর সান্নিধ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব—এই তাঁর বিশিষ্ট আশ্বাস দান। জীবের দুঃখে কাতর হয়ে কত উপায়ের কথা তিনি বলেছেন, নানা দিনের প্রসঙ্গ কথায়।

'একটু কষ্ট করে সৎসঙ্গ করতে হয়। বাড়িতে কেবল বিষয়ের কথা। রোগ লেগেই আছে। পাখী দাঁড়ে বসে তার রাম নাম বলে। বনে উড়ে গেলে আবার কাঁ্যা কাঁ্যা করবে।' একদিন বলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

সৎ বা সাধুসঙ্গে মন সহজে ঈশ্বরের দিকে যায়। সংসারে নিরন্তর স্থূল স্বার্থ আর তা চরিতার্থ করবার জন্যে সকলের চেষ্টা ও উদ্যম। ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষা করতে সদসৎ কত উপায় অবলম্বন করে সংসারী ব্যক্তিরা। তার ফলে, পরম লক্ষ্য ও সত্যের দিক থেকে লোকের মনকে ফিরিয়ে রাখে। ভোগ সুখের পরিবেশ চিত্তকে বিমুখ করে ঈশ্বর-চিন্তা থেকে। কিন্তু সেই অন্তরই ধর্মের পথে, ঈশ্বরের অনুকূলে আসে সাধুসঙ্গের প্রভাবে। সংসারভোগীর বিক্ষুব্ধ চিত্ত সুস্থির হতে পারে। দূর হয় মনের নানা-প্রকার মালিন্য। পাখী দাঁড়ে যুক্ত হয়ে সুশিক্ষা পেলে তবে অভ্যস্ত হয় রাম নাম উচ্চারণে। তেমনি সৎসঙ্গে সংসারীর আবিল চিত্তও পরিশুদ্ধ হওয়া সম্ভব। বনবিহঙ্গের অমার্জিত, কর্কশ রবের তুল্য—সাধুসঙ্গ-বর্জিত সংসারী জীব, স্বার্থান্ধ পঙ্কিল পারিপার্শ্বিকে। আবার সন্তজন প্রভাবে সেই মনেই মধুর ঈশ্বরের নাম ধ্বনিত হতে পারে। দর্পণকে নিত্য মার্জনা করতে হয় পরিচ্ছন্ন রাখবার জন্যে। তবে সেই মুকুরে অবিকৃত প্রতিবিম্ব দেখা যায়। তেমনি সৎসঙ্গের ফলে পরিমার্জিত, পরিশুদ্ধ হয় চিত্তবৃত্তি। তখনই অন্তরে ভগবৎ-ভাব প্রতিফলিত হতে পারে।

সৎসঙ্গ করলে মনের সদসৎ বিচার আসে—অন্যত্রও তিনি একথা বলে-ছেন। জগতে কি সৎ বা নিত্য, সারবস্তু, সুতরাং গ্রহণীয় এবং কি অসৎ অর্থাৎ অনিত্য, অসার, সুতরাং বর্জনীয়—এই বোধ ও জ্ঞান হলো সৎ সঙ্গ লাভের সুফল।

সাধারণ মানুষের জীবনে সাধুর মহান ভূমিকার কথা আরো স্পষ্টভাবে শ্রীঠাকুর বুঝিয়ে দিয়েছেন। 'সাধুসঙ্গ সর্বদা দরকার। সাধু ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করে দেন।' অর্থাৎ তিনি যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন ঈশ্বরের

সঙ্গে।

সাধুর জীবনের দৃষ্টান্ত, তাঁর সদাচরণ, তাঁর উপলব্ধির প্রকাশ, তাঁর ঈশ্বরের সঙ্গে সাযুজ্য প্রেরণা দেয় সংসারীকে। তার মনকে ভক্তি পথে যাত্রার জন্যে, ভগবৎ ভাবে ভাবিত হবার জন্যে উদ্দীপিত করে। ঈশ্বরকে জানবার সহায়ক হন সাধু মহাত্মারা। ভগবানের স্বরূপ জ্ঞাত হতে, তাঁকে লাভ করতে সাহায্য করেন। ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগের মাধ্যম হন তাঁরা। এজন্যেই সাধুসঙ্গের বিশেষ প্রয়োজন।

সৎ সঙ্গের মতন ভগবানের নাম নিতে, তাঁর নাম গুণগান করতেও বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ—'কারণ—ঈশ্বরের নামে মানুষ পবিত্র হয়। তাই নাম কীর্তন অভ্যাস করতে হয়।'

ভগবানের গুণগান করলে তাঁর ধারণা, তাঁর ভাবনা মনে জাগে। ঈশ্বরকে ধ্যানেরই কাজ হয় তাঁর নাম গুণগান থেকে। ভগবদ সান্নিধ্য লাভ করবারও অন্যতম উপায় তাঁর নাম কীর্তন করা। আবার তাঁর ধ্যান ধারণা করতে বিষয়-ভোগে বিতৃষ্ণা আসে বা চিত্তে বৈরাগ্যের উদয় হয়। যে মন চঞ্চল হয়ে নিক্ষিপ্ত ছিল নানা দিকে, তা স্থিতি লাভ করে ঈশ্বরে।

আরো এক লাভ। ভগবানের নাম গুণ গান নিয়মিত করলে তা অভ্যাসে পরিণত হয়। তাহলে অন্তকালে তাঁর নামই মনে আসবে নিত্য অনুধাবনের ফলে। আর মৃত্যুর সময়ে ঈশ্বরের নাম অন্তরে রণিত হতে থাকলেই মুক্তি। ভগবানের নাম কীর্তনের এত মাহাত্ম্য। নিয়মিত ঈশ্বরের নাম নেওয়াকে অভ্যাস-যোগও বলা যায়। বারংবার চেষ্টা ও যত্নের ফলে স্বভাবে পরিণত হয় ভগবৎ আরাধনা। সব চেয়ে বড় লক্ষ্য যে ঈশ্বর উপলব্ধি, তা সহজে সাধিত হতে পারে তাঁর নাম গুণ কীর্তনে।

শ্রীঠাকুর বহুবারই একথা বলেছেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে এই এক ফলপ্রদ যোগ। নাম সঙ্কীর্তন ঈশ্বর ভাবনার এক শ্রেষ্ঠ উপায়। কলিতে ভক্তিমার্গই সংসারীর মুক্তি লাভে প্রকৃষ্ট পন্থা। এ-যুগে মানুষের সময়

কম, অস্থির জীবন। অধিক সময়ব্যাপী আরাধনা কিংবা সাধনা অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ উপমা দিয়েও বলেছেন, 'এখন ফিবার মিকশ্চার।' রোগটি বিকার, অথচ আশু উপকার চাই। কবিরাজের সালসা পাঁচন ইত্যাদিতে দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা অনেক সময়সাপেক্ষ। 'তার মধ্যে রোগীর এদিক ওদিক হয়ে যেতে পারে।' সকৌতুকে বলেছেন তিনি। কিন্তু স্বল্প সময়ে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ স্থাপিত হতে পারে তাঁর নাম গুণকীর্তনে। আর তা অনায়াসসাধ্য।

কিন্তু সংসার-ত্যাগী সাধকদের জন্যে, সন্ন্যাসীদের জন্যে রীতিমত সাধন ব্যবস্থা। চিহ্নিত শিষ্যদের সেই প্রস্তুতিও শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং আরম্ভ করিয়ে দেন। তাঁদের যাত্রা আরম্ভ হয়ে যায় অধ্যাত্ম-জীবনের পথে। তাঁর তত্ত্বাবধানে শিষ্যদের জপ ধ্যানাদি শিক্ষারও আভাস পাওয়া যায়। গঙ্গাধরের জীবনীতে বিবরণ পাওয়া গেছে, শ্রীঠাকুর তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছেন ধ্যান করতে হয় কিভাবে। নরেন্দ্রকে পঞ্চবটীতে ধ্যান করতে বলছেন তারও উল্লেখ আছে 'কথামৃত'তে। লাটুর জীবনী থেকে জানা যায় একদিন তাঁর ধ্যান এমন সমাধির অবস্থায় উঠে যাচ্ছিল যে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে নামিয়ে আনেন। সেসব প্রসঙ্গ আলোচ্য নয় এখানে। শুধু উল্লেখ্য, জপ ও বিশেষভাবে ধ্যান সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি।

ধ্যানীরা জানেন, ধ্যান বিষয়টির পরিচয় দেওয়া কত কঠিন। কিন্তু বাচস্পতি শ্রীঠাকুর একাধিক দিন কি যথার্থভাবে ধ্যান প্রক্রিয়ার বর্ণনা করেছেন। কখনো প্রত্যক্ষ বিবৃতিতে, কখনো উপযুক্ত উপমার সাহায্যে তাঁর ব্যাখ্যান।

একদিন বললেন—'ধ্যানের অবস্থা কিরকম জান? মনটি হয়ে যায় তৈলধারার ন্যায়। এক চিন্তা, ঈশ্বরের ; অন্য কোন চিন্তা তার ভিতরে আসবে না।'

এই যে 'তৈলধারার ন্যায়' উক্তি—এ তাঁর আপন অনুভবেরই প্রকাশ।

এমন বর্ণনা আছে পতঞ্জলির যোগসূত্রে কিংবা সদানন্দ যোগীন্দ্র সরস্বতীর রচনায়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তো সেসব গ্রন্থ পাঠ করেন নি। তিনি ধ্যানের পরিচয় দিয়েছেন আপন উপলব্ধি থেকেই।

আবার আরেক রকমেও অন্যদিনে বলেছেন, 'জপ করা কিনা নির্জনে নিঃশব্দে তাঁর নাম করা। এক মনে নাম করতে করতে—জপ করতে করতে—তাঁর রূপ দর্শন হয়—তাঁর সাক্ষাৎকার হয়।'

তারপর যে উপমা যোগ করলেন তা চিত্রবৎ যেন চাক্ষুষ করা যায় এবং অনন্যও—'শিকলে বাঁধা কড়ি-কাঠ গঙ্গার গর্ভে ডুবানো আছে—শিকলের আর এক দিক তীরে বাঁধা আছে। শিকলের এক একটি পাপ ধরে ধরে যেতে যেতে ঐ কড়িকাঠ স্পর্শ করা যায়। ঠিক সেইরূপ জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়।'

এসবই অবতার পুরুষের প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা।

আরেকদিন বলরাম মন্দিরেও বলেছেন ধ্যানের বিষয়ে। অতিশয় প্রাঞ্জলভাবে এবং সব দিক থেকে বুঝিয়েছেন। আপন অভিজ্ঞতার কথাও জানিয়েছেন প্রসঙ্গত—

'সাধনার সময় আমি ধ্যান করতে করতে আরোপ করতাম প্রদীপের শিখা—যখন হাওয়া নাই, একটুও নড়ে না—তার আরোপ করতাম। গভীর ধ্যানে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়।'

নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপশিখাবৎ ধ্যানের অবস্থাও পতঞ্জলির সূত্রে প্রাপ্তব্য। কিন্তু, আগেই বলা হয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণ তো পাঠ করেন নি যোগশাস্ত্র গ্রন্থ। তিনি স্বয়ং এক যোগীশ্রেষ্ঠ, যোগ প্রক্রিয়ার সার্থক সাধক। তাই নিজস্ব অনুভব থেকে ধ্যানীর একাগ্রতার পরিচয় দেন শিকারীর উপমানে—'একজন ব্যাধ পাখী মারবার জন্য তাগ করছে। কাছ দিয়ে বর চলে যাচ্ছে, সঙ্গে বরযাত্রীরা, কত রোশনাই, বাজনা, গাড়ি, ঘোড়া—কতক্ষণ ধরে কাছ দিয়ে চলে গেল। ব্যাধের কিন্তু হুঁস নাই। সে জানতে পারল না যে কাছ দিয়ে বর চলে গেল।'

ধ্যানীর এমন তদ্‌গত অবস্থা তিনি জেনেছেন নিজেরই অনুভবে। তাই

আরো বুঝিয়ে দেন—
'ধ্যানে এইরূপ একগ্রতা হয়, অন্য কিছু দেখা যায় না, শোনাও যায় না। স্পর্শবোধ পর্যন্ত হয় না। সাপ গায়ের উপর দিয়ে চলে যায় জানতেও পারে না। যে ধ্যান করে সেও বুঝতে পারে না—সাপটাও জানতে পারে না।' সাপের না জানার কারণ—ধ্যানীর শরীর তখন অচঞ্চল জড়বৎ।
সাধারণত চক্ষু মুদ্রিত বা আবৃত করে ধ্যান করাই রীতি। কারণ তাহলে কোনো দৃশ্যমান বস্তু বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। মনও হয় একান্ত একাগ্র।
সেই ধ্যানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেন সুনিপুণ ভাষ্যকার। পরিপাটি ভাষায় শ্রোতাদের কাছে উদ্‌ঘাটন করেন—'গভীর ধ্যানে ইন্দ্রিয়ের সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। মন বহির্মুখ থাকে না—যেন বার-বাড়িতে কপাট পড়লো! ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়—রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ—বাহিরে পড়ে থাকবে।
'ধ্যানের সময় প্রথম প্রথম ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল সামনে আসে—গভীর ধ্যানে সে সকল আসে না—বাহিরে পড়ে থাকে।'
এবার নিজের অভিজ্ঞতা কিছু বললেন—'ধ্যান করতে করতে আমার কত কি দর্শন হত। প্রত্যক্ষ দেখলাম—সামনে টাকার কাঁড়ি, শাল, একথালা সন্দেশ, দুটো মেয়ে, তাদের ফাঁদী নথ। মনকে জিজ্ঞাসা করলাম আবার—মন তুই কি চাস? মন বললে, 'না, কিছুই চাই না। ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছুই চাই না।' মেয়েদের ভিতর বার সমস্ত দেখতে পেলাম—যেমন কাঁচের ঘরে সমস্ত জিনিস বাইরে থেকে দেখা যায়!··'
সেসবই তাঁর জ্বলন্ত বৈরাগ্য আর আত্মদর্শনের কথা। সব প্রলোভন নস্যাৎ করার কিছু আভাস—'সাধনার সময় ধ্যান করতে করতে আমি আরো কত কি দেখতাম। বেলতলায় ধ্যান করছি, পাপ পুরুষ এসে কত রকম লোভ দেখাতে লাগল।·· টাকা, মান, রমণী সুখ, নানারকম

শক্তি, এই সব দিতে চাইলে। আমি মাকে ডাকতে লাগলাম। বড় গুহ্য কথা। মা দেখা দিলেন, তখন আমি বললাম, মা ওকে কেটে ফেলো! মার সেই রূপ—সেই ভুবনমোহন রূপ—মনে পড়ছে।···কিন্তু চাউনিতে যেন জগৎটা নড়ছে!'

আর একদিন, শ্যামপুকুর বাড়িতে, ধ্যানে অসীমের দ্যোতনা প্রকাশ করে বলেন—

'জ্ঞানীর ধ্যান কি রকম জান? অনন্ত আকাশ, তাতে পাখী আনন্দে উড়ছে, পাখা বিস্তার করে। চিদাকাশ, আত্মা পাখী। পাখী খাঁচায় নাই, চিদাকাশে উড়ছে। আনন্দ ধরে না।'

যাঁরা ধ্যানী, নিয়মিত ধ্যান করে থাকেন তাঁরা বুঝতে পারবেন এই বর্ণনার বিশেষত্ব। কিন্তু কোনো ধ্যানী যোগী তাঁর এই ধরনের উপলব্ধির বিবরণ দিয়েছেন এমন সুষ্ঠুভাবে?

ঈশ্বরকে যে দর্শন করা যায় একথা তিনি যে নরেন্দ্র প্রমুখকে বলেছিলেন, তা সুবিদিত। ভগবানকে সাক্ষাৎকার সম্পর্কে তাঁর একটি দিব্যবাণী আছে যা গভীর অনুভব সাপেক্ষ—'ঈশ্বরকে এ চক্ষে দেখা যায় না। তিনি দিব্যচক্ষু দেন তবে দেখা যায়।'

কি সাবলীল ভাষায় এত বড় সত্যের সার তিনি প্রকাশ করেছেন। এই ধরণের নিগূঢ় ভাবের বাহন হয়ে তাঁর ভাষা কি অনায়াসে বহতা।

কখনো এমন সুচারু রূপকল্প তিনি ব্যবহার করেন যা সাহিত্যের উপভোগ্য সম্পদ। তাঁর সৃষ্ট সুন্দর শিল্পকর্ম এমন সব ভাষণে।

একদিন ভক্ত ও ভক্তিমার্গের কথা বলছিলেন। ভক্তি পথেও কিভাবে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় সেই প্রসঙ্গ—

'যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে একবার ভক্তি হয়, যদি তাঁর নাম গুণ গান করতে ভাল লাগে তা হলে ইন্দ্রিয় সংযম আর চেষ্টা করে করতে হয় না। রিপু-বশ আপনা আপনি হয়ে যায়।'

এই পর্যন্ত বলেই এসে যেতে লাগল উপমা। একটির পর একটি। তার

অন্যতম হল—'বাদুলে পোকা যদি একবার আলো দেখতে পায়, তাহলে
কি সে আর অন্ধকারে থাকে ?'
শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত চিকিৎসক এবং বিজ্ঞানী মহেন্দ্রলাল
সরকার। তিনি বড় তার্কিকও। শ্রীরামকৃষ্ণের ওই বাদুলে পোকার
কথায় মহেন্দ্রলাল হেসে টিপ্পনী কাটলেন—'তা পুড়েই মরুক, সেও
স্বীকার।'
'না গো!'—তৎক্ষণাৎ শ্রীঠাকুর গভীর প্রত্যয়ে প্রত্যুত্তর করলেন। 'ভক্ত
কিন্তু বাদুলে পোকার মত পুড়ে মরে না।' কবির মতন অনুরূপ ব্যাখ্যা
করে বললেন, 'ভক্ত যে আলো দেখে ছুটে যায়, সে যে মণির আলো
মণির আলো খুব উজ্জ্বল বটে, কিন্তু স্নিগ্ধ আর শীতল। এ আলোতে
গা পুড়ে না, এ আলোতে শান্তি হয়, আনন্দ হয়।'
এই যে মণির আলোর সঙ্গে তুলনা, মণির অনুগ্র দীপ্তির বর্ণনা, এমনকি
'মণির আলো'র উপস্থাপনাও লক্ষণীয়। চিত্রকরের বর্ণোজ্জ্বলতা নিয়ে
তাঁর এই বাক্য ফুটে উঠেছে। এমন ভাষণও ক্বচিৎ শ্রুত। কজনের জানা
আছে মণির আলোকের কথা ? কোথায় মেলে তার এমন চাক্ষুষ
উল্লেখ ? কথকের উক্তি মাত্রই রত্নের কোমল রশ্মি শ্রোতার সামনে
যেন ভেসে ওঠে। মন ভরে যায় ভাবের দ্যোতনায়।
বিদগ্ধ সরকার মহাশয়ের বিরুদ্ধ মন্তব্যকে নস্যাৎ করতে এমন সুদক্ষ
উপমারই প্রয়োজন ছিল। আর তা প্রয়োগ করতে এক মুহূর্তও বিলম্ব
করলেন না বাগবাদিনীর বরপুত্র।
তাঁর কথায় কথায় এমনি ঐশ্বর্যের তরঙ্গ যেন দুকূল প্লাবিত করে দেয়।

'ঈশ্বরীয় রূপ।' তাও তাঁর মুখের কথা। আর তা রূপায়ণও করলেন
একদিন। 'ঈশ্বরীয় রূপ মানতে হয়।' সূচনা করেই কি বিরাট ভাবের
প্রতিভাস দিলেন।
শ্রীমকে জিজ্ঞাসা করলেন—'জগদ্ধাত্রী রূপের মানে জানো ?'
শ্রীম উত্তর দেবার আগেই স্বয়ং ব্যাখ্যা করে দিলেন, 'যিনি জগৎকে

ধারণ করে আছেন। তিনি না ধরলে, তিনি না পালন করলে জগৎ পড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়।'

তাত্ত্বিক পণ্ডিতের তুল্য তাঁর এইসব ভাষণ। প্রসঙ্গত আবার আনলেন অন্তর্জগতের কথা। মানুষের মন। সদা চঞ্চল মন। এই মন যদি নিয়ন্ত্রিত না করা যায়, যদি অসংযত হয় তাহলে কিছুই লভ্য নয়। সেজন্যে শান্ত, সংযত করতে হয় মনকে। তবে ধ্যান-মুখী হয়ে শুদ্ধ স্বত্ত্ব প্রকাশ পায়। মনকে তাই তুলনা করা হয়ে থাকে প্রমত্ত হস্তীর সঙ্গে। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'মন করীকে যে বশ করতে পারে, তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হন।'

তখন তাঁর কাছে ছিলেন রাখাল। তিনি যোগ করলেন, 'মন মত্ত করী।'

সেই সূত্রেই শ্রীঠাকুর আনলেন সিংহবাহিনীর রূপকল্প। কারণ সিংহই তো হস্তীকে পর্যুদস্ত করতে পারে। যে সিংহ দেবীর বাহন। রাখালের কথার যেন উত্তর স্বরূপ বললেন, 'সিংহবাহিনীর সিংহ তাই হাতীকে জব্দ করে রেখেছে।'

দেবী জগদ্ধাত্রী ও দুর্গা সিংহবাহিনী। সেই দেবীর শরণ নিতে হয়, তাঁর আরাধনা করতে হয় প্রসন্নতা লাভের জন্যে। তাঁর প্রসঙ্গে, তাঁর আশীর্বাদে সিদ্ধি আসে।

জ্ঞানী বা পণ্ডিতরা দীর্ঘকালের শাস্ত্রচর্চায় যে বিদ্যা অর্জন করেন, প্রাজ্ঞ দার্শনিক যে সব তত্ত্বের অধিকারী, শাস্ত্রপাঠবিহীন দক্ষিণেশ্বরের পূজারী ইচ্ছামাত্র তেমনি প্রসঙ্গের অবতারণা করেন, কথার মাত্রাস্বরূপ শুনিয়ে দেন এক একটি মহাতত্ত্ব। সুগভীর দার্শনিক বিষয় ও তার ব্যাখ্যা অনর্গল উপযুক্ত ভাষায় নিঃসারিত হতে থাকে—

শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, রাধা প্রকৃতি—চিৎশক্তি—আদ্যাশক্তি। রাধা প্রকৃতি, ত্রিগুণময়ী। এর ভিতরে সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ তিনগুণ। যেমন, পেঁয়াজ ছাড়িয়ে যাও। প্রথমে লাল কালোর আমেজ, তরপর লাল, তারপর শাদা বেরুতে থাকে। বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে, কামরাধা, প্রেমরাধা, নিত্য-

রাধা। কামরাধা চন্দ্রাবলী; প্রেমরাধা শ্রীমতী; নিত্যরাধা নন্দ দেখেছিলেন—গোপাল কোলে।'

সেই চিৎশক্তিরও পরিচয় দিয়ে বললেন—

'এই চিৎশক্তি আর বেদান্তের ব্রহ্ম অভেদ। যেমন জল আর তার হিমশক্তি। জলের হিমশক্তি ভাবলেই জলকে ভাবতে হয়, আবার জলকে ভাবলেই জলের হিমশক্তি ভাবনা এসে পড়ে।'

সরস্বতীর অধিষ্ঠান যেন তাঁর জিহ্বাগ্রে। কত শাস্ত্র বাক্যের নির্যাস যে তাঁর বাণীধারায় বিতরিত হতে থাকে। তত্ত্ব যত সূক্ষ্ম বা জটিল হোক তিনি সাবলীলভাবে বুঝিয়ে দেন আশ্চর্য ভাষার বাহনে।

একদিন বিভিন্ন অবস্থার কথা বলছিলেন—কি সুদক্ষভাবে—'স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ! মহাকারণে গেলে চুপ। সেখানে গেলে কথা চলে না।

'মহাকারণ' সাধারণের পক্ষে অবশ্যই দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু তিনি জলবৎ বোধগম্য করিয়ে দিলেন অতি পরিচিত, ঘরোযা দৃষ্টান্ত দিযে। বাড়ির ছাদে ওঠা এবং সেখান থেকে আবার নীচে নেমে আসার উপমায। অবতার কল্প পুরুষের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেও লোকহিতার্থে থাকার প্রসঙ্গ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন—'ঈশ্বরকোটি মহাকারণে গিযে ফিরে আসতে পারে। অবতারাদি ঈশ্বরকোটি। তারা উপরে উঠে, আবার নীচেও আসতে পারে। ছাদের উপরে উঠে আবার সিঁড়ি দিযে নেমে নীচে আনাগোনা করতে পারে। অনুলোম, বিলোম। সাততলা বাড়ি, কেউ বার বাড়ি পর্যন্ত যেতে পারে। রাজার ছেলে আপনার বাড়ি সাত তলায যাওযা আসা করতে পারে।'

এখানে সিঁড়ি হল অনুভব বা জ্ঞানের স্তর। সেই সাধারণ জ্ঞানের স্তর উত্তীর্ণ হতে হতে তাঁদের ব্রহ্মজ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণ ঘটে। আবার সাধারণের মঙ্গলের জন্যে নেমে আসতে পারেন অজ্ঞানের জগতে।

ঈশ্বরকোটি হলেন অবতার বা অবতার-কল্প মানব। তিনি স্বয়ং উদ্ধার লাভ করে অপরকেও উদ্ধার করতে পারেন। অবতাররা সমাধিস্থ অবস্থায় দীর্ঘকাল থাকেন না, তাঁরা নেমে আসেন বাহ্যজগতে। সকলের মধ্যে অবস্থান করেন। কারণ লোক কল্যাণের জন্যে তাঁদের আবির্ভাব। তাঁরা সিঁড়ি দিয়ে সর্বোচ্চ তলে বা ছাদে আরোহণ করতে সক্ষম। আবার সিঁড়ি পথেই অবরোহণ করেন এক তলে। শ্রীঠাকুর অনুলোম ও বিলোমের—ক্রমিক উন্নয়ন ও বিপরীত ভাবের তুলনা দিলেন ছাদে ওঠা নামার সঙ্গে। এই ধরণের প্রকাশ-ভঙ্গিমা তাঁর নিজস্ব। অতি সহজ ভাষায় ও বিষয়ে অতিশয় গূঢ় তত্ত্বের পরিচয় দান। তার আরো ব্যাখ্যা বা টীকা নিষ্প্রয়োজন। উপলব্ধিবান পুরুষ আরো ছিলেন। কিন্তু সাধারণের বোধার্থে এমন প্রসঙ্গ করেননি তাঁরা। আর যদি কেউ ব্যক্ত করে থাকেন তার বিবরণ অপ্রাপ্য।

শুধু অধ্যাত্ম প্রসঙ্গে নয়, সর্বপ্রকার বিষযে কথোপকথনেই তিনি চিত্তাকর্ষক আন্তরিকতার সুরে নিষিক্ত তাঁর বাণী। আবার কত নব নব ভাবের দ্যোতনায শ্রোতাদের চমকিত করে দেওয়া বাক্যরীতি। কত রকমের কৌতূহল-উদ্দীপক। কি বৈচিত্র্যময় তাঁর বাকপটুত্ব। স্বতন্ত্র দীপ্তিতে ঝলকিত।

সেদিন পণ্ডিত শশধরের সঙ্গে শ্রীঠাকুরের প্রথম আলাপ পরিচয় হয়েছে। তিনি আনন্দ পেয়েছেন তর্কচূড়ামণির সঙ্গলাভ করে।

সেই হর্ষ ভাব প্রকাশ করতে তিনি সহাস্যে বললেন, 'আজ আমার খুব দিন। আমি দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখলাম।'

কথা শুনে সকলেই হাসলেন। কারণ তিনি হাসতে হাসতে বলায় এটি কৌতুক উক্তি রূপেই নেন সকলে। কিন্তু 'দ্বিতীয়ার চাঁদ' বাক্যটির তাৎপর্য কি জানা ছিল তাঁর শ্রোতাদের? সম্ভবত, নয়। কারণ এ ধরণের বাগ্‌-বিন্যাস প্রায় অশ্রুত অপ্রচলিত।

তিনিও হয়ত বুঝেছিলেন যে শ্রোতাদের বোধগম্য হয়নি ও-কথার অর্থ। তাই ভাষ্য করতে বললেন, 'দ্বিতীয়ার চাঁদ কেন বললুম জান? সীতা

রাবণকে বলেছিলেন, রাবণ পূর্ণচন্দ্র, আর রামচন্দ্র আমার দ্বিতীয়ার চাঁদ। রাবণ মানে বুঝতে পারে নাই, তাই ভারী খুশি। সীতার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, রাবণের সম্পদ যতদূর হবার হয়েছে, এইবার দিন দিন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় হ্রাস পাবে। রামচন্দ্র দ্বিতীয়ার চাঁদ, তাঁর দিন দিন বৃদ্ধি হবে!'

অর্থাৎ রাবণ ক্ষয়িষ্ণু। শ্রীরাম বর্ধিষ্ণু।

পণ্ডিত শশধরকেও বর্ধনশীল অভিহিত করে শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তোষ জানালেন।

তাঁর এই বাক্যালঙ্কার থেকে একটি বিষয় লক্ষণীয়। রামায়ণ এবং নানা পুরাণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল অন্তরঙ্গ। রামায়ণের প্রধান প্রধান চরিত্র ও ঘটনাবলী তাঁর নখদর্পণে। তেমনি যে সমস্ত গল্প তিনি মুখে মুখে বিবৃত করতেন বক্তব্য বিষয়ের উদাহরণস্বরূপ তাও বিভিন্ন পুরানের কাহিনী। এই মহাকাব্য এবং পুরাণ গ্রন্থাবলীও তিনি তো পাঠ করেননি। তবু এমন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সেসব অধিগত ছিল মাত্র শ্রুতির ফলে, তাঁর অলৌকিকী স্মরণশক্তির প্রসাদে। শুধু শ্রবণ করেই যেমন তাঁর কণ্ঠস্থ ও গায়নক্ষম হয়ে থাকে শ দুয়েক গান, তেমনি পুরাণাদির সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচিতি ঘটে কথকতা, যাত্রাপালা, সাধুসঙ্গ প্রভৃতির মাধ্যমে।, উপনিষদ বেদান্ত দর্শনাদি পাঠ না করলেও সেসব শাস্ত্রের সার তিনি নানা দিনের ভাষণেই বুঝিয়ে বলেছেন। তেমনি মহাকাব্য ও বহু পৌরাণিক কাহিনী, তাদের অংশ-বিশেষ, বিভিন্ন চরিত্র-মাহাত্ম্য তিনি বিবৃত করেছেন আপনার কোন বক্তব্যের সমর্থনে অথবা ব্যাখ্যাস্বরূপ। ভারতীয় সনাতন ধর্মের শাস্ত্র- পুরাণ, মহাকাব্যের ঐতিহ্য, ও ঐশ্বর্য শ্রীরামকৃষ্ণের মনোলোকে দেদীপ্যমান।

'পিঁপড়ের মত সংসারে থাকো।' চিনির সঙ্গে মেশানো থাকে বালি। পিঁপড়ে কিন্তু চিনি ঠিক বেছে নেয় আর বালি ফেলে দেয়। সেইরকম সার ও অসার, বস্তু ও অবস্তু, নিত্য ও অনিত্য মিশে থাকে সংসারে।

শ্রীঠাকুর বলছেন, তার মধ্যে থেকে গ্রহণ করতে হবে নিত্য বা সার বা সৎ বস্তুকে। অসার অনিত্যকে বর্জন করতে হবে। তিনি বলছেন বিবেকবান হতে। সংসারে 'গোলমালের মধ্যে মাল আছে।' এও তাঁরই কথা। জগতের বাসনা কামনা রূপ হট্টগোল থেকে গ্রহণ করতে হবে মাল বা সার বা শাঁসটি।

সংসারী মানুষদের জন্যে হিতকথা তিনি নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। বাস্তব নির্দেশ দিয়েছেন বিচক্ষণভাবে, গভীর সহানুভূতিতে। কি চমৎকার তাঁর সেইসব ব্যবহারিক উপদেশ।

'পাঁকাল মাছের মত সংসারে থাকবে।' পাঁকাল মাছ থাকে পুকুরের পাঁকে। কিন্তু তার গায়ে পাঁক লাগে না, সে ঝেড়ে ফেলে দেয়। তেমনি ভাবে মনকে নির্মল রাখতে হবে সংসারের মালিন্যের মধ্যে বাস করেও। জ্ঞানলাভ করে সংসার করলে আসক্তি থাকে না। কর্মও মানবকে তখন বিচলিত, অভিভূত করতে পারে না। সংসারীকে তাই তিনি হতে বলেন বিবেকবান। অর্থাৎ নিত্য ও অনিত্য সম্পর্কে জ্ঞানবান। অসার বর্জন ও সার গ্রহণকারী।

'গায়ে হলুদ মেখে জলে নামলে কুমীরের ভয় থাকে না।' এই ব্যবস্থা তিনি দিয়েছেন সংসারীদের। কুমীর হল কামাদির প্রতীক। সংসারে কাম, অর্থের প্রলোভন জয় করতে অন্তরে হলুদরূপ বিবেক বৈরাগ্য রাখা প্রয়োজন। তাহলে আর কামিনী কাঞ্চনের দাস থাকতে হয় না।

'কামিনী কাঞ্চনই সংসার—ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়।' তাই তিনি বলেন, '(ঈশ্বরকে) ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, বিবেকের জন্য প্রার্থনা কর। ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য—এরই নাম বিবেক! জল ছাঁকা দিয়ে জল ছেঁকে নিতে হয়। ময়লাটা একদিকে পড়ে—ভাল জল একদিকে পড়ে, বিবেকরূপ জল ছাঁকা আরোপ কর। তোমরা তাঁকে জেনে সংসার কর। এরই নাম বিদ্যার সংসার। দেখ না মেয়েমানুষের কি মোহিনী শক্তি, অবিদ্যারূপিনী মেয়েদের! পুরুষগুলোকে যেন বোকা অপদার্থ করে রেখে দেয়।'

তবে সংসার তো ঈশ্বরের সৃষ্টির বাইরে নয়। তাই তিনি বলছেন, বাস্তব অবস্থাকে মেনে নিয়ে ভগবানে আত্মসমর্পণ করতে। তাঁর ওপরে একান্ত নির্ভর করতে। সবই তাঁর ইচ্ছা। তিনিই একমাত্র কর্তা
তাই শ্রীঠাকুর বলেছেন, 'সংসার থাকো ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে। ঝড়ের এঁটো পাতাকে কখনো ঘরের ভিতর লয়ে যায়, কখনও আঁস্তা-কুড়ে। হাওয়া যেদিকে যায়, পাতাও সেইদিকে যায়। কখনও ভাল জায়গায়, কখনও মন্দ জায়গায়। তোমাকে এখন সংসার ফেলেছেন, ভাল, এখন সেই স্থানেই থাকো—আবার যখন সেখান থেকে তুলে ওর চেয়ে ভাল জায়গায় লয়ে ফেলবেন, তখন যা হয় হবে।
সংসারে রেখেছেন তা কি করবে? সমস্ত তাকে সমর্পণ করো—তাকে আত্মসমর্পণ করো। তখন দেখবে তিনিই সব করছেন।'
এ তো চূড়ান্ত শরণাগতির কথা। কিন্তু পরম বাস্তববাদীর মতনও তিনি সংসারীদের কথা ভেবেছেন। সকলকে পথনির্দেশ করেছেন বাস্তব দিক থেকে। সংসার ত্যাগ করে গেলে দৈনন্দিন প্রধান প্রয়োজন অর্থাৎ আহারের ব্যবস্থা কি হবে। দুবেলা উদরপূর্তির জন্যে হয়রানির এক-শেষ হতে পারে। সারাদিন ওই ধান্দায় যাবে। পরমার্থ চিন্তার অব-কাশ ও পরিবেশই মিলবে না হয়ত। তাই বাড়িকেই দুর্গ করতে এবং এই দুর্গ থেকেই সংগ্রামে নামতে বলেছেন তিনি প্রখর বাস্তব বুদ্ধিতে।
'সংসারে কাম, ক্রোধ এই সবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, নানা বাসনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, আসক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। যুদ্ধ কেল্লা থেকে হলেই সুবিধা। গৃহ থেকে যুদ্ধই ভাল, খাওয়া মেলে—ধর্মপত্নী অনেক রকম সাহায্য করে। কলিতে অন্নগত প্রাণ—অন্নের জন্য সাত জায়গায় ঘুরার চেয়ে এক জায়গাই ভাল। গৃহ কেল্লার ভিতরে থেকে যেন যুদ্ধ করা।'
যিনি স্বয়ং ত্যাগ ও বৈরাগ্যের জীবন্ত বিগ্রহ, তিনিই সংসারে থাকতে বলছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। অন্তরে বিরাগী হবার জন্যে এক বাস্তব পন্থা দেখাচ্ছেন। কি ব্যবহারিক এবং কার্যকর উপায়। যেমন ভাষায়

তেমনি বক্তব্য বিষয়ে শুধু বিশিষ্ট নয়, অনন্য তাঁর এই ধরনের উক্তি। সংসারে অনাসক্ত হয়ে থাকা ও কর্ম করারই এক প্রকার ভেদ এই গৃহের মধ্যে থেকেই কাম-কাঞ্চনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সুবিধাজনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার কৌশল।

'অনাসক্ত হয়ে সংসারে থেকে আন্তরিক চাইলে তাঁকে (ঈশ্বরকে) পাওয়া যায়।' এমনি কত সহজভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারীদের জন্যে বলেছেন—'সংসারে থাকা—যেন বড় মানুষের বাড়ির ঝি। (ঝি) সব কাজ করে, ছেলে মানুষ করে, বাবুর ছেলেকে বলে 'আমার হরি', কিন্তু মনে মনে বেশ জানে—এ বাড়ি আমার নয়, এ ছেলেও আমার নয়। সে সব কাজ করে, কিন্তু তার মন দেশে পড়ে থাকে। তেমনি সংসারে সব কর্ম করো, কিন্তু ঈশ্বরের দিকে মন রাখো। আর জেনো যে, গৃহ, পরিবার, পুত্র—এসব আমার নয়, এসব তাঁর (ঈশ্বরের), আমি কেবল তাঁর (ঈশ্বরের) দাস।' এমন সব বাণীর আর ভাষ্য নিষ্প্রয়োজন। আলোকের তুল্য সুপ্রকাশ তাঁর বক্তব্য।

আবার গৃহস্থদের প্রতি কি দরদী তিনি। পরম কারুণিক। সংসারী মানুষরা মায়ায় বদ্ধ হয়ে আছে, দৈনন্দিন সুখ দুঃখ নিয়েই আসক্ত তারা—সেজন্যে তাদের প্রতি কোনো বিরূপতা পোষণ করেন না। বরং তাদের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি। সংসারের নানা কষ্ট দুর্ভোগের মধ্যে থেকেও যদি তারা ক্ষণেকের জন্যে ঈশ্বরের শরণাগত হয় তারও গুরুত্ব দেন তিনি।

তাই তো একদিন নারদের সেই গল্পটি শুনিয়েছিলেন। দেবর্ষি অতি বড় ভক্ত। ভগবান বিষ্ণুর প্রতি তাঁর অহেতুকী ভক্তি, শুদ্ধ ভক্তি। সর্বক্ষণ নারদের কণ্ঠে ঈশ্বরের গুণগান। এ বিষয়ে প্রচ্ছন্ন অহঙ্কারও ছিল তাঁর মনে—তাঁর তুল্য ভক্ত আর কে?

ভগবান অন্তর্যামী। তাই একদিন একটু শিক্ষা দিলেন নারদকে।

তাঁকে বললেন, 'আমার একজন বড় ভক্ত আছে। তুমি একবার তার

সঙ্গে আলাপ করে এস।'

শুনে দেবর্ষি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। অন্তরে আঘাতও লাগল—অন্য এক বড় ভক্ত? কৌতূহলী হয়ে জেনে নিলেন অপরিচিত ভক্তের নাম ধাম তার সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

হরি হরি! লোকটি সাধারণ চাষা তার সঙ্গে আলাপ করেও জানতে পারলেন, নিতান্তই এক সংসারী জীব সে। ভক্তির বালাই নেই। সে সকালে একবার মাত্র ভগবানের নাম করে মাঠে যাবার আগে। সারাদিন ক্ষেতের কাজ করে। আবার সংসারেও কাজ যথেষ্ট। সব সেরে রাতে শোবার আগে আরেকবার ভগবানের নাম নেয়।

দেখে শুনে নারদ ফিরলেন বেশ খুশী মতো। তারপর বিষ্ণুর কাছে এসে বললেন রহস্য করে—'আপনার বড় ভক্তকে দেখে এসেছি। সে মাত্র দুবার আপনার নাম করে দিন রাতের মধ্যে।'

বিষ্ণু মৃদু হাসলেন। তারপর একবাটি তেল নারদের হাতে দিয়ে বললেন, 'এই বাটি হাতে নিয়ে আমার প্রাসাদের চারদিকে একবার ঘুরে এস। কিন্তু সাবধান। এক ফোঁটা তেলও যেন মাটিতে না পড়ে।

দেবর্ষি সেইভাবে গেলেন প্রদক্ষিণ করতে। আর কোনরকমে তেল বাঁচিয়ে ফিরে এলেন।

ভগবান তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এর মধ্যে কতবার আমার নাম নিয়েছ?'

'একবারও পারিনি' বলতে নারদ বড়ই লজ্জিত হলেন। তবে কারণ স্বরূপও বললেন, 'কখন আপনার নাম নেব? সারাক্ষণ গেল তেলের বাটি সামলাতে।'

ভগবান হেসে বললেন, 'তাহলেই বোঝ ওই চাষীর অবস্থা। সে সমস্ত দিন মাঠের কাজ করে। আবার সংসারটাকেও মাথায় করে রাখে। তারই মধ্যে তবু সে দুবার আমার নাম নেয়। আর তুমি মাত্র এক বাটি তেলের জন্যে, এত বড় ভক্ত হয়েও আমার নাম একটিবার নিতে পারলে না। তাহলে ওই চাষাকে বড় ভক্ত বলব না?'

গল্পের এই চাষা হলো সংসারীর প্রতীক। অষ্ট প্রহরে সে দুবার মাত্র নাম করলেও ঈশ্বর তুষ্ট হন—পরিতোষের সঙ্গে জানিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।
ভগবান্ ভক্তির মাহাত্ম্য, যতভাবে সম্ভব তিনি প্রচার করেছেন। কত নির্দেশ উপদেশ দিয়েছেন কথায় কথায়; এবং এমনি সব অপরূপ গল্প কণিকার মাধ্যমে। অধ্যাত্ম তথা দার্শনিক প্রসঙ্গ বহুভাবেই করেছেন। তাঁর অনন্ত ভাব। সকলের উল্লেখ করা অসম্ভব একটি অধ্যায়ে কিংবা একটি গ্রন্থেও।

এবার আর কয়েকটি বাণী উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো তাঁর বিভিন্ন প্রসঙ্গ থেকে। কোনো পূর্ব-নির্দিষ্ট বক্তব্য অনুসরণে এই নির্বাচন নয়। বরং বলা চলে, আকীর্ণ রত্নরাজি থেকে যথেচ্ছ চয়ন। বাকপতির ভাষণ ঐশ্বর্য ও সৌকর্যের আরো কিছু নির্দশনস্বরূপ। যেমন অপরূপ, মহিমময় ভাব-রাশি তেমন উপযুক্ত ভাষার বাহন যা তাঁরই বিশিষ্ট ধরনে উৎসারিত। মহৎ কবি দার্শনিক তাত্ত্বিকের বাচনধারা। যেমন অতুলন বিষয়বস্তু তেমনি অশ্রুতপূর্ব প্রকাশরীতি। প্রগাঢ় নিগূঢ় কত তত্ত্ব কথা। কিন্তু ভাষ্যকারের অপেক্ষা রাখে না এমন স্বচ্ছ, স্বয়ং ভাস্বর। টীকা করতে গেলে, যেমন বাঘ অর্থ শার্দূল। শুধু পাঠ ও আবৃত্তি যোগেই সুবোধ্য, সার্থক।

একদিন যেমন বললেন মহিমাচরণকে, 'ওঁকারের ব্যাখ্যা তোমরা কেবল বলো 'অকার উকার মকার।' আমি উপমা দিই ঘণ্টার টং শব্দ। ট-অ-অ-অম্! লীলা থেকে নিত্যে লয়; স্থূল থেকে সূক্ষ্মে, কারণ থেকে মহা-কারণে লয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি থেকে তুরীয়ে লয়। আবার ঘণ্টা বাজলো যেন মহাসমুদ্রে একটা গুরু জিনিস পড়লো আর ঢেউ আরম্ভ হলো। নিত্য থেকে লীলা আরম্ভ হলো, মহাকারণ থেকে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীর দেখা দিলো—সেই তুরীয় থেকেই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি সব অবস্থা এসে পড়লো। আবার মহাসমুদ্রের ঢেউ মহাসমুদ্রেই লয় হলো। নিত্য ধরে ধরে লীলা, আবার লীলা ধরে ধরে নিত্য। আমি টং শব্দ উপমা দিই। আমি ঠিক এই সব দেখেছি। আমায় দেখিয়ে দিয়েছে,

চিৎসমুদ্র, অন্ত নাই। তাই থেকে এই সব লীলা উঠলো, আর এতেই লয় হয়ে গেল। চিদাকাশে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, আবার ঐতেই লয় হয়, তোমাদের বইয়ে কি আছে, আমি অত জানি না।'

মহাকবি মহাজ্ঞানীর উপলব্ধ সত্যের প্রকাশ। স্বামীজী ও গিরিশচন্দ্র কথিত 'বেদান্তের জীবন্ত বিগ্রহ' শ্রীরামকৃষ্ণ। আবার তিনি যত বড় জ্ঞানী তত বড় ভক্ত। তাই শুধু 'জগৎ স্বপ্নবৎ' দেখেন না, 'সব অবস্থা' নেন। নিত্য এবং লীলা। ব্রহ্ম এবং কালী। 'মায়া বলে জগৎ সংসার উড়িয়ে' দেন না তিনি। একাধারে মায়াবাদী এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। 'না হলে যে ওজনে কম পড়ে।' জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের চরম সমাহার ঠাকুর। দৃষ্টান্তে।

আরেকদিন বিশ্বনাথ উপাধ্যায় বা 'কাপ্তেন'কে বোঝাচ্ছেন—পূর্ণ অবতারের কথা। তাঁর আটপৌরে ভাষায়—'চৌদ্দ পোয়ার ভিতর অনন্ত আসা।' এটি ধারণা করা কঠিন পুঁথিপড়া বিদ্বানের পক্ষে, অর্থাৎ যাঁর সাধন ভজন নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—'পূর্ণ ও অংশ,—যেমন অগ্নি ও তার ফুলিঙ্গ। অবতার ভক্তের জন্য ;—জননীর জন্য নয়। অধ্যাত্ম রামায়ণে আছে—হে রাম। তুমিই ব্যাপ্য, তুমিই ব্যাপক, 'বাচ্য বাচকভেদেন ত্বমেব পরমেশ্বর।'

কাপ্তেন বললেন—'বাচ্য বাচক' অর্থাৎ ব্যাপ্ত ব্যাপক।'

ঠাকুর আরো বুঝিয়ে দিলেন 'ব্যাপক অর্থাৎ যেমন ছোট একটি রূপ, যেমন অবতার মানুষ রূপ হয়েছেন।'

রীতিমত পণ্ডিতের তুল্য প্রাঞ্জল করে দিলেন। আরো এক লক্ষণীয়। অধ্যাত্ম রামায়ণের কথায় একটি সংস্কৃত বাক্যও যে উচ্চারিত হয়ে উঠলো তাঁর কণ্ঠে ? বাগ্‌বাদিনী রাশ ঠেলে দিলেন কি ?

নিজের সম্বন্ধে ঠাকুর একবার বলেছিলেন, 'আমি সংস্কৃত বুঝতে পারি। কিন্তু বলতে পারি না।' তাও তো বলতে দেখা গেল এখানে।

একদিন শ্রীম. জানতে চেয়েছিলেন, 'ঈশ্বরকে দর্শন কি এই চক্ষে হয় ?'

তারই উত্তরে, কথায় কথায় কত পরমাশ্চর্য প্রজ্ঞার বাণী ঝর্ণাধারায় নির্গলিত হতে লাগল।

"তাঁকে চর্মচক্ষে দেখা যায় না। সাধনা করতে করতে একটি প্রেমের শরীর হয়। তার প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ম। সেই চক্ষে তাঁকে দেখে, সেই কর্ণে তাঁর বাণী শুনা যায়।···

ঈশ্বরের প্রতি খুব ভালবাসা না এলে হয় না। খুব ভালবাসা হলে তবেই চারিদিকে ঈশ্বরময় দেখা যায়।···

তাঁকে রাতদিন চিন্তা করলে তাঁকে চারিদিকে দেখা যায়'—যেমন প্রদীপের শিখার দিকে যদি এক দৃষ্টে চেয়ে থাক, তবে খানিকক্ষণ পরে চারিদিক শিখাময় দেখা যায়।'

শুনে, শ্রীম.-র মনে খট্‌কা লাগল। তিনি ভাবলেন—সে শিখা তো সত্যকার শিখা নয়।

অন্তর্যামী শ্রীরামকৃষ্ণ জানালেন—'চৈতন্যকে চিন্তা করলে অচৈতন্য হয় না।'

শ্রীম. বললেন—'আজ্ঞা বুঝেছি। এ তো অনিত্য কোন বিষয় চিন্তা করা নয়? যিনি নিত্য চৈতন্যস্বরূপ তাঁতে মন লাগিয়ে দিলে মানুষ কেন অচৈতন্য হবে?'

প্রসন্ন হয়ে ঠাকুর বললেন, 'এইটি তাঁর কৃপা,-তাঁর কৃপা না হলে সন্দেহ ভঞ্জন হয় না। তাঁর কৃপা হলে আর ভয় নাই। ··তিনি কৃপা করে যদি সন্দেহ ভঞ্জন করেন আর দেখা দেন আর কষ্ট নাই।—তবে তাঁকে পাবার জন্য খুব আকুল হয়ে ডাকতে ডাকতে—সাধনা করতে করতে তবে কৃপা হয়। ছেলে অনেক দৌড়াদৌড়ি করছে দেখে মা'র দয়া হয়। মা লুকিয়ে ছিল, এসে দেখা দেয়।'

আবার শ্রীম.-র মনে চিন্তা জাগল—তিনি দৌড়াদৌড়ি কেন করান?

অমনি শ্রীরামকৃষ্ণ জানালেন—'তাঁর ইচ্ছা যে খানিক দৌড়াদৌড়ি হয়, তবে আমোদ হয়। তিনি লীলায় এ সংসার রচনা করেছেন। এরি নাম মহামায়া। তাই সেই শক্তিরূপিনী মার শরণাগত হতে হয়। মায়াপাশে

বেঁধে রেখেছে, এই পাশ ছেদন করতে পারলে তবেই ঈশ্বর দর্শন হতে পারে।'

ঈশ্বর-জানিত পুরুষ বলতে লাগলেন—'তাঁর কৃপা পেতে গেলে তো তাঁকে প্রসন্ন করতে হয়। তিনি মহামায়া। জগৎকে মুগ্ধ করে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন। তিনি অজ্ঞান করে রেখে দিয়েছেন। সেই মহামায়া দ্বার ছেড়ে দিলে তার অন্দরে যাওয়া যায়। বাহিরে পড়ে থাকলে বাহিরের জিনিস কেবল দেখা যায়।—সেই নিত্য সচ্চিদানন্দ পুরুষকে জানতে পারা যায় না। '

শক্তিই জগতের মূলাধার। সেই আদ্যাশক্তির ভিতরে বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই আছে—অবিদ্যা—মুগ্ধ করে। অবিদ্যা—যা থেকে কামিনী কাঞ্চন মুগ্ধ করে। কিম্বা—যা থেকে ভক্তি দয়া প্রেম—ঈশ্বরের পথে লয়ে যায়।

ঈশ্বর লাভ করলে তাঁর বাহিরের ঐশ্বর্য, তাঁর জগতের ঐশ্বর্য ভুল হয়ে যায়, তাঁকে দেখলে তাঁর ঐশ্বর্য আর মনে থাকে না। ঈশ্বরের আনন্দে মগ্ন হয়ে ভক্তের আর হিসাব থাকে না। · '

বক্ষ্যমান পরিচ্ছেদের উপসংহারে শ্রীরামকৃষ্ণের আর দুটি প্রসঙ্গ স্মরণ করা হবে। একটি হলো, হিন্দুধর্মের সনাতনত্ব। অপরটি তারই স্বরূপ সম্পর্কে। দু প্রসঙ্গেই তিনি বলেছেন একাধিক দিনের কথোপকথনে সবই শ্রীম-র বিবরণীতে প্রকাশিত কথামৃত' দ্বিতীয় ও পঞ্চম খণ্ড থেকে এখানে একত্র গ্রথিত করে দেওয়া হলো।

ভগবান দাস নামে এক ব্রাহ্মভক্ত সেদিন (৮ মার্চ, ১৮৮৪) এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। তাকে উদ্দেশ করেই শ্রীঠাকুর বললেন, 'ঋষিদের ধর্ম সনাতন ধর্ম। অনন্তকাল আছে ও থাকবে। এই সনাতন ধর্মের ভিতর নিরাকার সাকার সব রকম পূজা আছে, জ্ঞানপথ ভক্তিপথ সব আছে। অন্যান্য যে সব ধর্ম আধুনিক কিছুদিন থাকবে আবার যাবে।'

এখানে তাঁর বক্তব্যের দুটি অংশ লক্ষণীয়। প্রথম কথা হলো, ঋষিদের

ধর্ম অর্থাৎ যা হিন্দু ধর্ম নামে প্রচলিত, তা চিরকালীন। অতীতে যেমন তা ছিল এবং বর্তমানে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। এই 'সনাতন ধর্ম' লোপ পাবার নয়। কারণ তা চিরন্তন সত্যে প্রতিষ্ঠিত। আর অন্যান্য ধর্ম অর্বাচীন। স্বল্পকাল স্থায়ী তারা। কিছুদিন পরেই তাদের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যায়। এখানে অন্যতম 'আধুনিক ধর্ম' বলতে তিনি সম্ভবত ব্রাহ্ম ধর্মকেই উদ্দিষ্ট করেছেন। কারণ কথাগুলি বলেন ব্রাহ্মভক্ত ভগবান দাসকে লক্ষ্য করে। আর সরলতার প্রতীক-স্বরূপ তাঁর যা স্বভাব, সব মন্তব্যই সাক্ষাতে করে দিতেন। ব্রাহ্ম ধর্ম যে সাময়িক, তার অস্তিত্ব যে স্বল্পকালীন তা ধরা পড়েছিল তাঁর স্বচ্ছ সত্য দৃষ্টিতে।

তার দ্বিতীয় কথা হলো—এই সনাতন ধর্মে সকল প্রকার যোগ বা পন্থা বর্তমান। সনাতন ধর্মের সেবকদের অবলম্বন করবার জন্যে আছে জ্ঞান-যোগ ও ভক্তিযোগ। যার যেমন প্রবণতা সেই অনুসারে উপাসনার পথ উন্মুক্ত হিন্দুধর্মে। নিরাকার সাধন কিংবা যে-কোনো ভাবের সাকার পূজা অনুষ্ঠানের সুযোগ এই উদার পরমত সহিষ্ণু সনাতন ধর্মে।

আরো একদিন (১০ অক্টোবর, ১৮৮৪) এমনি স্পষ্টভাবে বলেন—'হিন্দুধর্মই সনাতন ধর্ম। ইদানীং যে সকল ধর্ম দেখছো এসব তাঁরই ইচ্ছাতে হবে যাবে—থাকবে না। তাই আমি বলি, ইদানীং যে সকল ভক্ত, তাদেরও চরণেভ্যো নমঃ। হিন্দুধর্ম বরাবর আছে আর বরাবর থাকবে।'

অন্যান্য ধর্ম ক্ষণজীবী জেনেও তাদের অনুসরণকারীদের কাছে তিনি নত জানাচ্ছেন আপন উদার স্বভাবে। কারণ সাময়িক হলেও সব ধর্মই. অন্যান্য সমস্ত কিছুর মতন, ঈশ্বরের ইচ্ছায় সৃষ্ট। ঈশ্বরের প্রকৃত অনু-গত তাই সকল ধর্মের প্রতি বিনত—যদিও এসত্য তাঁর নিকটে উদ্-ভাসিত যে একমাত্র হিন্দুধর্মই সনাতন। তা বরাবর আছে আর বরাবর থাকবে—' তাঁর এই মহাবাণী মিথ্যা হবার নয়। অসত্য হয় নি তাঁর কোনো বাক্য। অন্যান্য ধর্ম 'হবে, যাবে—' তা শুধু উনিশ শতকীয় কোনো আন্দোলন সম্পর্কেই প্রযোজ্য কি? দেড় দু হাজার বছরের

'ধর্ম'গুলিকেও 'ইদানীং' কালের বলা যায় না কি সনাতন ধর্মের নিরিখে ? ভারতবর্ষের যে বিশ্বজনীন ধর্মপ্রেরণায় ঋক্ মন্ত্রমালা উদ্বোধিত হয়ে ছিল দশ হাজার বছর আগে (আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির জ্যোতির্বিদ্যা ভিত্তিক গবেষণা অনুসারে) ?

হিন্দুধর্ম বা ভারতধর্ম বা সনাতন ধর্ম সম্পর্কে শ্রীঠাকুরের এই মন্তব্য পরম গৌরবের তথা প্রত্যয়ের বিষয় ভারতীয়দের পক্ষে। তাঁরই 'যত মত তত পথ' এই উদার বাণীর অনেক সময় অপব্যাখ্যা করা হয়। পরমত অসহিষ্ণু, ভিন্ন সাম্প্রদায়িকরা হিন্দুধর্মের মূল্যায়নে অসমর্থ হন বিনয় নম্রতাকে ভুল বুঝে। ভারত-ধর্মকে আর পাঁচটা ধর্মের সঙ্গে গতানুগতিক ধরা হয়ে থাকে হিন্দুদের উদারতার অহেতুক খেসারৎ দিতে হয়—মুড়ি মিছরির একদর যেন ! তাই এমন সুস্পষ্ট ভাষণের প্রয়োজন ছিল প্রকৃত অবস্থা নিরূপণে।

এক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের দূরদর্শন ও সত্যদর্শন ত্রিকালজ্ঞ ঋষির তুল্য। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি শুধু তাত্ত্বিক বা দার্শনিক নন, অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার ব্যাখ্যাকার ভাষ্যকার নন—বিচক্ষণ ঐতিহাসিক দ্রষ্টা। তাঁর পূর্ণজ্ঞানে সব ধর্ম সম্প্রদায়ের ইতিহাসও অধিগত। সর্ব ধর্মবিশ্বাসের নিরপেক্ষ দর্শক, প্রাজ্ঞ মান-নিরূপক তিনি। হিন্দুধর্মের বিশ্বজনীনত্ব তথা সনাতনত্ব তাঁর দিব্য চক্ষে প্রতিভাত।

বর্তমান পরিচ্ছেদের শেষ আলোচ্য প্রসঙ্গ শ্রীঠাকুর স্বয়ং। কি তাঁর স্বরূপ বা তিনি কে ? এই জিজ্ঞাসা অনেক ভক্তের চিত্তে জেগেছিল, তাঁর পরিণত বয়সে, কলকাতায় বাসকালে।

সে প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের নিজেরও গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি লিপিবদ্ধ আছে। তা উৎকলিত করবার আগে তাঁর জন্মকাহিনীও স্মরণযোগ্য। পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের গয়াধামে বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান, সেই নারায়ণ তীর্থ সম্পর্কিত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রভৃতি বিবরণ দিক্ দর্শনী স্বরূপ। সেই সূত্রে বিশ্বাস করা যায়—গদাধর বা শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন বিষ্ণু

ভগবানের অবতার পুরুষ। ঈশ্বর অবতীর্ণ। কামারপুকুরে ক্ষুদিরাম পুত্র গদাধরের বেশে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারীর মানবজন্মে অবতরণ।

তাঁর উত্তর জীবনের ভক্তবৃন্দ কি সে স্বপ্ন-বাণী তথা জন্মবৃত্তান্ত শুনেছিলেন? বোধহয়, না। কারণ সেকালে সে বিবরণাদি বিশেষ প্রচারিত ও প্রকাশিত হয় নি। তাঁরা শ্রীঠাকুর সম্পর্কে ধারণা করেছিলেন তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় থেকে।

তিনি দেহী থাকা কালেই কোনো কোনো বিদগ্ধ জনের বিশ্বাস জন্মায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। বিশেষ নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানী রামচন্দ্র দত্তের এই প্রত্যয় সুদৃঢ় ছিল।

অবশ্য সেই দুজন সম্পর্কেই তিনি তামাসা করে বলতেন, 'হ্যাঁ, ঈশ্বর চিনেছে বটে দুজন। একজন হলেন থিয়েটারের নোটো আর একজন হাসপাতালের মড়াকাটা ডাক্তার।'

কিন্তু তাঁদের মত পরিবর্তন হয় নি। শুধু তাই নয়। সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত পদ্মলোচন তর্কালঙ্কার, অধ্যাপক ও ঘনিষ্ঠ সেবক মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম.) প্রমুখ কারো কারো উক্তি থেকে বোঝা যায়, তাঁদের মনেও অনুরূপ ধারণার উদয় হতো শ্রীঠাকুরের স্বরূপ সম্পর্কে।

কিন্তু ভক্তদের মতামত এখানে আলোচনীয় নয়। তিনি স্বয়ং এ বিষয়ে কথা বলেছেন নানা দিনে, নানা ভাবে। 'কথামৃত' থেকে যে কদিনের বিবরণ পাওয়া যায় তা উদ্ধৃত করা হলো এখানে। বাকপতির কিছু চির-স্মরণীয় আত্মকথন।

সেদিন দক্ষিণেশ্বরে ৭ মার্চ, ১৮৮৫ সালের কথা। তাঁর কক্ষে রয়েছেন বাবুরাম, শ্রীম., ছোট নরেন, পল্টু, হরিপদ প্রভৃতি ভক্তেরা। কেউ পদ সেবা করছেন।

'হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ গম্ভীর হইলেন, যেন কি গুহ্য কথা বলিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)—এখানে অপর কেহ লোক নাই। সেদিন—হরিশ কাছে ছিল—দেখলাম—খোলটি (দেহটি) ছেড়ে সচ্চিদা-

নন্দ বাহিরে এল, এসে বললে, আমি যুগে যুগে অবতার। তখন ভাবলাম, বুঝি মনের খেয়ালে ঐ সব কথা বলছি। তারপর চুপ করে থেকে দেখলাম—তখন দেখি আপনি বলছে, শক্তির আরাধনা চৈতন্যও করেছিল।

ভক্তেরা সকলে অবাক হইয়া শুনিতেছেন। কেহ কেহ ভাবিতেছেন,—সচ্চিদানন্দ ভগবান কি শ্রীরামকৃষ্ণের রূপ ধারণ করিয়া আমাদের কাছে বসিয়া আছেন ? ভগবান কি আবার অবতীর্ণ হইয়াছেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ কথা কহিতেছেন। মাস্টারকে সম্বোধন করিয়া আবার বলিতেছেন,—'দেখলাম, পূর্ণ আবির্ভাব। তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য।' (কথামৃত তৃতীয় ভাগ, ১২।৩)।

আরেক দিনের কথা। বলরাম মন্দিরে, ওই বছরেরই ২৮জুলাই। শ্রীম. তাঁকে মার্থা ও মেরীর গল্প বলছিলেন যীশুখ্রীস্ট প্রসঙ্গে।

শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা তোমার এসব দেখে কি বোধহয় ?

মণি (শ্রীম.) বললেন—'আমার বোধহয়, তিনজনেই এক বস্তু ! যীশুখ্রীস্ট, চৈতন্যদেব আর আপনি—এক ব্যক্তি !'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলে উঠলেন—'এক এক ! এক বই কি। তিনি (ঈশ্বর),—দেখছ না,—যেন এর উপর এমন করে রয়েছে।'

এই বলিয়া ঠাকুর নিজের শরীরের উপর অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন—যেন বলছেন, ঈশ্বর তাঁরই শরীর ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েই রয়েছেন।' (কথামৃত, তৃতীয় ভাগ, ১৯।৩)

আবার একদিন নিজের সম্বন্ধে কি তাৎপর্য পূর্ণ ইঙ্গিত করেছিলেন—'এবার ছদ্মবেশে রাজার রাজ্য পরিভ্রমণ করা।

যেমন সুগভীর অর্থবহ তেমনি তাঁর বাক সৌকর্যের অনিন্দ্য নিদর্শন এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটি।

অবশেষে একদিন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছিলেন। উত্তর সাধক নরেন্দ্রনাথের নিকটেই। দেহ ত্যাগের অল্পদিন আগে, কাশীপুর

বাড়িতে।

শ্রীম সেই প্রসঙ্গের পূর্বাপর এইভাবে বিবৃত করেছেন—

'কিছুদিন পরে নরেন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুরের অবতার বিষয়ের কথা হইল। ঠাকুর বলিতেছেন,—'আচ্ছা, কেউ কেউ যে আমাকে ঈশ্বরের অবতার বলে, তোর কি বোধহয়?'

নরেন্দ্র বললেন, 'অন্যের কথা শুনে আমি কিছু বল্‌ব না, আমি নিজে যখন বুঝব, নিজের যখন বিশ্বাস হবে তখনই বল্‌ব।'

নরেন্দ্রকে তিনি কি পরীক্ষা করছিলেন? তাই এমনভাবে প্রকাশ হন কয়েকদিন পরেই—

'কাশীপুর উদ্যানে ঠাকুর যখন ক্যানসার রোগে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছেন, ভাতের তরল মণ্ড পর্যন্ত গলাধঃকরণ হইতেছে না, তখন একদিন নরেন্দ্র ঠাকুরের নিকট বসিয়া ভাবিতেছেন, এই যন্ত্রণার মধ্যে যদি একবার বলেন যে, আমি সেই ঈশ্বরের অবতার তা হলে বিশ্বাস হয়। চকিতের মধ্যে ঠাকুর বলিতেছেন,—'যে রাম, যে কৃষ্ণ, ইদানীং সে-ই রামকৃষ্ণরূপে ভক্তের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।'

নরেন্দ্র এইকথা শুনিয়া অবাক হইয়া রহিলেন।

ঠাকুর স্বধামে গমন করিলে পর নরেন্দ্র সন্ন্যাসী হইয়া অনেক সাধন ভজন তপস্যা করিলেন। তখন তাঁহার হৃদয় মধ্যে অবতার সম্বন্ধে ঠাকুরের মহাবাক্য সকল আরো প্রস্ফুটিত হইল। তিনি স্বদেশে বিদেশে এই তত্ত্ব আরও পরিষ্কারভাবে বুঝাইতে লাগিলেন।' (কথামৃত, পঞ্চম ভাগ, পরিশিষ্ট, দশম পরিচ্ছেদ)।

শ্রীমও শ্রীরামকৃষ্ণের অবতার ভূমিকা সম্পর্কে পরে নিশ্চিত হয়েছিলেন এবং পরিণত বয়সে সমাগত সকলের নিকটে প্রচার করে গেছেন পরম প্রত্যয়ে।

জ্ঞানকল্পতরু—প্রশ্নোত্তরে

দেহীরূপের অন্তিম পর্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন কল্পতরু হয়েছিলেন। ভক্তদের অজস্রধারে কৃপা বিতরণ করেছিলেন পরম কারুণিক। কাশীপুর বাড়িতে, ১৮৮৬ সালের পয়লা জানুয়ারি। সেই ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণে বার্ষিক কল্পতরু দিবস শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডলে পালিত হয়ে থাকে। সেদিন তাঁর কৃপালাভে ধন্য হয়েছিলেন চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন গৃহীভক্ত ও অনুগামী। যাচিত বা অযাচিতভাবে প্রার্থীদের প্রার্থনা তিনি পূর্ণ করেছিলেন। কৃপাপ্রাপ্তদের সম্পর্কে প্রকাশ—'কাহারও সিদ্ধির নেশার মত একটা নেশা ও আনন্দ; কাহারও চক্ষু মুদ্রিত করিবামাত্র যে মূর্তির নিত্য ধ্যান করিতেন অথচ দর্শন পাইতেন না, ভিতরে সেই মূর্তির জাজ্বল্যমান দর্শন কাহারও ভিতরে একটা পদার্থ বা শক্তি যেন সড়সড় করিয়া উপরে উঠিতেছে এইরূপ বোধ ও আনন্দ এবং কাহারও ব পূর্বে যাহা কখনও দেখেন নাই এরূপ একটি জ্যোতির চক্ষু মুদ্রিত করিলেই দর্শন ও আনন্দানুভব হইয়াছিল।...একটা অসাধারণ দিব্য আনন্দে ভরপুর হইয়া যাইবার অনুভবটি সকলের সাধারণ প্রত্যক্ষ—একথাটি বেশ বুঝা গিয়াছিল।'

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ)।

কিন্তু সেই অহেতুক কৃপাদান করার ফলে উক্ত ভক্তদের সব দুষ্কৃতির ভারও বহন করেন তিনি। কারণ তার পরেই আপন কক্ষে এসে বলেন, 'শালাদের পাপ নিয়ে আমার অঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। গঙ্গাজল নিয়ে আয়, গায়ে মাখি।' (রামলাল চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা)। অক্ষয়কুমার সেনও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি'তে বিবৃত করেছেন—'গঙ্গাজলে অঙ্গখানি করিলে মোক্ষণ। তবে না হইল পরে জ্বালা নিবারণ।' কিন্তু মানব

মঙ্গলের জন্যে যাঁর অবতরণ সেই জ্বালাযন্ত্রণাও তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করেছিলেন।

তাঁর সেই কল্পবৃক্ষ প্রসঙ্গ অবশ্য বর্ণনীয় নয় বর্তমান অধ্যায়ে। এখানে লক্ষ্য—তাঁর জ্ঞান কল্পতরু রূপের কিঞ্চিৎ সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ। বলা হয়, জ্ঞানকল্পতরু ভাবে তিনি নিত্য বিদ্যমান ছিলেন পরিণত বয়সে। কাল ব্যাধিতে রুদ্ধ কণ্ঠ হবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি সমাগত ব্যক্তিদের কাছে জ্ঞান বিতরণ করেছেন। দৈনন্দিন, অশ্রান্তভাবে, প্রত্যেক সন্ধিৎসুকে। দক্ষিণেশ্বরে, শ্যামপুকুরে কিংবা যে ভক্তগৃহে যখন তাঁর অধিষ্ঠান বা আগমন ঘটেছে, তাঁর দর্শনার্থী হয়ে এসেছেন নানা ভক্ত ও অভক্ত, বিদগ্ধ ও সাধারণ জন। বিভিন্ন বিচিত্র আধারের অসামান্য এবং সামান্য ব্যক্তি। তরা অনেকেই আসতেন জিজ্ঞাসু হয়ে। সেই সকলের সমস্যা ও সংশয়ের নিরসন করতেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

বর্তমান গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সেই সব আলোচনার কিছু বিবরণ গ্রথিত করা হয়েছে।

তৃতীয় স্তবকে সংকলিত হলো তাঁকে নির্দিষ্ট এক একটি প্রশ্ন এবং তাদের তাৎক্ষণিক উত্তর। এগুলি অনুধাবন করলে মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞান-কল্পতরু। এ এক পরমাশ্চর্য যে, কেমন করে আপাত বিদ্যাহীন কথক যে-কোনো জিজ্ঞাসার সদুত্তর দিচ্ছেন ক্ষণমাত্রও চিন্তা না করে। আর প্রশ্নকর্তাদের মধ্যে যেখানে কেশবচন্দ্র, নরেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র প্রমুখ দিকপাল দেখা যায়। তাঁদের জিজ্ঞাস্য বিষয় অবশ্যই অসাধারণ দুরূহ বা অপ্রচলিত। আবার সংশয়াচ্ছন্ন কোনো কোনো সাধারণ মানুষও এমন প্রশ্ন করেন যা অসামান্য এবং জটিলও। রীতিমত পণ্ডিত ভিন্ন সে সবের উত্তরদান সম্ভব নয়। কিন্তু সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাঞ্জল নিরাকরণে সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত। অতি বড় মনস্বী, ভাবুক জনও ছাত্রতুল্য জিজ্ঞাসু হয়ে এসেছেন এবং তিনিও অধ্যাপক জনোচিত আলোকপাত করেছেন। সমস্যার সমাধানে সুযোগ্য উপমা তো আছেই। কখনো কখনো কবি সাহিত্যিকের পরিশীলিত ভাষায় তিনি প্রকাশ করেন

বক্তব্য। রীতিমত পরিপাটি বাচন সৌষ্ঠবে। আর সে সৌকর্য এসে যায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ভাবের প্রয়োজনে ভাষার উৎসার।

আরেক লক্ষণীয় বিশেষত্ব তাঁর কথোপকথনে যে, কথনো কোনো প্রশ্নে তিনি নিরুত্তর থাকেন নি। যখনি যত কঠিন প্রশ্নই করা হোক, মুহূর্ত চিন্তা না করেই তার উত্তর দিয়েছেন সপ্রতিভভাবে।

এমন নানা প্রশ্নোত্তরমালা 'কথামৃত'তে বিকীর্ণ হয়ে আছে। তার থেকে কয়েকটি মাত্র চয়ন করে দেওয়া হলো এখানে। স্থানকাল এবং প্রশ্ন-কারীদের পরিচয় এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। প্রশ্নের সঙ্গে পঠনীয় কেবল তাঁর জ্ঞানাঞ্জনশলাকারূপ দিব্য বাণীনিচয়। তাঁর উত্তরাবলীর ভাষ্যও বাহুল্য, কারণ তা সর্বজনবোধ্য প্রাঞ্জল, স্বয়ং প্রকাশ।

একজন ভক্ত (সম্ভবত শ্রীম.) জিজ্ঞাসা করলেন—'মহাশয়, কেমন করে জানা যায় যে ঈশ্বরদর্শন হয়েছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন—'ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ আছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরদর্শন করেছে, তার চারটি লক্ষণ হয়, (১) বালকবৎ, (২) পিশাচবৎ, (৩) জড়বৎ, (৪) উন্মাদবৎ।

যার ঈশ্বরদর্শন হয়েছে তার বালকের স্বভাব হয়। সে ত্রিগুণাতীত—কোনো গুণের আট নাই। আবার শুচি অশুচি তার কাছে দুই সমান তাই পিশাচবৎ। আবার পাগলের মত 'কভু হাসে, কভু কাঁদে'। এই—বাবুর মত সাজে-গোজে, আবার খানিক পরে ন্যাংটা; বগলের নীচে কাপড় রেখে বেড়াচ্ছে—তাই উন্মাদবৎ। আবার কখনও বা জড়ের ন্যায় চুপ করে বসে আছে—জড়বৎ।'

এই যে বললেন, 'শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে,' কিন্তু তিনি তো ভাগবত পাঠ করেন নি। অপরের পাঠ শুনেই তার অধীত এবং অলৌকিক স্মরণ-শক্তিতে রক্ষিত। এমন নানা দৃষ্টান্ত আছে তাঁর বিভিন্ন দিনের প্রসঙ্গে।

পুনরায় প্রশ্ন—'ঈশ্বর দর্শনের পর কি অহঙ্কার যায়?'

শ্রীঠাকুরের উত্তর—'কখনো কখনো তিনি অহঙ্কার একেবারে পুঁছে

.কলেন—যেমন সমাধি অবস্থায়। আবার প্রায় অহঙ্কার একটু রেখে .দন। কিন্তু সে অহঙ্কারে দোষ নাই। যেমন বালকের অহঙ্কার। পাঁচ বছরের বালক 'আমি' 'আমি' করে, কিন্তু কারু অনিষ্ট করতে জানে না। পরশমণি ছুঁলে লোহা সোনা হয়ে যায়। লোহার তরোয়াল সোনার তরোয়াল হয়ে যায়। তরোয়ালের আকার থাকে, কারু অনিষ্ট করে না। সোনার তরোয়ালে মারা কাটা চলে না।'

.কশবচন্দ্র—'কালী কত ভাবে লীলা করছেন, সেই কথাগুলি একবার বলুন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—'তিনি নানাভাবে লীলা করছেন। তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। মহাকালী, নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই; চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী ছিল না, নিবিড় আঁধার; তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী—মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন।

শ্যামাকালীর অনেকটা কোমলভাব—বরাভয়দায়িনী। গৃহস্থ বাড়িতে তাঁরই পূজা হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয়; রক্ষাকালী পূজা করতে হয়। শ্মশানকালীর সংহার মূর্তি। শব, শিবা, ডাকিনী, যোগিনী মধ্যে, শ্মশানের উপর থাকেন। রুধির ধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কোটাতে নরহস্তের কোমরবন্ধ। যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন।'

বেদান্তের পরিচয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছিলেন—'বেদান্ত—শঙ্কর যা বুঝিয়েছেন, তাও আছে, আবার রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও আছে।'

নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ কি?'

শ্রীঠাকুর উত্তর দিলেন—'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আছে—রামানুজের মত কিনা। জীবজগৎ-বিশিষ্ট ব্রহ্ম। সব জড়িয়ে একটি।'

সেই দুরূহ তত্ত্ব অতি দৃশ্যমান উপমায় বোঝালেন—'যেমন একটি

বেল। খোলা আলাদা, বীজ আলাদা, শাঁস আলাদা একজন করেছিল বেলটি কত ওজনের জানবার দরকার হয়েছিল। এখন শুধু শাঁস ওজন করলে কি বেলের ওজন পাওয়া যায়? খোলা, বীচি, শাঁস সব একসঙ্গে ওজন করতে হবে। প্রথমে খোলা নয়, বীচি নয়, শাঁসটিই সার পদার্থ বলে বোধ হয়। তারপর বিচার করে দেখে—যে বস্তুর শাঁস, সেই বস্তুরই খোলা আর বীচি। আগে 'নেতি নেতি' করে যেতে হয়। জীব নেতি, জগৎ নেতি—এইরূপ বিচার করতে হয়। ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু। তারপর অনুভব হয়—যার শাঁস, তারই খোলা, বীচি—যা থেকে ব্রহ্ম বলছো, তাই থেকে জীবজগৎ। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা তাই রামানুজ বলতেন—জীবজগৎ-বিশিষ্ট ব্রহ্ম। এরই নাম বিশিষ্টা দ্বৈতবাদ।'

যাত্রা পালার তরুণ অভিনেতা জানতে চাইলেন—'আজ্ঞা, কাম আর কামনা তফাত কি?'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'কাম যেন গাছের মূল, কামনা যেন ডালপালা।

তারপর বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দিলেন, 'এই কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি ছয় রিপু একেবারে তো যাবে না, তাই ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি কামনা করতে হয়, লোভ করতে হয়, তবে ঈশ্বরে ভক্তি কামনা করতে হয়, আর তাঁকে পাবার লোভ করতে হয়। যদি মদ অর্থাৎ মত্ততা করতে হয়, অহঙ্কার করতে হয়, তাহলে আমি ঈশ্বরের দাস, ঈশ্বরের সন্তান, এই বলে মত্ততা, অহঙ্কার করতে হয়। সব মন তাঁকে না দিলে তাঁকে দর্শন হয় না। কামিনী কাঞ্চনে মনের বাজে খরচ হয়।'

পুনরায় প্রশ্ন—'আজ্ঞা, আত্মা যে দেহ থেকে পৃথক তার প্রমাণ কি?'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'প্রমাণ? ঈশ্বরকে দেখা যায়; তপস্যা করলে তাঁর কৃপায় ঈশ্বর দর্শন হয়। ঋষিরা আত্মার সাক্ষাৎকার করেছিলেন। সায়েন্সে ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায় না, তাতে কেবল এটার সঙ্গে ওটা মিশালে এই হয়; আর ওটার সঙ্গে এটা মিশালে এই হয়, এই সব ইন্দ্রিয়-

গ্রাহ্য জিনিসের খবর পাওয়া যায়।
তাই এ বুদ্ধির দ্বারা এসব বুঝা যায় না। সাধুসঙ্গ করতে হয়। বৈদ্যের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে নাড়ী টেপা শেখা যায়।'

জনৈক তান্ত্রিক জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজ্ঞে, তান্ত্রিক ক্রিয়া আজকাল কেন ফলে না ?'
শ্রীঠাকুর উত্তর দিলেন, 'সর্বাঙ্গীণ হয় না, আর ভক্তি ঠিক হয় না ; তাই ফলে না।'

একজন ব্রাহ্ম জানতে চাইলেন, 'মহাশয়, উপায় কি ?'
শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'উপায় অনুরাগ, অর্থাৎ তাঁকে ভালবাসা। আর প্রার্থনা।'
তারপর এই গানখানি গেয়ে শোনালেন—ডাক দেখি মন ডাকার মত, কেমন শ্যামা থাকতে পারে।'

এক ভক্তের প্রশ্ন হলো, 'ঈশ্বরকে কি দেখা যায় ?'
উত্তর—হাঁ, অবশ্য দেখা যায়। নিরাকার, সাকার, দুই দেখা যায়। সাকারে চিন্ময়রূপ দর্শন হয়। আবার সাকার মানুষ তাতেও তিনি প্রত্যক্ষ। অবতারকে দেখাও যা ঈশ্বরকে দেখাও তা। ঈশ্বরই যুগে যুগে মানুষরূপে অবতীর্ণ হন।'

সুরেন্দ্র মিত্রের বিচারপতি অগ্রজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহাশয়, থিওজফি কিরূপ বোধ হয় ?'
শ্রীরামকৃষ্ণ জানালেন, 'শুনেছি নাকি ওতে অলৌকিক শক্তি হয়। দেব মোড়লের বাড়িতে দেখেছিলাম একজন পিশাচসিদ্ধ। পিশাচ কত কি জিনিস এনে দিত। অলৌকিক শক্তি নিয়ে কি করবো ? ওর দ্বারা কি ঈশ্বর লাভ হয় ? ঈশ্বর যদি না লাভ হল, তাহলে সকলই মিথ্যা !'

মণিলাল মল্লিক জানতে চাইলেন, 'আমাদের এখন কর্তব্য ?'
শ্রীঠাকুর বললেন, 'কোন রকম করে তাঁর সঙ্গে যোগ হয়ে থাকা। দুই পথ আছে,—কর্মযোগ আর মনোযোগ।
যারা আশ্রমে আছে, তাদের যোগ কর্মের দ্বারা। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাস। সন্ন্যাসীরা কাম্য কর্মের ত্যাগ করবে, কিন্তু নিত্যকর্ম কামনাশূন্য হযে করবে। দণ্ড ধারণ, ভিক্ষা করা, তীর্থযাত্রা, পূজা, জপ এসব কর্মের দ্বারা তাঁর সঙ্গে যোগ হয়।
আর যে কর্মই কর, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কামনা শূন্য হয়ে করতে পারলে তার সঙ্গে যোগ হয়।
আর এক পথ মনোযোগ। এরূপ যোগীর বাহিরের কোনো চিহ্ন নাই। অন্তরে যোগ। যেমন জড়ভরত, শুকদেব। আরও কত আছে—এরা নামজাদা।
পরমহংস অবস্থায কর্ম উঠে যায। স্মরণ মনন থাকে। সর্বদাই মনের যোগ। যদি কর্ম করে সে লোকশিক্ষার জন্য।
কর্মের দ্বারাই যোগ হউক, আর মনের দ্বারাই যোগ হউক ভক্তি হলে সব জানতে পারা যায।...'

পুনরায় মণিলালের প্রশ্ন—'হঠযোগ ?'
শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তর—'হঠযোগীরা দেহাভিমানী সাধু। কেবল নেতি ধৌতি করছে—কেবল দেহের যত্ন। ওদের উদ্দেশ্য আয়ু বৃদ্ধি করা। দেহ নিয়ে রাতদিন সেবা। ও ভাল নয়।'

গিরিশচন্দ্র জানতে চাইলেন—'মহাশয়, একাঙ্গী প্রেম কাকে বলে ?'
শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন—'একাঙ্গী, কিনা, ভালবাসা একদিক থেকে।'
শুধু অর্থ নয়, দৃষ্টান্ত দিয়েও বললেন, 'যেমন জল হাঁসকে চাচ্ছে না, কিন্তু হাঁস জলকে ভালবাসে।'

তারই অনুষঙ্গে আবার 'সাধারণী', 'সমঞ্জসা' আর 'সমর্থা প্রেম' কাকে বলে, তাও জানালেন,—'আবার আছে সাধারণী, সমঞ্জসা, সমর্থা। সাধারণী প্রেম—নিজের সুখ চায়, তুমি সুখী হও আর না হও, যেমন চন্দ্রাবলীর ভাব। আবার সমঞ্জসা—আমারও সুখ হোক, তোমারও সুখ হোক। এ খুব ভাল অবস্থা। সকলের উচ্চ অবস্থা,—সমর্থা। যেমন শ্রীমতীর। কৃষ্ণসুখে সুখী, তুমি সুখে থাকো, আমার যাই হোক। গোপীদের এই ভাব বড় উচ্চ ভাব।'

গুপ্ত মহেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন—'মহাশয়, অন্তরঙ্গ কাকে বলে?' 'কি রকম জান?' একেবারে চাক্ষুষ উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন—'যেমন নাটমন্দিরের ভিতরের থাম, বাইরের থাম। যারা সর্বদা কাছে থাকে, তারাই অন্তরঙ্গ।'

'বৈদ্যনাথ কৃতবিদ্য। বড় আদালতের উকিল', প্রশ্ন করলেন—'এই যে Free will অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছা— এটা কি সত্য? সত্য সত্যই কি আমরা স্বাধীন?'
ঠাকুর বললেন, 'সকলই ঈশ্বরাধীন। তাঁরই লীলা। তিনি নানা জিনিষ করেছেন। ছোট, বড়, বলবান, দুর্বল, ভাল, মন্দ। · এসব তাঁর মায়া; খেলা। এই দেখ না, বাগানের সব গাছ কিছু সমান হয় না। যতক্ষণ ঈশ্বরকে লাভ না হয়, ততক্ষণ মনে হয় আমরা স্বাধীন। এ ভ্রম তিনিই রেখে দেন; তা না হলে পাপের বৃদ্ধি হ'ত। পাপকে ভয় হ'ত না। পাপের শাস্তি হ'ত না। যিনি ঈশ্বর লাভ করেছেন, তাঁর কি ভাব জানো? আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী ··যেমন চালাও তেমনি চলি।'

পণ্ডিত শশধর প্রমুখের সামনে ঠাকুর বলছেন—'বিজ্ঞানী · কখনো নিত্য হতে লীলাতে থাকে; কখনো নিত্য হতে লীলাতে যায়।'
তর্কচূড়ামণি বললেন—'এটি বুঝলাম না।'

তিনি বললেন—'নেতি নেতি বিচার করে সেই নিত্য অখণ্ড সচ্চিদা-নন্দে পৌঁছয়। তারা এই বিচার করে—তিনি জীব নন, জগৎ নন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নন। নিত্যে পৌঁছে আবার দেখে—তিনি এই সব হয়েছেন—জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব।'

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী জানতে চাইলেন, 'বদ্ধজীবের মনের কি অবস্থা হলে মুক্তি হতে পারে ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'ঈশ্বরের কৃপায় তীব্র বৈরাগ্য হলে, এই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থেকে নিস্তার হতে পারে। তীব্র বৈরাগ্য কাকে বলে ? হচ্ছে হবে, ঈশ্বরের নাম করা যাক, এ সব মন্দ বৈরাগ্য। যার তীব্র বৈরাগ্য, তার প্রাণ ভগবানের জন্যে ব্যাকুল ; মার প্রাণ যেমন পেটের ছেলের জন্য ব্যাকুল। যার তীব্র বৈরাগ্য, সে ভগবান ভিন্ন আর কিছু চায় না। সংসারকে পাতকুয়া দেখে ; তার মনে হয়, বুঝি ডুবে গেলুম। আত্মীয়দের কালসাপ দেখে, তাদের কাছ থেকে পালাতে ইচ্ছা হয় ; আর পালায়ও। বাড়ির বন্দোবস্ত করি, তারপর ঈশ্বর চিন্তা করবো, একথা ভাবেই না। ভিতরে খুব রোক। তীব্র বৈরাগ্য কাকে বলে একটি গল্প শোন।'

বলে, যে চাষী অনাবৃষ্টির সময় উদয়াস্ত পরিশ্রমে খানা কেটে ক্ষেতে জল আনে, অস্নাত অভুক্ত থেকে—সেই গল্পটি শোনালেন।

'একজন ভক্ত' (গুপ্ত মহেন্দ্রনাথ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহাশয়, মেয়ে-মানুষকে কি ঘৃণা করবো ?'

ঠাকুর বললেন—'যিনি ঈশ্বর লাভ করেছেন, তিনি কামিনীকে আর অন্য চক্ষে দেখেন না যে ভয় হবে। তিনি ঠিক দেখেন যে মেয়েরা মা ব্রহ্মময়ীর অংশ আর মা বলে তাই সকলকে পূজা করেন।'

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (কেশব সেনের শিষ্য, নববিধানের প্রচারক এবং

প্রসিদ্ধ গায়ক তথা গীত-রচয়িতা) প্রশ্ন করলেন—

'সংসারে জ্ঞান হয়েছে তার লক্ষণ কি ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ জানালেন—'হরিনামে ধারা আর পুলক। তাঁর মধুর নাম শুনেই শরীর রোমাঞ্চ হয়ে চক্ষু দিয়ে ধারা বেয়ে পড়বে।…যখন দেখবে ঈশ্বরের নাম করতেই অশ্রু আর পুলক হয়, তখন জানবে, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি চলে গেছে, ঈশ্বর লাভ হয়েছে।…বিষয়-রসে র'সে থাকলে, কামিনী-কাঞ্চন-রসে মন ভিজে থাকলে, ঈশ্বরের উদ্দীপনা হয় না। হাজার চেষ্টা কর, কেবল পণ্ডশ্রম। বিষয়-রস শুকুলে তৎক্ষণাৎ উদ্দীপন হয়।'

ত্রৈলোক্যনাথ জিজ্ঞাসা করলেন—'বিষয়-রস শুকোবার এখন উপায় কি ?'

ঠাকুর বললেন—'মার কাছে আকুল হয়ে ডাকো। তাঁর দর্শন হলে বিষয়-রস শুকিয়ে যাবে; কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি সব দূরে চলে যাবে। আপনার মা বোধ থাকলে এক্ষণেই হয়। তিনি তো ধর্ম-মা নন। আপনারই মা ! ব্যাকুল হয়ে মার কাছে আবদার কর।'

তারপর ছেলে মায়ের কাছে ঘুড়ি কেনবার জন্যে নাছোড়বান্দা হলে মা যেমন পয়সা দিয়ে দেন সেই উপমা দিয়ে বললেন, 'তোমরাও মার কাছে আবদার কর, তিনি অবশ্য দেখা দিবেন।'

মহিমাচরণ চক্রবর্তী জানতে চাইলেন, 'কি কর্মের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যেতে পারে ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন—'এই কর্মের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যাবে, আর এই কর্মের দ্বারা পাওয়া যাবে না, তা নয়। তাঁর কৃপার উপর নির্ভর। তবে ব্যাকুল হয়ে কিছু কর্ম করে যেতে হয়। ব্যাকুলতা থাকলে তাঁর কৃপা হয়। একটা সুযোগ হওয়া চাই। সাধুসঙ্গ, বিবেক, সদ্‌গুরু লাভ, হয় তো একজন বড় ভাই সংসারের ভার নিলে ; হয় তো স্ত্রীটি বিদ্যা-শক্তি, বড় ধার্মিক ; কি বিবাহ আদপেই হলো না, সংসারে বদ্ধ হতে

হলো না ;—এই সব যোগাযোগ হলে হয়ে যায়।'
বলে, সেই গল্পটি শোনালেন—'স্বাতী নক্ষত্রের বৃষ্টির জল মড়ার মাথার খুলিতে পড়বে আর একটা সাপ ব্যাঙকে ছোবল মারতে গেলে ব্যাঙটা লাফ দিয়ে পালাবার সময় সাপের বিষ মড়ার খুলিতে পড়লে, সেই বিষে তৈরি ওষুধে একজনের ভারী অসুখ সারে।
শেষে আবার বললেন—'তাই বলছি ব্যাকুলতা থাকলে সব হয়ে যায়।

প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ('বেদান্ত চর্চায় বড় প্রীতি') প্রশ্ন করলেন, 'মহাশয়, অনাহত শব্দটি কি ?'
শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন—'অনাহত শব্দ সর্বদাই এমনি হচ্ছে। প্রণবের ধ্বনি। পরব্রহ্ম থেকে আসছে, যোগীরা শুনতে পায়। বিষয়াসক্ত জীব শুনতে পায় না। যোগী জানতে পারে যে সেই ধ্বনি একদিকে নাভি থেকে উঠে ও আর একদিকে সেই ক্ষীরোদশায়ী পরব্রহ্ম থেকে উঠে।'

মহিমাচরণ জানতে চাইলেন, 'মহাশয়, সমাধিস্থ কি ফিরতে পারে ?'
'তোমায় একলা একলা বলবো ; তুমিই একথা শোনবার উপযুক্ত' বলে ঠাকুর তাঁকে একান্তে এনে বলতে লাগলেন—'জীব আর ঈশ্বর অনেক তফাৎ। সাধন ভজন করে সমাধি পর্যন্ত জীবের হতে পারে। ঈশ্বর যখন অবতীর্ণ হন, তিনি সমাধিস্থ হয়েও আবার ফিরতে পারেন। জীবের থাক্—এরা যেন রাজার কর্মচারী। রাজার বার বাড়ি পর্যন্ত এদের গতায়াত। রাজার বাড়ি সাততলা, কিন্তু রাজার ছেলে সাততলায় আনাগোনা করতে পারে, আবার বাইরেও আসতে পারে। ফেরে না, ফেরে না, সব বলে। তবে শঙ্করাচার্য, রামানুজ এরা সব কি ? এরা 'বিদ্যার আমি' রেখেছিল।'
মহিমাচরণ বললেন, 'তাই ত ; তা না হলে গ্রন্থ লিখলে কেমন করে ?'
শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'আবার দেখ, প্রহ্লাদ, নারদ, হনুমান এরাও

সমাধির পর ভক্তি রেখেছিল।'

গিরিশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন. 'আচ্ছা, মহাশয়—কোনটা ঠিক? কষ্টে সংসার ছাড়া. না সংসারে থেকে তাঁকে ডাকা?'
ঠাকুর জানালেন, 'অনাসক্ত হয়ে সংসারে থেকে কর্ম করলে, সব মিথ্যা জেনে জ্ঞানের পর সংসারে থাকলে, ঠিক ঈশ্বর লাভ হয়। যারা কষ্টে ছাড়ে, তারা হীন থাকের লোক।'
'সংসারে জ্ঞানী কি রকম জান? যেমন শার্সির ঘরে কেউ আছে। ভিতর বার দুই দেখতে পায়।'

গুপ্ত মহেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা. ঈশ্বরলাভ এর মানে কি? আর ঈশ্বরদর্শন কাকে বলে?'
শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে লাগলেন—'বৈষ্ণবরা বলে যে ঈশ্বরের পথে যারা যাচ্চে আর যাঁরা তাঁকে লাভ করেছে তাদের থাক্ থাক্ আছে—প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ আর সিদ্ধের সিদ্ধ। যিনি সার পথে উঠেছেন তাঁকে প্রবর্তক বলে। যে সাধন ভজন করছে—পূজা, জপ, ধ্যান, নাম কীর্তন করছে—সে ব্যক্তি সাধক। যে ব্যক্তি ঈশ্বর আছেন বোধে বোধ করেছে, তাকেই সিদ্ধ বলে। যেমন বেদান্তের উপমা আছে—অন্ধকার ঘর, বাবু শুয়ে আছে। বাবুকে একজন হাতড়ে হাতড়ে খুঁজছে। একটা কৌচ হাত দিয়ে বলছে, এ নয়: জানলায় হাত দিয়ে বল্‌ছে, এ নয়। নেতি, নেতি, নেতি। শেষে বাবুর গায়ে হাত পড়েছে, তখন বলছে, 'ইহ' এই বাবু—অর্থাৎ 'অস্তি' বোধ হয়েছে। বাবুকে লাভ হয়েছে কিন্তু বিশেষ রূপে জানা হয় নাই।
আর এক থাক আছে, তাকে বলে সিদ্ধের সিদ্ধ। বাবুর সঙ্গে যদি বিশেষ আলাপ হয় তা হলে আর এক রকম অবস্থা—যদি ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেম ভক্তির দ্বারা বিশেষ আলাপ হয়। যে সিদ্ধ সে ঈশ্বরকে পেয়েছে বটে—যিনি সিদ্ধের সিদ্ধ তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে বিশেষরূপে আলাপ করেছেন।

কিন্তু তাঁকে লাভ করতে হলে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর।

শান্ত—যেমন ঋষিদের ছিল। তাদের অন্য কিছু ভোগ করবার বাসনা ছিল না।··

দাস্য—যেমন হনুমানের। রামের কাজ করবার সময় সিংহতুল্য। স্ত্রীরও দাস্যভাব থাকে—স্বামীকে প্রাণপণে সেবা করে।···

সখ্য—বন্ধুর ভাব; এস এস কাছে এসে বস। শ্রীদামাদি কৃষ্ণকে কখনো এঁটো ফল খাওয়াচ্ছে, কখনো ঘাড়ে চড়ছে।

মধুর—যেমন শ্রীমতীর। স্ত্রীরও মধুর ভাব। এ ভাবের ভিতরে সকল ভাবই আছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য।'

মহেন্দ্রনাথ এবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঈশ্বরকে দর্শন কি এই চক্ষে হয়?'

ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'তাঁকে চর্মচক্ষে দেখা যায় না। সাধনা করতে করতে একটি প্রেমের শরীর হয়—তার প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ সেই চক্ষে তাঁকে দেখে—সেই কর্ণে তাঁর বাণী শুনা যায়।'···

এক মাড়োয়ারী ভক্ত প্রশ্ন করলেন, 'মহারাজ, সাকার পূজার মানে কি? আর নিরাকার নির্গুণ,—এর মানেই বা কি?'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন,—'যেমন বাপের ফটোগ্রাফ দেখলে বাপকে মনে পড়ে, তেমনি প্রতিমায় পূজা করতে করতে সত্যের রূপ উদ্দীপন হয়। সাকার রূপ কিরকম জান? যেমন জলরাশির মাঝ থেকে ভুড়ভুড়ি উঠে সেইরূপ। মহাকাশ চিদাকাশ থেকে এক-একটি রূপ উঠছে দেখা যায়। অবতারও একটি রূপ। অবতার-লীলা সে আদ্যাশক্তিরই খেলা।

আমি কে—এইটি খুঁজতে গেলে তাঁকেই পাওয়া যায়। আমি কি মাংস, না হাড়, না রক্ত, না মজ্জা;—না মন, না বুদ্ধি? শেষে বিচারে দেখা যায় যে আমি এসব কিছুই নয়। 'নেতি' 'নেতি।' আত্মা ধরবার ছোঁবার যো নাই। তিনি নির্গুণ—নিরুপাধি।' ··

একজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্ত্রীজাতি খারাপ না আমরা খারাপ ?'

ঠাকুর বললেন, 'বিদ্যারূপিণী স্ত্রীও আছে, আবার অবিদ্যারূপিণী স্ত্রীও আছে। বিদ্যারূপিণী স্ত্রী ভগবানের দিকে লয়ে যায় ; আর অবিদ্যারূপিণী ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়, সংসারে ডুবিয়ে দেয়।'...

পুনরায় প্রশ্ন—'অবিদ্যাতে যদি অজ্ঞান করে, তবে তিনি অবিদ্যা করেছেন কেন ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন—'তাঁর লীলা ; অন্ধকার না থাকলে আলোর মহিমা বোঝা যায় না। দুঃখ না থাকলে সুখ বোঝা যায় না। 'মন্দ' জ্ঞান থাকলে তবে 'ভাল' জ্ঞান হয়।'

আরেক দিক থেকে বুঝিয়ে দিলেন—'খোসাটি আছে বলে তবে আমটি বাড়ে ও পাকে। আমটি তয়ের হ'য়ে গেলে তবে খোসা ফেলে দিতে হয় ; মায়ারূপ ছালটি থাকলে তবেই ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। বিদ্যা-মায়া অবিদ্যা-মায়া আমের খোসার ন্যায় ; দুইই দরকার।'

এক তান্ত্রিক ভক্ত জানতে চাইলেন, 'তবে কর্মফল আছে ?'

ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'তাও আছে। ভাল কর্ম করলে সুফল, মন্দ কর্ম করলে কুফল ; লঙ্কা খেলে ঝাল লাগবে না ? এ সব তাঁর লীলা-খেলা।'

'আমাদের উপায় কি ? কর্মের ফল তো আছে ?' তান্ত্রিক ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বরাভয় দিলেন, 'থাকলেই বা তাঁর ভক্তের কথা আলাদা।'

আর রামপ্রসাদের দিব্যবাণীর গানখানি গেয়ে শোনালেন—

> মন রে কৃষি কাজ জাননা।
> এমন মানব জমি রইল পতিত,
> আবাদ করলে ফলত শোনা ॥

কালী নামে দাও রে বেড়া,—
ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া,
তার কাছেতে যম ঘেঁষে না॥

জয়গোপাল সেনের প্রশ্ন—'সব পথই সত্য কেমন করে জানব?'
শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিয়ে বললেন চাক্ষুষ উপমা যোগে, 'একটা পথ দিয়ে যেতে পারলে তাঁর কাছে পৌঁছান যায়। তখন সব পথের খবর জানতে পারে। যেমন একবার কোন উপায়ে ছাদে উঠতে পারলে, কাঠের সিঁড়ি দিয়েও নামা যায়; পাকা সিঁড়ি দিয়েও নামা যায়; একটা দড়ি দিয়েও নামা যায।'
তাঁর কৃপা হলে, ভক্ত সব জানতে পারে। তাঁকে একবার লাভ হলে সব জানতে পারবে। একবার যো-সো করে বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে হয়, আলাপ করতে হয়—তখন বাবুই বলে দেবে তাঁর কখানা বাগান, পুকুর কোম্পানীর কাগজ।'

একজন ভক্ত (সম্ভবত শ্রীম.) জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঈশ্বর দর্শন কিরূপ?'
রঙ্গমঞ্চে পটোত্তলন ও নাটকের উপমায় শ্রীরামকৃষ্ণ আভাস দিলেন—'থিয়েটারে অভিনয় দেখ নাই? লোক সব পরস্পর কথা কচ্ছে, এমন সময় পর্দা উঠে গেল: তখন সকলের সমস্ত মনটা অভিনয়ে যায় আর বাহ্য দৃষ্টি থাকে না—এরই নাম সমাধিস্থ হওয়া।
আবার পর্দা পড়ে গেলে বাহিরে দৃষ্টি। মায়ারূপ যবনিকা পড়ে গেলে আবার মানুষ বহির্মুখ হয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবস্থ হয়ে বললেন, 'বল, তোমাদের যা সংশয়। আমি সব বলছি।'
বেলঘরের গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় প্রশ্ন করলেন—'আজ্ঞা, শ্যামা এ রূপটি হল কেন?'

ঠাকুর ব্যাখ্যা করে দিলেন, 'সে দূর বলে। কাছে গেলে কোন রঙই নাই। দীঘির জল দূর থেকে কাল দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে ক'রে তোল, কোন রঙ নাই। আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছের আকাশ দেখ, কোন রঙ নাই। ঈশ্বরের যত কাছে যাবে, ততই ধারণা হবে, তাঁর নাম, রূপ নাই। পেছিয়ে একটু দূরে এলে আবার 'আমার শ্যামা মা! যেন ঘাস ফুলের রঙ।'...

পুনরায় গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, 'যোগমায়া কেন বলে?'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'যোগমায়া অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতির যোগ। যা কিছু দেখছ সবই পুরুষ প্রকৃতির যোগ। শিবকালীর মূর্তি, শিবের উপর কালী দাঁড়িয়ে আছেন। শিব শব হয়ে পড়ে আছেন। কালী শিবের দিকে চেয়ে আছেন। এই সমস্তই পুরুষ-প্রকৃতির যোগ। পুরুষ নিষ্ক্রিয় তাই শিব শব হয়ে আছেন। পুরুষের যোগে প্রকৃতি সমস্ত কাজ করছেন। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন।

রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিরও মানে ঐ। ঐ যোগের জন্য বঙ্কিম ভাব। সেই যোগ দেখাবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের নাকে মুক্তো, শ্রীমতীর নাকে নীল পাথর। শ্রীমতীর গৌরবরণ মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল।'

শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ তাই শ্রীমতীর নীল পাথর। আবার শ্রীকৃষ্ণ পীতবসন ও শ্রীমতী নীল বসন পরেছেন।'...

শ্রীনাথ ডাক্তার জানতে চাইলেন, 'আজ্ঞে, প্রারব্ধ কোথা যাবে? পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্ম?'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'খানিকটা কর্মফল ভোগ হয়। কিন্তু তাঁর নামের গুণে অনেক কর্মপাশ কেটে যায়।'

মণি (শ্রীম.) জানতে চাইলেন—'জ্ঞান ভক্তি দুই-ই কি হয়না?'

উত্তর দিলেন ঠাকুর—'খুব উঁচুঘরের হয়। ঈশ্বরকোটির হয়, যেমন চৈতন্যদেবের। জীবকোটিদের আলাদা কথা।

আলো (জ্যোতি) পাঁচ প্রকার দীপ। আলোক, অন্যান্য অগ্নির আলো,

সৌর আলো ও চান্দ্র সৌর একাধারে। ভক্তি চন্দ্র ; জ্ঞান সূর্য।
কখনো কখনো আকাশে সূর্য অস্ত না যেতে যেতে চন্দ্র দেখা যায়।
অবতারাদি ভক্তি চন্দ্র জ্ঞান সূর্য একাধারে দেখা যায়।
মনে করলেই কি একাধারে জ্ঞান ভক্তি দুই হয়, আধার বিশেষ। কোন বাঁশের ফুটো বেশি, কোন বাঁশের খুব সরু ফুটো। ঈশ্বর বস্তুর ধারণা কি সকল আধারে হয় ? এক সের ঘটিতে কি দু সের দুধ ধরে ?'

মণিলাল মল্লিকের জিজ্ঞাস্য হলো—'আচ্ছা ধ্যানের কি নিয়ম ? কোথায় ধ্যান করতে হয় ?'
শ্রীরামকৃষ্ণ জানালেন, 'হৃদয় ডঙ্কাপেটা জায়গা। হৃদয়ে ধ্যান হতে পারে। অথবা সহস্রারে। এগুলি আইনের ধ্যান—শাস্ত্রে আছে। তবে তোমার যেখানে অভিরুচি ধ্যান করতে পার। সব স্থানই তো ব্রহ্মময, কোথায় তিনি নাই।···
নিরাকার ধ্যান ও সাকার ধ্যান। নিরাকার ধ্যান বড় কঠিন। সে ধ্যানে যা কিছু দেখছ শুনছ—লীন হয়ে যাবে ; কেবল স্ব-স্বরূপ চিন্তা। সেই স্বরূপ চিন্তা করে শিব নাচেন। 'আমি কি' 'আমি কি' এই বলে নাচেন।
একে বলে শিবযোগ। ধ্যানের সময় কপালে দৃষ্টি রাখতে হয়। 'নেতি নেতি' করে জগৎ ছেড়ে, স্ব-স্বরূপ চিন্তা।
আর এক আছে বিষ্ণু যোগ। নাসাগ্রে দৃষ্টি ; অর্ধেক জগতে, অর্ধেক অন্তরে। সাকার ধ্যানে এইরূপ হয়' ··

মনি (শ্রীম). প্রশ্ন করলেন—'আজ্ঞা ত্রিগুণাতীত ভক্তি কাকে বলে ?'
ঠাকুর বললেন, 'যে ভক্তি হলে সব চিন্ময় দেখে চিন্ময় শ্যাম। চিন্ময ধাম। ভক্তও চিন্ময়। সব চিন্ময়। এ ভক্তি কম লোকের হয়।

পণ্ডিত শশধর প্রশ্ন করলেন, 'আমরা বললে তিনি শুনবেন ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ জানালেন, 'ঈশ্বর কল্পতরু। যে যা চাইবে তাই পাবে। কিন্তু কল্পতরুর কাছে চাইতে হয়, তবে কথা থাকে।
তবে একটি কথা আছে—তিনি ভাবগ্রাহী। যে যা মনে করে সাধনা করে তার সেইরূপই হয়। যেমন ভাব তেমনি লাভ।'...

শ্রীশ মুখোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেউ পাপ কর্ম করছে, কেউ পুণ্য কর্ম। এসব কি আগেকার কর্মের ফল, তাই করতেই হবে?'
শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'কর্ম কতদিন? যতদিন না তাঁকে লাভ করা যায়। তাঁকে লাভ হলে সব যায়। তখন পাপ পুণ্যের পার হয়ে যায়। ফল দেখা দিলে ফুল যায়। ফুল দেখা দেয় ফল হবার জন্যে।'

ছোট নরেনের প্রশ্ন হলো, 'আচ্ছা আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা (ফ্রী উইল) আছে কিনা?'
ঠাকুর বুঝিয়ে দিলেন, 'আমি কে খোঁজ দেখি। আমি খুঁজতে খুঁজতে তিনি বেরিয়ে পড়েন! 'আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী।' চীনের পুতুল দোকানে চিঠি হাতে করে যায়, শুনেছ! ঈশ্বরই কর্তা! আপনাকে অকর্তা জেনে কর্তার ন্যায় কার্য করো।...'

এক মাড়োয়ারি ভক্ত জানতে চাইলেন, 'শাস্ত্র পড়ি, কিন্তু ধারণা হয়না কেন?'
শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'পড়লে কি হবে? সাধনা—তপস্যা চাই। তাঁকে ডাকো। 'সিদ্ধি সিদ্ধি' বললে কি হবে, কিছু খেতে হয়।...সাধনের অবস্থায় একটু খাটতে হয়, তারপর সোজা পথ। ব্যাঁক কাটিয়ে অনুকূল বায়ুতে নৌকা ছেড়ে দাও।'

মহেন্দ্র মুখুজ্যে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন যোগভ্রষ্ট হয়?'
ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'পূর্বজন্মে ঈশ্বর চিন্তা করতে করতে হয়ত ভোগ

করবার লালসা হয়েছে। এরূপ হলে যোগভ্রষ্ট হয়। আর পরজন্মে ঐ রূপ জন্ম হয়।'

মহেন্দ্র—'তারপর, উপায় ?'

ঠাকুর বললেন—'কামনা থাকতে—ভোগ বাসনা থাকতে—মুক্তি নাই।'

একজন ভক্ত প্রশ্ন করলেন, 'আজ্ঞে, আগে বিচার করে কি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করতে হয় ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ জানালেন, 'ও এক পথ আছে। বিচার-পথ। ভক্তি পথেও অন্তরিন্দ্রিয় আপনি হয়। আর সহজে হয়। ঈশ্বরের উপর যত ভালবাসা আসবে, ততই ইন্দ্রিয়-সুখ আলুনী লাগবে।'

প্রশ্ন—'তাঁকে ভালবাসতে পারছি কই ?'

উত্তর—'তাঁর নাম করলে সব পাপ কেটে যায়। কাম, ক্রোধ, শরীরের সুখ ইচ্ছা, এসব পালিয়ে যায়।'

পুনরায় প্রশ্ন—'তাঁর নাম কর্তে ভাল কই লাগে ?'

সদুত্তর—'ব্যাকুল হয়ে তাঁকে প্রার্থনা কর, যাতে তাঁর নামে রুচি হয়। তিনিই মনোবাঞ্ছা পুর্ণ করবেন।'

ভবনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি চণ্ডী বুঝতে পারছি না। চণ্ডীতে লেখা আছে যে, তিনি সব টক টক মারছেন। এর মানে কি ?'

ঠাকুর জানালেন, 'ও সব লীলা। আমিও ভাবতুম ঐ কথা। তারপর দেখলাম সবই মায়া। তাঁর সৃষ্টিও মায়া। তাঁর সংহারও মায়া।'

এখানেও দেখা যাচ্ছে তিনি 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'র জ্ঞাতব্য বিষয় জানতেন, পাঠ না করেও।

একজনের প্রশ্ন হলো, 'হিন্দুতে ও ব্রাহ্মতে তফাৎ কি ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিয়ে দিলেন, 'তফাৎ আর কি ? এইখানে রোশনচৌকি বাজে, একজন শানাইয়ের ভোঁ ধরে থাকে আর একজন তারই ভিতর

'রাধা আমার মান করেছে,' ইত্যাদি রং পরা তুলে নেয়। ব্রাহ্মেরা নিরাকার ভোঁ ধরে বসে আছে। আর হিন্দুরা রং পরা তুলে নিচ্ছে।'

শ্যামবসু জানতে চাইলেন, 'আচ্ছা, স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ এসব প্রভেদ কি ?'
ঠাকুর উত্তরে বললেন, 'পঞ্চভূত লয়ে যে দেহ, সেইটি স্থূল দেহ। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার আর চিত্ত, এই লয়ে সূক্ষ্ম শরীর। যে শরীরে ভগবানের আনন্দ লাভ হয়, আর সম্ভোগ হয়, সেইটি কারণ শরীর। তন্ত্রে বলে, 'ভাগবতী তনু।' সকলের অতীত 'মহাকারণ' (তুরীয়) মুখে বলা যায় না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছিলেন, 'প্রথমে অজ্ঞান কাঁটাটি দূর করবার জন্য জ্ঞান কাঁটাটি আনতে হয়। তারপর জ্ঞান-অজ্ঞান দুইটিই ফেলে দিতে হয়। তিনি যে জ্ঞান-অজ্ঞানের পার। ব্রহ্ম-জ্ঞান অজ্ঞানের পার, পাপ-পুণ্যের পার, ধর্মাধর্মের পার, শুচি-অশুচির পার।'
শ্যাম বসু প্রশ্ন করলেন, 'দুই কাঁটা ফেলে দেওয়ার পর কি থাকবে ?'
ঠাকুর জানালেন, 'নিত্য শুদ্ধ বোধ রূপম্। তা তোমায় কেমন করে বুঝাবো ? যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, 'ঘি কেমন খেলে ?' তাকে এখন কি করে বুঝাবে ? হদ্দ বলতে পার, 'কেমন ঘি, না যেমন ঘি।' একটি সঙ্গী জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তোর স্বামী এসেছে, আচ্ছা ভাই, স্বামী এলে কিরূপ আনন্দ হয় ?' মেয়েটি বললে, 'ভাই তোর স্বামী হলে তুই জানবি ; এখন কেমন করে বুঝাবো।'

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রশ্ন হলো, 'মহাশয় ! কেন আমরা এরূপ বদ্ধ হয়ে আছি ? কেন ঈশ্বরকে দেখতে পাই না ?'
ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ করে রেখেছে। 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।' যদি ঈশ্বরের কৃপায়

'আমি অকর্তা' এই বোধ হয়ে গেল, তাহলে সে ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল। তার আর ভয় নাই।
এই মায়া বা অহং যেন মেঘের স্বরূপ। সামান্য মেঘের জন্য সূর্যকে দেখা যায় না—মেঘ সরে গেলেই সূর্যকে দেখা যায়। যদি গুরুর কৃপায় একবার অহং বুদ্ধি যায় তাহলে ঈশ্বর দর্শন হয়।'

বিজয়কৃষ্ণের আরেকটি জিজ্ঞাস্য—'যাঁরা বেদান্ত বিচার করেন তাঁরাও তো তাঁকে পান?'
শ্রীরামকৃষ্ণ জানালেন, 'হাঁ, বিচার পথেও তাঁকে পাওয়া যায়। একেই জ্ঞানযোগ বলে। বিচার পথ বড় কঠিন। তোমায় তো সপ্তভূমির কথা বলেছি। সপ্তমভূমিতে মন পঁহুছিলে সমাধি হয়। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই বোধ ঠিক হলে মনের লয় হয়, সমাধি হয়। কিন্তু কলিতে জীব অন্নগত প্রাণ, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' কেমন করে বোধ হবে? সে বোধ দেহ বুদ্ধি না গেলে হয় না। 'আমি দেহ নই, আমি মন নই, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নই, আমি সুখ দুঃখের অতীত, আমার আবার রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু কৈ?'—এসব বোধ কলিতে হওয়া কঠিন। যতই বিচার করো, কোনখান দিয়ে দেহ-বুদ্ধি এসে দেখা দেয়। অশ্বত্থ গাছ এই কেটে দাও, মনে করলে মূল শুদ্ধ উঠে গেল, কিন্তু তারপর দিন সকালে দেখো, গাছের একটি ফেকড়ী দেখা দিয়েছে। দেহাভিমান যায না। তাই ভক্তিযোগ কলির পক্ষে ভাল, সহজ।'

একজন ভক্ত প্রশ্ন করলেন, 'মহাশয়, বিদ্যাসাগরকে দেখেছেন, কি রকম বোধ হল?'
শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য আছে, দয়া আছে; কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি নাই। অন্তরে সোনা চাপা আছে, যদি সেই সোনার সন্ধান পেতো, এতো বাহিরের কায যা কচ্চে সেসব কম পড়ে যেতো; শেষে একেবারে ত্যাগ হয়ে যেতো।...'

মণি (অর্থাৎ শ্রীম.) জিজ্ঞাসা করলেন, 'তিনি কৃপা করলে তো ছুঁচের ভিতর উট যেতে পারে?'
শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'কিন্তু কৃপা কি অমনি হয়? ভিখারী যদি পয়সা চায় দেওয়া যায়। কিন্তু একেবারে যদি রেল ভাড়া চেয়ে বসে!'

বেলঘরের গোবিন্দ মুখুজ্যের প্রতিবেশী জিজ্ঞাসু হলেন, 'আমরা পাপী, আমাদের কি হবে?'
শ্রীরামকৃষ্ণ জানালেন, 'তাঁর নামগুণ কীর্তন করলে দেহের সব পাপ পালিয়ে যায়। দেহ-বৃক্ষে পাপ পাখী; তাঁর নামকীর্তন যেন হাততালি দেওয়া। হাততালি দিলে যেমন বৃক্ষের উপরের পাখি সব পালায়, তেমনি সব পাপ তাঁর নামগুণ কীর্তনে চলে যায়।'

ঈশ্বর ও ঐশ্বর্যের কথায় ঠাকুর বলছিলেন, 'কিন্তু ঐশ্বর্য দেখেই সকলে ভুলে যায়, যাঁর ঐশ্বর্য তাঁকে খোঁজে না। কামিনী কাঞ্চন ভোগ করতে সকলে যায়; কিন্তু দুঃখ অশান্তিই বেশি।
একজন ভক্ত (সম্ভবত শ্রীম.) প্রশ্ন করলেন, 'এখন উপায়?'
শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'উপায়—সাধুসঙ্গ আর প্রার্থনা। বৈদ্যের কাছে না গেলে রোগ ভাল হয়না। সাধুসঙ্গ একদিন করলে হয় না, সর্বদাই দরকার; রোগ লেগেই আছে।...
পুনরায় প্রশ্ন হলো, 'সাধুসঙ্গে কি উপকার হয়?'
ঠাকুর জানালেন, 'ঈশ্বরে অনুরাগ হয়। তাঁর উপর ভালবাসা হয়। ব্যাকুলতা না এলে কিছুই হয়না। সাধুসঙ্গ করতে করতে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়।...আর একটি উপায় আছে—ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা। তিনি যে আপনার লোক, তাঁকে বলতে হয়, তুমি কেমন, দেখা দাও—দেখা দিতেই হবে—তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ কেন?...সাধুসঙ্গ করলে আর একটি উপকার হয়। সদসৎ বিচার। সৎ, নিত্য পদার্থ অর্থাৎ ঈশ্বর।

অসৎ অর্থাৎ অনিত্য। অসৎ পথে মন গেলেই বিচার করতে হয়।...'
প্রতিবেশী জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহাশয়, পাপ বুদ্ধি কেন হয়?'
শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'তাঁর জগতে সকল রকম আছে। সাধু লোকও তিনি করেছেন, দুষ্ট লোকও তিনি করেছেন। সদ্‌বুদ্ধি তিনিই দেন, অসদ্‌বুদ্ধিও তিনি দেন।'
প্রতিবেশী বললেন, 'তবে পাপ করলে আমাদের কোন দায়িত্ব নাই।'
ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'ঈশ্বরের নিয়ম যে পাপ করলে তার ফল পেতে হবে। লঙ্কা খেলে তার ঝাল লাগবে না?...'

হাজরা প্রশ্ন করলেন, '(ভক্তি) প্রার্থনা করলে তিনি শুনবেন?'
শ্রীরামকৃষ্ণ জানালেন, 'এক-শো-বার!—যদি ঠিক হয়—যদি আন্তরিক হয়। বিষয়ী লোক যেমন ছেলে কি স্ত্রীর জন্য কাঁদে সেরূপ ঈশ্বরের জন্য কই কাঁদে?'

এক মাড়োয়ারি ভক্তের জিজ্ঞাস্য—'মহারাজ মরলে কি হয়?'
শ্রীঠাকুর উত্তর দিলেন—'গীতার মতে, মরবার সময় যা ভাববে, তাই হবে। ভরত রাজা হরিণ ভেবে হরিণ হয়েছিল। তাই ঈশ্বরকে লাভ করবার জন্য সাধন করা চাই। রাত দিন তাঁর চিন্তা করলে মরবার সময়ও সেই চিন্তা আসবে।'

দক্ষিণেশ্বর নিবাসী যুবক জানতে চাইলেন, 'মহাশয়, জ্ঞান কাকে বলে?'
শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'ঈশ্বর সৎ, আর সমস্ত অসৎ; এইটি জানার নাম জ্ঞান।
যিনি সৎ তাঁর একটি নাম ব্রহ্ম, আর একটি নাম কাল (মহাকাল)। তাই বলে—'কালে কত গেল—কত হলো রে ভাই।'...
সেই সৎ স্বরূপ ব্রহ্ম নিত্য—তিন কালেই আছেন—আদি অন্ত রহিত। তাঁকে মুখে বর্ণনা করা যায় না। হদ্দ বলা যায়—তিনি চৈতন্যস্বরূপ,

আনন্দস্বরূপ।

জগৎ অনিত্য, তিনিই নিত্য। জগৎ ভেল্কীস্বরূপ। বাজীকরই সত্য। ভেল্কী অনিত্য।'

পুনরায় প্রশ্ন—'জগৎ যদি মায়া—ভেল্কী—এ মায়া যায় না কেন?'

উত্তর—'সংস্কার-দোষে মায়া যায় না। অনেক জন্ম এই মায়ার সংসারে থেকে থেকে মায়াকে সত্য বলে বোধ হয়।

সংস্কারের কত ক্ষমতা শোন। একজন রাজার ছেলে পূর্বজন্মে ধোপার ঘরে জন্মেছিল। রাজার ছেলে হয়ে যখন খেলা করছে, তখন সমবয়সী-দের বল্‌ছে, ওসব খেলা থাক। আমি উপুড় হয়ে শুই, আর তোরা আমার পিঠে হুস্‌ হুস্‌ করে কাপড় কাচ্‌।'

রহস্য কৌতুক পরিহাসে

ঈশ্বরের সঙ্গে, ব্রহ্মের সঙ্গে যাঁর নিত্য যোগ, বাহ্য অবস্থায় সদা যিনি ভগবদ্ প্রসঙ্গে বাঙ্ময়, যিনি বেদান্তের মূর্ত বিগ্রহ, ঈশ্বরীয় বিষয় যাঁর প্রাণের আরাম, তিনি আবার কি রসিক পুরুষ! সুস্মিত হাস্যকৌতুকে কি আনন্দঘন। রহস্য পরিহাসে কি মুখরিত, উচ্ছ্বসিত। তাও এক বিচিত্র বিস্ময়!

অথবা তা-ই হয়ত স্বাভাবিক। ব্রহ্মজ্ঞ সত্তা এবং রসময় সত্তার সহাবস্থান। কোন বৈপরীত্য নেই দুই স্ব-ভাবে। কারণ রসস্বরূপ ব্রহ্ম যিনি আস্বাদন করেন, উপলব্ধি করেন তাঁর পক্ষে বিরস বিশুষ্ক থাকাই অসম্ভব।

'আমায় রসে বশে রাখিস মা, আমায় শুকনো সন্ন্যাসী করিস নি'— তাঁর এই প্রার্থনা কি জগজ্জননী অপূর্ণ রাখতে পারেন?

ভারতীয় সন্ন্যাসীর আনন্দিত প্রাণ। সন্ন্যাসের পরাকাষ্ঠা শ্রীরামকৃষ্ণও অফুরন্ত কৌতুকী। তিনি কথায় কথায় হাস্য পরিহাসে প্রাণোচ্ছল। তাঁর উপচীয়মান রসধারায় সকল অন্তরঙ্গ, ভক্তমণ্ডলী নিষ্ণাত।

তাঁর চিত্তরঞ্জিনী সরস বাক্‌পটুতায় আকৃষ্ট, মুগ্ধ সমাগত জন।

তত্ত্বকথায় তিনি যেমন সদা প্রস্তুত, তেমনি রসিকতাতেও। এমন কি ভাবগভীর আলোচনাদির মধ্যেও ক্ষণে ক্ষণে তাঁর কৌতুকী বাচনে আমোদিত, চমকিত করেছেন শ্রোতাদের। রস সিঞ্চনে তাঁর কথিত বিষয়বস্তু আরো আকর্ষক হয়ে ওঠে। হর্ষোৎফুল্ল পরিমণ্ডল। যেমন বাচস্পতি তেমনি রসরাজ কথক শ্রীরামকৃষ্ণ।

'ফচ্‌কিমিতেও আপনার সঙ্গে পারলুম না।'

স্বয়ং গিরিশচন্দ্র একদিন স্বীকার করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে।

নাট্যাচার্য তখন পরিণত বয়সী। চল্লিশ বছর পার হয়ে গেছেন। যিনি নিজে কত হাস্য কৌতুকের মনোরঞ্জক চরিত্র, সাংলাপ সৃষ্টি করেন তাঁর বিভিন্ন নাটকে, প্রহসনে, গীতিনাট্যে, পঞ্চরঙে। যাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে নরেন্দ্রনাথ পর্যন্ত ঠাকুরকে জানিয়েছিলেন, 'গিরিশ ঘোষের সঙ্গে আলাপ হল, খুব বড় লোক।' এখানে 'বড়লোক' অর্থ মহা জ্ঞানী গুণী।'

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে রসিকতায় গিরিশচন্দ্র কি করে পাল্লা দেবেন? পরম রসস্বরূপ ঈশ্বরের জ্ঞানী শ্রীঠাকুর। নিত্য রসিক তাঁর চিত্ত। স্বতঃস্ফূর্ত তাঁর কৌতুকের প্রকাশ।

ভারতীয় ঋষিবাক্য আনন্দরূপমৃইতম যদ্‌বিভাতি। হাস্য পরিহাস রহস্য কৌতুকপ্রিয়তা শ্রীঠাকুরের কবি-স্বভাব, তাঁর বিদগ্ধ চিত্তের গুণ। সদানন্দময় তিনি। আনন্দমণ্ডিত তাঁর বৈরাগ্য।

গিরিশচন্দ্রের তুল্য যাঁরাই ঠাকুরের সুপরিচিত—সাধারণ থেকে অনন্য বিশিষ্ট, সকলেই তাঁর রহস্য কৌতুকের পারিপাট্যে চমৎকৃত। যেমন 'রাশ ঠেলে দেয়া' তাঁর অনর্গল দিব্য বাণীর ধারা, তেমনি তার মধ্যে অজস্র রস-পরিহাসের ঝলক।

কেশবচন্দ্র সেনও সুরসিক। তাই তাঁর সঙ্গেও ঠাকুরের মনোরম কৌতুকালাপ।

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ গেছেন জয়গোপাল সেনের বেলঘর বাগান বাড়িতে। কেশবচন্দ্রের সেই সাধনাশ্রমে। যেমন সেখানে তিনি মাঝে মাঝে যেতেন কেশবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

সেদিন তিনি লাল-পাড কাপড় পরেছিলেন। অবশ্য বেশির ভাগ লাল পাড়ই থাকত তার পরণে।

তাই দেখে কেশব সহাস্যে বললেন, 'আজ বড যে রঙ, লাল পাড়ের বাহার।'

ঠাকুরও তখনি উত্তর দিলেন, 'কেশবের মন ভুলাতে হবে তাই বাহার দিয়ে এসেছি।'

অন্তর্দিনও কি তিনি কম রহস্য করেছেন সেন মহাশয়ের সঙ্গে ?

একদিন কেশবচন্দ্র সদলে দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। কথাবার্তায় রাত হয়ে গেল প্রায় এগারটা।

তাঁর প্রধান পার্ষদ প্রতাপ মজুমদার বললেন, 'আজ এখানে থেকে গেলে হয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণও সমর্থন করলেন তাঁকে। কেশবকে বললেন, 'আজ থাকো না।'

কিন্তু তিনি গররাজি হলেন, 'কাজ-টাজ আছে ; যেতে হবে।'

অমনি শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'কেন গো, তোমার আঁশ চুপড়ির গন্ধ' না হলে কি ঘুম হবে না ?'

কেশবচন্দ্রের 'কাজ-টাজ' কথার ধার দিয়েও গেলেন না। রাত্রে কেবল সুনিদ্রার ব্যাপার বলে দিলেন একেবারে। বিবাহিত ব্যক্তির নিশি যাপন নিয়ে সরস ইঙ্গিত করলেন। 'আঁশ চুপড়ির' ব্যাখ্যাকারী গল্পটিও শুনিয়ে দিলেন সেই সঙ্গে। এক মেছুনী তার মালী বন্ধুর বাড়িতে অতিথি। রাতে তাকে শুতে দেয়া হয়েছে ফুলের ঘরে। কিন্তু ফুলের গন্ধে তার কিছুতেই ঘুম এলো না। তখন সে মালীকে বললে, তার আঁশ চুপড়িটা আনিয়ে দিতে। সেটি এনে তার বিছানার পাশে রাখা হল। মেছুনী জল ছিটিয়ে দিলে তার ওপর। আর সেই গন্ধ নাকে যেতেই মেছুনী ঘুমিয়ে পড়ল।

শুনে সবাইকার সঙ্গে হেসে উঠলেন কেশবও।

কৌতুক শুধু ঘরোয়াভাবেই নয়। সমাজ মন্দিরে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতার ব্যাপারেও উচ্ছ্রিত হয়ে ওঠে ঠাকুরের সরস উক্তি।

একদিন কেশব উপাসনাকালে বলছিলেন, 'হে ঈশ্বর এই কর যেন আমরা ভক্তি নদীতে ডুব দিতে পারি, আর ডুব দিয়ে যেন সচ্চিদানন্দ সাগরে গিয়ে পড়ি।'

সভায় চিকের অন্তরালে ছিলেন ব্রাহ্ম মহিলারা।

সেদিকে উদ্দেশ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'তোমরা সবাই একেবারে ডুব

দিলে কি হবে! তা হলে এঁদের দশা কি হবে? এক একবার আড়ায় উঠো; আবার ডুব দিও, আবার উঠো!'

সদা রসময় শ্রীরামকৃষ্ণ। রসিকতার প্রসঙ্গেই তা বিচ্ছুরিত হয়, তা নয়। যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথনে, যে কোন অনুষঙ্গেই তা ঝলকিত হতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গেও আকস্মিক আলাপ। কিন্তু তাঁর নাম শোনামাত্র কেমন কৌতুক মুখর হয়েছিলেন। বাকপটু বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কথাবার্তায়ও প্রকাশ পায় কত বুদ্ধিদীপ্ত তাঁর পরিহাস।

তেমনি শশধর তর্কচূড়ামণির সঙ্গেও। একদিন পণ্ডিত মহাশয় ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে এলেন বলরাম বসুর বাড়িতে।

ঠাকুর তাঁকে দেখেই সহাস্যে বললেন, 'আমরা সকলে বাসকসজ্জা জেগে আছি—কখন বর আসবে।'

বাসকসজ্জা—রীতিমত পরিশীলিত বাক্য প্রয়োগ। আর পণ্ডিত ব্যক্তিকে সুন্দর রসিকতায় সম্মান জ্ঞাপন করা। উপস্থিত সকলেরই বিশেষ উপভোগ্য হল। তর্কচূড়ামণির তো বটেই।

আরেক দিনও শশধরের ব্যক্তিত্বকে কি বিচক্ষণভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন তাঁরই কাছে। তাঁর পাণ্ডিত্য আছে বটে। কিন্তু তা কিঞ্চিৎ শুষ্ক। ঈশ্বর ভক্তি প্রীতির এবং বিবেকের রসে তা জারিত হওয়া প্রয়োজন। একথাই রসাল উপমাযোগে পণ্ডিত মহাশয়কে জানিয়েছিলেন, সহাস্যে—'তুমি ছানাবড়া হয়ে আছ। এখন দু-পাঁচদিন রসে পড়ে থাকলে তোমার পক্ষেও ভাল, পরেরও ভাল। দু-পাঁচদিন।'

শশধর একটু হেসে বিনয় প্রকাশ করে বললেন, 'ছানাবড়া পুড়ে অঙ্গার হয়ে গিয়েছে।'

তাঁর জ্বলে যাবার কথা মেনে নিলেন না শ্রীরামকৃষ্ণ। ছানাবড়ার বর্ণ জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ নয়। তার সঠিক বর্ণনায় সহাস্যে জানালেন, 'না, না; আরশুলার রঙ হয়েছে।'

বহু বৃহৎ সভার সফল বাগ্মী তর্কচূড়ামণি আর প্রত্যুত্তর করতে পারলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। ত্যাগ ও জ্বলন্ত বৈরাগ্যের মূর্ত প্রতীক। ঈশ্বরীয় অনুভাবে নিয়ত অনুপ্রাণিত। কিন্তু কি অন্তর্ভেদী পর্যবেক্ষণ শক্তি—সমাজের সর্বস্তরের মানুষের, সর্বপ্রকার স্ত্রী ও পুরুষের। আর সকলের হাস্যকর প্রসঙ্গ চিত্রের তুল্য কি নিখুঁত অভিনয়ে প্রকাশ করেন তিনি। শোকের ছলনার কি হুবহু রূপ ও ভাষা একদিন ফোটালেন,—'একটা মাগীর ভারি শোক হয়েছিল। আগে নৎটা কাপড়ের আঁচলে বাঁধলে; —তারপর, 'ওগো আমার কি হল গো', বলে আছড়ে পড়লো। কিন্তু খুব সাবধান, নৎটা যেন ভেঙে না যায়।'

আরেকদিনও এই রসিকতার দৃশ্য দেখালেন ভক্তদের সামনে। 'অনেকে ঢঙ্ করে শোক করে। কাঁদতে হবে জেনে আগে নৎ খোলে আর গহনা খোলে; খুলে বাক্সের ভিতর চাবি দিয়ে রেখে দেয়। তারপর আছড়ে এসে পড়ে, আর কাঁদে, 'ওগো দিদি গো, আমার কি হল গো।' এ শুধুই ভণ্ডামীকে ব্যঙ্গ কৌতুক করা নয়। এর মধ্যে তত্ত্ব কথাও এই আছে যে, কারো কারো ধারণা, বিষয় আশায় সব ঠিকঠাক বন্দোবস্ত করে দেবার পর ঈশ্বর চিন্তা করব, বৈরাগ্যবান হব। কিন্তু এমন প্রস্তুতি করে আসে না প্রকৃত বৈরাগ্য। এ হল নকল এবং কৃত্রিম বৈরাগ্য।

এমনি ধরনের কৌতুকাভিনয়েও সুদক্ষ ঠাকুর। একদিন কি নিপুণভাবে দেখান কীর্তন গায়িকার ঢঙ্। সম্প্রদায়ে কেমন সাজগোজ করে কীর্তনী গান গায়। কি ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে। হাতে রঙীন রুমাল, মাঝে মাঝে কাশছে ঢঙ্ করে। আবার কোন বিশিষ্ট শ্রোতা এলে, অভ্যর্থনা করে বলছে, 'আসুন।' কখনো বা হাতের কাপড় সরিয়ে দেখাচ্ছে তার গহনা—অনন্ত, বাউটি।

এই সবের তাঁর নিখুঁত অভিনয় বা নকল করা দেখে উচ্চহাস্য করেন দর্শকরা।

আবার পূজা অর্চনা করবার সময় কেউ কেউ কেমন ইশারায় কথা বলে। কেউ কোনো জিনিসের দরদস্তুর করে মালা জপ করতে করতে। এসবও দেখান নাটকের মতন। ধর্মাচরণে আন্তরিকতার অভাবের

সরস চিত্র।

'অনেকে আহ্নিক করবার সময় যত রাজ্যের কথা কয়; কিন্তু কথা কইতে নাই;—তাই ঠোঁট বুজে যত প্রকার ইশারা করতে থাকে। এটা নিয়ে এস, ওটা নিয়ে এস, হুঁ, উঁহুঁ—এইসব করে।'

'আবার কেউ মালা জপ করছে; তার ভিতর থেকেই মাছ দর করে। জপ করতে করতে হয়ত আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—ঐ মাছটা। যত হিসাব সেই সময়ে।'

তেমনি একদিন দেখালেন মাতাল চরিত্র। সেদিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে প্রসঙ্গ করছিলেন। নানা তত্ত্বকথার মধ্যে এইসব লৌকিক নির্দেশও দিলেন গোস্বামী মহাশয়কে—এই ক'টি থেকে সাবধান হতে হয়—

'এক, বড়লোক। তার অনেক টাকা, লোকবল—অনিষ্ট করতে পারে। দুই, কুকুর। তেড়ে এলে মুখের আওয়াজ করে ঠাণ্ডা করতে হয়। তিন, ষাঁড়। গুঁতোতে এলে তাকেও তুষ্ট করা এইভাবে। আর মাতাল—রাগিয়ে দিলে সে গাল দেবে চোদ্দ পুরুষ তুলে। তাকে বলতে হয়, কি খুড়ো, কেমন আছো? তাহলে খুব খুশী হবে, তোমার কাছে বসে তামাক খাবে।'

আবার স্ত্রৈণ লোকদের বর্ণনা করেন কি কৌতুকাবহ।

'কামিনী কাঞ্চনই ঈশ্বর থেকে মানুষকে বিমুখ করে। সেদিকে যেতে দেয় না। এই দেখ না, সকলেই নিজের পরিবারকে সুখ্যাত করে। তা ভালই হোক আর মন্দই হোক,—যদি জিজ্ঞাসা কর তোমার পরিবারটি কেমন গা, অমনি বলে, আজ্ঞে খুব ভাল।'

এমনি সব চরিত্রাভিনয়ে সজীব তাঁর কথোপকথন। সংসারবদ্ধ জীবদের কি অব্যর্থভাবে লক্ষ্য করার ক্ষমতা ক্ষণকালের মধ্যে। আবার ভাষা তথা ভাবভঙ্গীতেও কি নিখুঁতভাবে চিত্রায়ণ। এ বিষয়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ ভক্তদেরও নিস্তার নেই। সকলের সম্পর্কেই ঠাকুরের সকৌতুকে দার্শনিক দৃষ্টি।

তাঁর অমন প্রিয় ভক্ত, নেপালের রাজকর্মচারী বিশ্বনাথ উপাধ্যায়।

তাঁর আদরের 'কাপ্তেন।' কিন্তু তাঁরও পারিবারিক পরিস্থিতি ওই রকম। কিছুই ঠাকুরের দৃষ্টি এড়ায় না। শুধু পুরুষের স্ত্রৈণতা নয়। অর্থে গৃহকর্ত্রীর দারুণ আসক্তির নকল করে অট্টহাস্য জাগাতে পারেন তিনি।
'সকলকেই দেখি মেয়েমানুষের বশ। কাপ্তেনের বাড়ি গিছলাম ; তার বাড়ি হয়ে, রামের বাড়ি যাব। তাই কাপ্তেনকে বললাম, 'গাড়ি ভাড়া দাও।' কাপ্তেন তার মাগকে বল্লে। সে মাগও তেমনি—'ক্যা হুয়া' 'ক্যা হুয়া' করতে লাগল। শেষে কাপ্তেন বল্লে যে, ওরাই (রামেরা) দেবে। গীতা ভাগবত বেদান্ত সব ওর ভিতরে।'
অর্থাৎ, বিশ্বনাথ উপাধ্যায় গীতা ভাগবত বেদান্তাদি শাস্ত্রের চর্চা করে থাকেন বটে। কিন্তু তাঁর সব বিদ্যা ওই অবিদ্যা স্ত্রীর অন্তর্ভুক্ত!
'টাকাকড়ি সর্বস্ব সব মাগের হাতে! আবার বলা হয়, 'আমি দুটো টাকাও আমার কাছে রাখতে পারি না—কেমন আমার স্বভাব!'
সাধারণ সংসারী সম্পর্কে এই তাঁর ব্যঙ্গাত্মক মূল্যায়ন—'যাকে জিজ্ঞাসা করি, সে-ই বলে আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার স্ত্রীটি ভাল। একজনেরও স্ত্রী মন্দ নয়।'
এমন সুরসিক দর্শক ও কথক তিনি। 'নারী মহামায়ার অংশ, জগজ্জননীর প্রতিরূপ' ইত্যাদিও যাঁর উক্তি। ওসব হল 'অবিদ্যারূপিণী স্ত্রী।' বিদ্যারূপিণীকে তাঁর চেয়ে শ্রদ্ধা ও সম্মান আর কে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি বিলক্ষণ জানেন বিদ্যা ও অবিদ্যার অস্তিত্ব এবং পার্থক্য।
তাই তো আরো স্পষ্ট করে একদিন বললেন, 'দেখ না মেয়েমানুষের কি মোহিনী শক্তি, অবিদ্যারূপিণী মেয়েদের। পুরুষগুলোকে যেন বোকা অপদার্থ করে রেখে দেয়। যখনই দেখি স্ত্রী-পুরুষ এক সঙ্গে বসে আছে, তখন বলি, আহা! এরা গেছে।' তারপর একটি দৃষ্টান্ত দেন। 'হারু এমন সুন্দর ছেলে, তাকে পেত্নীতে পেয়েছে!—'ওরে হারু কোথা গেল, ওরে কোথা গেল, আর হারু কোথা গেল!' সব্বাই গিয়ে দেখে, হারু বটতলায় চুপ করে বসে আছে। সে রূপ নাই, সে তেজ নাই, সে আনন্দ নাই। বটগাছের পেত্নীতে হারুকে পেয়েছে।

স্ত্রী যদি বলে, 'যাও তো একবার'—অমনি উঠে দাঁড়ায়, 'বসো তো'—অমনি বসে পড়ে।'

ঠাকুরের কৌতুক সবাইকে নিয়ে। সকল উপলক্ষে। কারণ সদা আনন্দ-রসে সিক্ত তাঁর চিত্ত। পক্ষপাতশূন্য। অতি প্রিয় শিষ্যও পরিহাসের পাত্র হতে পারেন, তেমন অবস্থা সৃষ্টি করলে। আবার অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ আলোচনার পর-মুহূর্তেই হাস্যমুখর দেখা যেতে পারে ঠাকুরকে।

একদিন দক্ষিণেশ্বরের ঘরে ভক্তদের সঙ্গে রয়েছেন। নরেন্দ্র পরপর পাঁচখানি অধ্যাত্ম সঙ্গীত শোনালেন তাঁর কথায়। তারপর ভবনাথ গাইলেন—'দয়াঘন তোমা হেন কে হিতকারী···'

গানের পরে ভবনাথকে যখন বলছিলেন, 'কামিনী কাঞ্চন ত্যাগই যথার্থ ত্যাগ···', হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—'রাখাল কোথায় ?'

একজন ভক্ত (সম্ভবত শ্রীম.) জানালেন—'আজ্ঞা, রাখাল ঘুমুচ্ছেন।'

অমনি ঠাকুর হাসতে হাসতে একটি গল্প-কণা (এসব কি তাঁরই তাৎ-ক্ষণিক রচনা ?) শোনালেন—'একজন বগলে করে মাদুর এনে যাত্রা শুনতে এসেছিল। যাত্রার দেরি দেখে মাদুরটি পেতে ঘুমিয়ে পড়লো। যখন উঠলো তখন সব শেষ হয়ে গেছে।'

শুনে সবাই হাসতে লাগলেন।

আরো একটু যোগ করলেন তিনি—'তখন মাদুর বগলে করে বাড়ি ফিরে গেল।'

বলবার ধরনে, আবার একচোট হাসি হলো শ্রোতাদের। নরেন্দ্রের পরই রাখাল ঠাকুরের প্রিয়তম।

সিঁথির গোপালচন্দ্র ঘোষও তো তাঁর প্রিয় শিষ্য ! তাঁর সাদর অভিধা—'বুড়ো গোপাল।'

একদিন দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী তলায় কীর্তনের আসর বসেছে। কীর্তন গাইছেন সহচরী নামে গায়িকা। ঠাকুর বুড়ো গোপালের জিম্মায় ছাতাটি রেখেছেন।

হঠাৎ ঝড় উঠতে, কীর্তনের আসর ভঙ্গ হলো পঞ্চবটীতে। সবাই শ্রীরাম-

কৃষ্ণের কক্ষে চলে এলেন। ঘরেই গান হবে এবার।

ঠাকুর গোপালকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাগা ছাতিটা এনেছ ?'

'আজ্ঞা না, গান শুনতে শুনতে ভুলে গেছি !'

শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করলেন, নিজেকেও রেহাই দিলেন না সেই সঙ্গে—'আমি ত এত এলোমেলো, তবু অত দূর নয় !'

আবার রাখালের কথাও জুড়ে দিলেন—'রাখাল এক জায়গায় নিমন্ত্রণের কথায় ১৩ই বলে ১১ই।'

তারপর গোপাল নামের ব্যাখ্যা শোনালেন—'গোপাল—গোরুর পাল !'

আবার সেই স্যাকরাদের দোকানে 'কেশব কেশব' 'গোপাল গোপাল' গল্পটিও শুনিয়ে দিলেন, বুড়ো গোপালকে কৌতুকে একেবারী ধরাশয়ী করে।

'মাস্টার' বা শ্রীম. তো অত অন্তরঙ্গ ভক্ত। কিন্তু সুযোগ এলেই তাঁকে নিয়েও কত রঙ্গ রহস্য।

যখন মহেন্দ্রনাথ প্রথম প্রথম এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে, তখনো।

সেদিন তিনি চতুর্থবার শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে উপনীত হয়েছেন, প্রথম দর্শনের দশ দিনের মধ্যেই। ঠাকুর তখন ভবনাথ প্রমুখের সঙ্গে ঘরে কথাবার্তা বলছিলেন।

শ্রীম.-কে আসতে দেখেই উচ্চহাস্যে বলে উঠলেন, 'ঐ রে আবার এসেছে।'

সবাই হাসতে লাগলেন তাঁর মুখ চোখের ভঙ্গিমায় আর কথার ধরনে। তখন তিনি বক্তব্যের ভাষ্যও শোনালেন—'দেখ, একটা ময়ূরকে বেলা চারটার সময় আফিম খাইয়ে দিয়েছিল। তার পর দিন ঠিক চারটার সময় ময়ূরটা উপস্থিত—আফিমের মৌতাত ধরেছিল—ঠিক সময়ে আফিম খেতে এসেছে।'

পুনরায় সকলের হাস্য। কিন্তু কথাটি নিছক সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব ও বাণী আফিমের মৌতাতেরই মতন আকর্ষক হয়েছিল মহেন্দ্রনাথের

পক্ষে। শ্রীম. স্বয়ং তখনকার কথা এইভাবে প্রকাশ করেছেন—'মাস্টার মনে মনে ভাবিতেছেন, ইনি ঠিক কথাই বলিতেছেন। বাড়িতে যাই কিন্তু দিবানিশি ইঁহার দিকে মন পড়িয়া থাকে—কখন দেখিব, কখন দেখিব। এখানে কে যেন টেনে আনলে! মনে করলে অন্য জায়গায় যাবার যো নাই, এখানে আসতেই হবে। এইরূপ ভাবিতেছেন, ঠাকুর এবার ছোকরাগুলির সহিত অনেক ফষ্টিনষ্টি করিতে লাগিলেন, যেন তারা সমবয়স্ক। হাসির লহরী উঠিতে লাগিল। যেন আনন্দের হাট বসিয়াছে।'

শুধু সেদিনই নয়। ঠাকুরের আনন্দের হাট প্রত্যহ। তাঁর কক্ষে, কিংবা অন্য যেখানে তিনি উপস্থিত হন সেখানে। তাঁর কথোপকথনে, তার হাবভাবে কৌতুক পরিহাসের প্রাণচ্ছটা। সব প্রসঙ্গের মধ্যে বিকীর্ণ শুভ্র হাস্যের রশ্মি। গভীর তত্ত্বকথার মধ্যেও রঙ্গরসের নির্ঝর।

তাঁর একটি ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ থেকে যেন তাঁর নিজেরও এ আভাস পাওয়া যায়—'যদি বলো ভগবান নিজে লীলা করছেন, সেখানে জটিলা কুটিলার কি দরকার? জটিলে কুটিলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় না। (সকলের হাস্য)। জটিলে কুটিলে না থাকলে রগড় হয় না।' (উচ্চ হাস্য)।

যেমন বলছেন—'শাস্ত্র শুধু পড়লে হয় না। কামিনী কাঞ্চনের মধ্যে থাকলে শাস্ত্রের মর্ম বুঝতে দেয় না। সংসারের আসক্তিতে জ্ঞান লোপ হয়ে যায়।'

এই 'সংসারের আসক্তি'র কথায় এসে গেল তাঁর রসিকতা—ছড়া কেটে বললেন—

'সাধ করে শিখেছিলাম কাব্য রস যত,
কালার পীরিতে পড়ে সব হইল গত।'

সংসারের পাকে চক্রে বিভ্রান্ত হয় জ্ঞানী ব্যক্তিও। ঠাকুর তারও ছড়া শুনিয়ে দেন—

'অন্নচিন্তা চমৎকারা,
কালিদাস হন বুদ্ধিহারা।'

আবার অপরের তর্কের মধ্যেও প্রক্ষিপ্ত করেছেন কৌতুক। আর তারই প্রভাবে বিতর্ক মীমাংসার পথে আসে। এমন দেখা গেছে অনেকদিন। তেমনি এক দিনের কথা।

তখন ক্যান্সার চিকিৎসার জন্যে তাঁকে শ্যামপুকুর বাড়িতে রাখা হয়েছে। সেদিন তাঁর ঘরে তর্ক হচ্ছে ডাক্তার মহেন্দ্রলালের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের। ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব স্বীকার করছেন না।

ঈশান মুখুজ্যে সে সময় বলছেন ডাক্তারকে, 'আপনি অবতার মানছেন না কেন? এই বললেন, যিনি আকার করেছেন তিনি সাকার, যিনি মন করেছেন তিনি নিরাকার। এই আপনি বললেন, ঈশ্বরের কাণ্ড সব হতে পারে।'

ঠাকুর তখন হাসতে হাসতে বললেন, 'ঈশ্বর অবতার হতে পারেন, এ কথা যে ওঁর সায়েন্সে নাই। তবে কেমন করে বিশ্বাস হয়?'

সকলে হাসলেন। তিনি আবার বললেন (সম্ভবত তখনই স্বরচিত) 'একটা গল্প শোন। একজন এসে বললেন, ওহে! ও পাড়ায় দেখে এলাম অমুকের বাড়ি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গেছে। যাকে ও কথা বললেন, সে ইংরাজী লেখাপড়া জানে। সে বললে, দাঁড়াও, একবার খপরের কাগজখানা দেখি। খপরের কাগজ পড়ে দেখে যে, বাড়ি ভাঙার কথা কিছুই নাই। তখন সে ব্যক্তি বললে, ও হে তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করি না। কই বাড়ি ভাঙার কথা তো খপরের কাগজে লেখে নাই। ওসব মিছে কথা।'

এখানে 'সায়েন্স' অর্থে পুঁথিগত বিদ্যা বলেছেন। বই বিদ্যার অপূর্ণতা, তার প্রতি একান্ত নির্ভরতার ভ্রান্তি—তাঁর বক্তব্য।

এই রকম একেকটি ইংরেজী শব্দ বেশ সুষ্ঠুভাবে ঠাকুর প্রয়োগ করেন। ইংরেজীটা জোর দিযে বলার জন্যেই হয় রসসৃষ্টি। যেন কৌতুক করবার জন্যেই ইংরেজী শব্দটি জুতসই করে বলেন।

যেমন একদিন শোনা যায় সুপরিচিত যাত্রাপালার অধিকারী নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথায়। অমন প্রসিদ্ধ পেশাদার গায়ক তিনি।

সেদিনই দক্ষিণেশ্বরে অন্য এক বাড়িতে মুজরো করেছেন। তারপর শ্রীরামকৃষ্ণকে গান শোনাতে এসেছেন তাঁর ঘরে। কিন্তু ঠাকুর তো তাঁকে দক্ষিণা দিতে অসমর্থ।

তাই নীলকণ্ঠকে সম্মান জানিয়ে, অথচ সবিনয়ে বললেন, 'তুমি সকালে অত গাইলে, আবার এখানে এসেছ কষ্ট করে। এখানে কিন্তু অনারারি।'...

সাধারণ ভোগী ব্যক্তির ঈশ্বরের নাম করা যে ক্ষণিক সখের মতন, সে ভাব যে অস্থায়ী, এ কথাও কেমন ছবির মতন বাবু চরিত্রের বর্ণনা দিয়ে বোঝান, এমনি দুটি ইংরেজী শব্দ যোগে—

'যেমন কোন ফিটবাবু, পান চিবুতে চিবুতে, স্টিক হাতে করে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে একটি ফুল তুলে বন্ধুকে বলে—ঈশ্বর কি বিউটিফুল ফুল করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ীর ঈশ্বরভাব ক্ষণিক, যেন তপ্ত লোহার উপর জলের ছিটে।'

এখানে স্টিক আর বিউটিফুল শব্দ দুটি না দিলে 'বাবু'টিকে নিয়ে তামাসা ঠিক ফুটত না।

এমনি আরো দেখা যায় তাঁর ইংরেজীর সকৌতুক ব্যবহার।

একদিন নরেন্দ্র তাঁর সামনে একটি ইংরেজী বাক্য বললেন শ্রীম-কে। হ্যামিলটন্ থেকে উদ্ধৃতি।

ঠাকুর শ্রীম-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'এর মানে কি গা?'

নরেন্দ্র তাঁকে অর্থ বললেন—'ফিলজফি পড়া শেষ হলে মানুষটা পণ্ডিত মূর্খ হয়ে দাঁড়ায়, তখন ধর্ম ধর্ম করে। তখন ধর্মের আরম্ভ হয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বললেন—'থ্যাঙ্ক্ ইউ! থ্যাঙ্ক ইউ!'

যেমন আরেকদিন শ্যামপুকুরে। তিনি ডাক্তারকে 'নেতি' 'নেতি' বোঝাচ্ছেন, একটি উপযুক্ত উপমা-গল্পের যোগে। মহেন্দ্রলাল বললেন, 'এসব বেশ কথা।'

ঠাকুর হেসে বললেন, 'একটা থ্যাঙ্ক ইউ দাও।'..

তেমনি একদিন শশধরকে বলছিলেন, 'গুচ্ছির শাস্ত্র পড়লে কি হবে?

ক্যালজফি।'...

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীম. সেদিন তাঁকে এক সম্প্রদায়ের কিছু বিরুদ্ধ মন্তব্য শোনান। বলেন, 'আপনি দল চালাতে জানেন না। আপনার বুদ্ধি কম, এই কথা বলে।'

এসব শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন রাম দত্তকে, 'এখন বল দেখি, আমার হাত কেন ভাঙ্‌ল? তুমি এই নিয়ে দাঁড়িয়ে একটা লেকচার দাও।'

'লেকচার' শব্দটির প্রয়োগ এবং বলবার ধরনেই কৌতুক সৃষ্টি হলো। সমালোচক সম্প্রদায়টিতে যে বক্তৃতা হয় সে ব্যঙ্গও প্রচ্ছন্ন।

'ইংলিশম্যান' কথাটির ব্যবহারও ঠাকুরের নিজস্ব তামাসার ধরনে। তাঁর 'ইংলিশম্যান' কিন্তু ইংরেজ নয়—ইংরেজীজানা ব্যক্তি। তাঁর কথিত 'ইংলিশম্যান' হতে পারেন শ্রীম. কিংবা গিরিশচন্দ্র কিংবা মহিমাচরণ চক্রবর্তী।

একদিন তিনি গিরিশ ভবনে ভক্ত পরিবৃত রয়েছেন। মাঝে মাঝে দু-জনকে তর্ক যুদ্ধে লিপ্ত করে উপভোগ করেন ঠাকুর। এখানেও গিরিশ-চন্দ্র আর মহিমাচরণের মধ্যে বাধিয়ে দিয়েছেন।

মহিমাকে বললেন, 'গিরিশ ঘোষকে বললুম, তোমার নাম করে, 'একজন লোক আছে—গভীর, তোমার এক হাটু জল।' তা এখন যা যা বলেছি মিলিয়ে নাও দেখি। তোমরা দুজন বিচার করো, কিন্তু রফা করো না।'

শুনে সকলে হেসে উঠলেন। বাস্তবিক গিরিশচন্দ্র এবং মহিমাচরণ দু-জনেই বিদগ্ধ ব্যক্তি। তাঁরা বিচারে প্রবৃত্ত হলেন।

তাঁদের তর্কের মধ্যেই রাম দত্ত বাধা দিতে চাইলেন—'ও সব থাক—কীর্তন হোক।'

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন রামচন্দ্রকে নিরস্ত করে বললেন—'না, না; এর অনেক মানে আছে। এরা ইংলিশম্যান, এরা কি বলে দেখি।'...

বিভিন্ন পরিস্থিতিতেই তাঁর একেকটি ইংরেজী শব্দ বেশ মানানসই হয়। কোন আগন্তুককে দেখলেই তো বুঝতে পারেন তার প্রকৃতি কেমন।

দক্ষিণেশ্বরে যাঁরা সমাগত হন, সকলেই ঈশ্বরভক্ত নন, তা তাঁর জানা। তাই—'যাদের দেখি ঈশ্বরে মন নাই, তাদের আমি বলি, তোমরা একটু ঐখানে গিয়ে বস। অথবা বলি, বেশ বিল্ডিং (রাসমণি কালী-বাড়ির মন্দির সকল) দেখ গে।'...

বেশ মজা করে তাঁর ইংরেজী বলা। সেদিন প্রথম এসেছেন পণ্ডিত শশধর। আর ঠাকুরের সঙ্গে কথোপকথনে মুগ্ধ হয়েছেন। তাও বুঝে-ছেন তিনি।

পণ্ডিত মহাশয় বিদায় নেবার পরই হেসে বললেন, 'ডাইলিউট্ হয়ে গেছে একদিনেই।'

'গলে গেছে' না বলে, 'ডাইলিউট' বলায় আরো কৌতুক সৃষ্টি হলো বৈকি।

ঠাকুরের লোক-প্রজ্ঞার কত নিদর্শনই পাওয়া যায় বিভিন্ন দিনের বিবরণে। একদিন জনকয়েক ভদ্রলোক দক্ষিণেশ্বরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ধর্মের নামে পাপাচরণ করে থাকেন, তাও শুনেছেন তিনি।

তারা আসার আগে ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে যেমন প্রসঙ্গ করছিলেন, তেমনি বলতে লাগলেন। আগন্তুকরা রইলেন মৌন।

অনেকক্ষণ পরে তাঁরা গাত্রোত্থান করলেন। বিদায় নিলেন নমস্কার করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ একটু হেসে তাঁদের উদ্দেশে শ্রীম.কে বললেন, 'চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী।'...

একদিন শিমুলিয়ার এক ব্রাহ্মসমাজে তিনি এসেছেন। এখানে উপা-সনা করেন কয়েকটি তরুণ। তাই ঠাকুরের দেখতে আসা।

তখন সেখানে একটি ছোকরা প্রার্থনা করছিলেন—'ঈশ্বর, যেন সব ছেড়ে তোমাতে মগ্ন হই।'...

ঠাকুরের অন্তর্দৃষ্টি ! তাঁর খুব কাছে বসেছিলেন শ্রীম.। তাই তিনিই কেবল শুনতে পেলেন, ঠাকুর মৃদুস্বরে বললেন, 'তা আর হয়েছে।'

আরেকদিন এক ব্রাহ্মভক্ত তাঁকে প্রশ্ন করলেন—'মহাশয়, সব ত্যাগ না করলে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না?'

শোনামাত্র ঠাকুর বুঝলেন, প্রশ্ন-কর্তা ত্যাগ-ভীত ভোগী। তিনি অভয় দিয়ে সহাস্যে বললেন, 'না গো, তোমাদের সব ত্যাগ করতে হবে কেন? তোমরা রসে-বশে বেশ আছো। সারে মাতে। (সকলের হাস্য)। তোমরা বেশ আছো। নক্স খেলা জান? আমি বেশি কাটিয়ে জ্বলে গেছি। তোমরা খুব সেয়ানা। কেউ দশে আছো; কেউ ছয়ে আছো, কেউ পাঁচে আছো। বেশি কাটাও নাই; তাই আমার মত জ্বলেও যাও নাই। খেলা চলছে—এ তো বেশ। (সকলের হাস্য)'

শুধু ব্রাহ্মদের নয়। সব সম্প্রদায়ের ত্রুটি বিচ্যুতির সমালোচক তিনি। সব সম্প্রদায়ের গুণগ্রাহীও। 'যত মত তত পথ' বাণীর প্রবক্তা যে কত বড় সমদর্শী, তা বলা বাহুল্য।

যে সাধুদের সঞ্চয় প্রবৃত্তি তাঁদের সাধুত্বে ঠাকুর আস্থাহীন। তাই 'লোটাওয়ালা' সাধুদের সাংসারিক বুদ্ধিও তাঁর লক্ষ্য এড়ায়নি। একদিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে হুবহু অভিনয় করে দেখালেন তাদের ধরন-ধারণ কথাবার্তা পর্যন্ত। বললেন, 'দেখ বিজয়, সাধুর সঙ্গে যদি পুঁটলি-পাঁটলা থাকে, পনেরটা গাঁটওয়ালা যদি কাপড় বুঁচকি থাকে, তাহলে তাদের বিশ্বাস করো না। আমি বটতলায় ঐরকম সাধু দেখেছিলাম। দু-তিনজন বসে আছে, কেউ ডাল বাচছে, কেউ কেউ কাপড় সেলাই করছে, আর বড় মানুষের বাড়ির ভাণ্ডারার গল্প করছে। বলছে, 'আরে ও বাবুনে লাখো রূপেয়া খরচা কিয়া; সাধু লোককো বহুৎ খিলায়া—পুরী, জিলেবী, পেঁড়া, বরফী, মালপুয়া, বহুৎ চিজ তৈয়ার কিয়া থা।' (সকলের হাস্য)।'

আবার একশ্রেণীর সাধু আছেন যাঁরা গাঁজা খান। সেই সঙ্গে ঠাকুরের এও জানা যে, অনেকে সেই সাধুদের চেলা হয় গাঁজার লোভে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'কেউ কেউ সাধুসঙ্গ করে গাঁজা খাবার জন্য। (হাস্য)। সাধুরা গাঁজা খায় কিনা, তাই তাদের কাছে গাঁজা সেজে দেয়

আর প্রসাদ পায়।' (সকলের হাস্য)।'

একথার তাৎপর্য এই যে, ওই চেলাদের লক্ষ্য সাধন ভজন নয়—কেবল গঞ্জিকা সেবন। তাই তাদের আসল লাভ কিছু হয় না। সাধুসঙ্গের কোনো ফল পায় না। যা ছিল তা-ই থেকে যায় তারা। যেমন, ঠাকুরেরই কথায়—'সাধুর কমণ্ডলু চার ধাম ঘুরে আসে, কিন্তু যেমন তেতো তেমনি থাকে।'

লোকচরিত্রের রসিক দর্শক শ্রীরামকৃষ্ণ। সাধারণ গঞ্জিকাসেবীর স্বভাবও তাঁর বিলক্ষণ জানা। গাঁজাখোরদের পারস্পরিক সহানুভূতি ও হৃদ্যতা। নেশার ব্যাপারে তাদের উদার-সহযোগিতা। সেসব এমন আন্তরিক যে, ঠাকুর তাদের উপমা দেন ভক্তদের অন্তরঙ্গতার সঙ্গে।

কেশব সেনকেই একদিন রসিকতা করে কথাটা বলেছিলেন। আরেক দিন শিবনাথ শাস্ত্রীকেও।

সেদিন কেশবচন্দ্রের দক্ষিণেশ্বরে আসার কথা। তিনি উপস্থিত হবার আগেই এসে পড়েন তাঁর অনুগামীরা। তখন ঠাকুর ও অন্য সবাই কেশবের জন্যে প্রতীক্ষা করতে থাকেন।

তারপর সেন মহাশয়কে আসতে দেখেই ঠাকুর বলে উঠলেন তাঁর শিষ্যদের, 'ঐগো, তোমাদের গোবিন্দ এসেছেন। আমি এতক্ষণ ঘচমচ করছিলুম, জমবে কেন।' (সকলের হাস্য) ··

আর তাঁকে বললেন, 'কেশব, তুমি কিছু বল; এরা সকলে তোমার কথা শুনতে চায়।'

কেশব সবিনয়ে সহাস্যে বললেন, 'এখানে কথা কওয়া কামারের নিকট ছুঁচ বিক্রি করতে আসা।'

তখন শ্রীরামকৃষ্ণও হেসে উত্তর দিলেন, 'তবে কি জান, ভক্তের স্বভাব গাঁজাখোরের স্বভাব। তুমি একবার গাঁজার কলকেটা নিয়ে টানলে, আমিও একবার টানলুম।' (সকলের হাস্য)।' অর্থাৎ ভক্তদের পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদান।

সিঁথির ব্রাহ্মসমাজে একদিন শিবনাথ শাস্ত্রীকেও বলেন এমনি মজা

করে, 'এই যে শিবনাথ। দেখ, তোমরা ভক্ত, তোমাদের দেখে বড় আনন্দ হয়। গাঁজাখোরের স্বভাব, আর একজন গাঁজাখোরকে দেখলে ভারি খুশী হয়। হয়ত কোলাকুলিই করে।' (শিবনাথ ও সকলের হাস্য)।

নেশা আর নেশাখোরদের উপমা যোগে ঠাকুর রঙ্গরহস্য করেছেন নানা-ভাবে। একদিন শ্যামপুকুর বাড়িতে ডাক্তার মহেন্দ্রলালকেও কি মজা করে বললেন। মহেন্দ্রলাল তো কট্টর যুক্তিবাদী, বৈজ্ঞানিক ব্যক্তি। কিন্তু সেদিন তিনি নরেন্দ্রের গান শুনে ভাবে মুগ্ধ। আবার একটি গানের বিশেষ সুখ্যাতি করলেন, 'চিদানন্দ সিন্ধু-নীরে, ঐটি বেশ।'

ডাক্তারকে এই গানের ভাবে আনন্দ-মগ্ন হতে দেখে, ঠাকুর একটি সংলাপ শোনালেন—

'ছেলে বলেছিল, 'বাবা, একটু (মদ) চেখে দেখ, তারপর আমায় ছাডতে বল তো ছাড়া যাবে।' বাবা খেয়ে বললে, 'তুমি বাছা ছাড আপত্তি নাই, কিন্তু আমি ছাডছি না।'

আবার আরেক রকমে বলেন যতুলাল মল্লিককে। পাথুরিয়াঘাটার যতুলাল মহা ধনী এবং ঠাকুরের ভক্তও। মল্লিকবাড়িতে সিংহবাহিনী দেবীর নিত্য সেবা পূজা। দেবী দর্শনে কিংবা বিশেষ পূজা উপলক্ষে ঠাকুর এ ভবনেও আসেন।

সেদিনও এসেছেন সেখানে। আপন ভাবে তুখানি গান গাইলেন— 'গো আনন্দময়ী হয়ে আমায় নিরানন্দ করো না' ও 'আমি কি আটাশে ছেলে।' তারপর যতুলালের বৈঠকখানায় বসলেন। ভাবলোক থেকে তখন বাস্তব জগতে। তাঁর প্রখর দৃষ্টি বাস্তবের সর্ব বিষয়ে। তেমনি, যে কোনো ব্যক্তির সামনে অপ্রিয় সত্যও বলে দেন, তাঁর মঙ্গলের জন্যে। যতুলালের বন্ধুদের মধ্যে কজন মোসাহেবও উপস্থিত। দেখেই চিনেছেন ঠাকুর। হাসতে হাসতে গৃহস্বামীকে বললেন, 'তুমি ভাঁড় রাখ কেন?'

যতু সহাস্যে বললেন, 'ভাঁড় রাখলেই বা, তুমি উদ্ধার করবে না!'

ঠাকুরও হেসে জানিয়ে দিলেন, 'গঙ্গা মদের কুপোকে পারে না!'

রসিকতাচ্ছলে আরেক স্পষ্ট কথা। আকণ্ঠ মদ্যপায়ীর উদ্ধার নেই। মোসাহেবের তোষামোদে সঙ্কীর্ণ হয়ে যায় মন। সেখানে ভগবদ্ ভাব স্থায়ী হয় না।

কেশবচন্দ্রকেও একদিন শোনালেন আরেক রকম উচিত কথা। তিনি অনুগামীদের স্বভাব দেখে দলস্থ করেন না, তাই তাঁর প্রতিষ্ঠানে ভাঙন ধরে। এই বাস্তববাদী তথ্য জানিয়ে দিলেন দলপতিকেই—'তুমি প্রকৃতি দেখে শিষ্য করো না, তাই এইরূপ ভেঙে ভেঙে যায়।' মানুষকে পুলিপিঠের সুযোগ্য উপমা দিয়ে সরসভাবে বললেন, 'মানুষগুলি দেখতে সব একরকম, কিন্তু ভিন্ন-প্রকৃতি। কারু ভিতর সত্বগুণ বেশি, কারু রজোগুণ, কারু তমোগুণ। পুলিগুলি দেখতে সব একরকম। কিন্তু কারু ভিতর ক্ষীরের পোর, কারু ভিতর নারিকেল ছাঁই, কারু ভিতর কলায়ের পোর।' (সকলের হাস্য)।

কৌতুকের মোড়কে কি গুরুত্বপূর্ণ ভূয়োদর্শন।

একদিন গিরিশচন্দ্রকে কেমন মজার উপমায় একটি অসঙ্গতি দেখিয়ে দিলেন। সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ 'প্রহ্লাদ চরিত্র' দেখতে এসেছেন স্টার থিয়েটারে। অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্রের আমন্ত্রণেই তাঁর নাটক দেখতে উপস্থিত হয়েছেন। অভিনয় দেখে বেশ পরিতৃপ্ত। তারপর কথাবার্তা চলছে নাট্যাচার্যের ঘরে বসে। এমন সময় একজন এসে তাঁকে বললেন, 'আপনি 'বিবাহ বিভ্রাট' দেখবেন? এখন অভিনয় হচ্ছে।'

প্রহসনের নাম শুনেই বুঝে নিলেন—তার বিষয়বস্তু সংসার সংক্রান্ত। এতক্ষণ যে ঈশ্বরীয় ভাবে উত্তরণ ঘটেছিল, তার পরিবর্তে আসবে আগেকার অনিত্য, তুচ্ছ ভাব।

ঠাকুর অমনি বললেন গিরিশচন্দ্রকে—কারণ তাঁরই তো ব্যবস্থাপনা—'এ কি করলে? আগে পায়েস মুণ্ডি, তারপর সুক্তুনি!'

মজা করে, কত সুন্দর করেই কথা বলেন। ভক্ত মহিমাচরণ চক্রবর্তী ইংরেজী ও সংস্কৃতে পণ্ডিত ব্যক্তি। একদিন তাঁকে আসতে দেখেই সহাস্যে অভ্যর্থনা করলেন, 'একি! এখানে জাহাজ এসে উপস্থিত!

(সকলের হাস্য)। এমন জায়গায় ডিঙি-টিঙি আসতে পারে; এ যে একেবারে জাহাজ! (সকলের হাস্য)। তবে একটা কথা আছে—এটা আষাঢ় মাস।' (সকলের হাস্য)।

বিদ্যাসাগরকেও এমনি জাহাজের সঙ্গে একদিন তুলনা করেছিলেন।··

কথায় কথায় কৌতুকের নির্ঝর। সংসারের দুঃখকষ্ট নিয়ে একদিন বলছিলেন—'দেখ এক 'কপ্নিকে বাস্তে' যত কষ্ট। সাধু কপ্নি লয়ে ব্যস্ত, সংসারী ব্যস্ত ভার্যা লয়ে। আবার বাড়ির সঙ্গে বনিবনাও নাই, তাই—আলাদা বাসা করতে হয়েছে।'

বলতে বলতে ছড়া এসে গেল। 'চৈতন্যদেব নিতাইকে বলেছিলেন, শুন শুন নিত্যানন্দ ভাই, সংসারী জীবের কভু গতি নাই।'

আরেকজনের সাংসারিক দুর্ভোগ নিয়ে কথা আরম্ভ করেছিলেন। এবার মনে পড়ল শ্রীম.-র কথা। তার দিকে দেখিয়ে সহাস্যে বললেন—'ইনিও বাসা করে আছেন।'

আবার রসোন্মুখ হয়ে উঠলেন—'তুমি কে, না আমি বিদেশিনী, তুমি কে, না আমি বিরহিণী।'

অতিশয় উপভোগ্য এমনি পরিশীলিত, তাৎক্ষণিক পরিহাস।

নরেন্দ্রর চেয়ে তো আর কাউকে ভালবাসেন না। আর নরেন্দ্রর সে সময় কি বিপর্যস্ত অবস্থা। সদ্য পিতৃহীন, জননী ও বালক ভাই দুটির দারিদ্র্য, বসতবাড়ি বেদখল, আত্মীয়দের সঙ্গে মামলা ইত্যাদি। তথাপি নরেন্দ্রর কি ঊর্ধ্বচারী সত্ত্বা। 'তুই তো 'খ'।' অর্থাৎ গগন সদৃশ—এই তাঁর স্বীকৃতি। তবু সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছুরিত কৌতুক—'তবে যদি টেক্‌সো না থাকত।' এ শুধু পৌরসভার কর নয়—সামগ্রিক সাংসারিক দায়।

তাঁর রসধারা সদা তরঙ্গায়ত। যে কোনো উপলক্ষে আপ্লুত করে দেয় শ্রোতাকে।

একদিন শশধর পণ্ডিতের সঙ্গে বিচার করছেন।

তর্কচূড়ামণি বললেন, 'তিনি যদি 'আমি' লয় করেন তাহলে কি হবে? তিনি যদি করে লন?'

শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, 'তোমার মনের কথা খুলে বল।' অমনি রসিকতা উপচে পড়লো যাত্রাপালার সংলাপে—'মা কৌশল্যা, একবার প্রকাশ করে বল।'···

একদিন প্রসঙ্গ করছেন—দুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান সম্পর্কে। তার ব্যাখ্যা করতে করতে এক অপূর্ব অনৃতবাদীর সংবাদ দিলেন—'কিন্তু সে জ্ঞান বড় কঠিন। বললেই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। কেউ জ্ঞানের ভাণ করে। (সহাস্যে) একজন বড় মিথ্যা কথা কইত, আবার এদিকে বলত—আমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। কোনও লোক তাকে তিরস্কার করাতে সে বললে, 'কেন জগৎ তো স্বপ্নবৎ। সবই যদি মিথ্যা বল, সত্য কথাটাই কি ঠিক! মিথ্যাটাও মিথ্যা, সত্যটাও মিথ্যা।'

কটূক্তিটি যে কতখানি হাস্যকর তা নতুন করে শোনালেন পরম কৌতুকী! আর মূল প্রসঙ্গ সেই ব্রহ্মজ্ঞানের আভাস তিনি আবার স্বয়ং দিলেন আরেকটি লৌকিক উপমা দিয়ে। ঠাকুরের বিভিন্ন লোকচরিত্র অনুধাবন তথা রসিক চিত্তের এও এক নিদর্শন :—(এটিও কি তাঁর তখনি রচনা গল্প কণিকা ?)

'একটি মেয়ের স্বামী এসেছে। অন্য অন্য সমবয়স্ক ছোকরাদের সহিত বাইরের ঘরে বসেছে। এদিকে ঐ মেয়েটি ও তার সমবয়স্ক মেয়েরা অন্যান্য জানলা দিয়ে দেখছে। তারা বরটিকে চেনে না—ঐ মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করছে, ঐটি কি তোর বর ? তখন সে একটু হেসে বলছে—না। আর একজনকে দেখিয়ে বলছে—ঐটি কি তোর বর ? সে আবার বলছে—না। আবার একজনকে দেখিয়ে বলছে—ঐটি তোর বর ? সে আবার বলছে—না। শেষে তার স্বামীকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলে—তখন সে হাঁও বললে না, না-ও বললে না—কেবল একটু ফিক করে হেসে চুপ করে রইল। তখন সমবয়স্করা বুঝলে যে, ঐটিই তার স্বামী। যেখানে ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান সেখানে চুপ।'···

হাজরার কথা নিয়েও কম রঙ্গ রহস্য করেন নি ঠাকুর। হাজরা একটি বিচিত্র-চরিত্র ধর্মাচারী। দক্ষিণেশ্বরে থেকে জপ ধ্যান করেন। ঠাকুরই

সে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তাঁকে। হাজরার স্ত্রী পুত্র দেশেই থাকে, কামারপুকুরের নিকটেই। জায়গা-জমির আয় থেকে তাদের দিনাতিপাত হয়ে যায়। তবু ভাবনাও আছে হাজরার। কারণ দেনা হাজার খানেক টাকা। এদিকে ধর্মে নিষ্ঠাও আছে। আবার ওরই মধ্যে থাকে দালালীর চেষ্টা। মালা জপও করেন। আবার শ্রীরামকৃষ্ণের খুঁতও ধরেন, যদিও তাঁকে মহাপুরুষ বলে ধারণা।

ঠাকুর সম্মানও দেন, তামাসাও করেন হাজরাকে। একদিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বসে। জনাইয়ের প্রাণকৃষ্ণকে বলছেন ঠাকুর, 'হাজরা একটি কম নয়। যদি এখানে (অর্থাৎ ঠাকুর স্বয়ং) বড় দরগা হয়, তবে হাজরা ছোট দরগা।'

আরেকদিন হাজরা বলছেন ছোট গোপালকে, 'এঁকে একটু তামাক খাওয়াও।'

অমনি শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বললেন, 'তুমি খাবে তাই বল।'

প্রাণকৃষ্ণ হাজরাকে বললেন, 'আপনি এঁর (ঠাকুর) কাছে থেকে অনেক শিখেছেন।'

'না, এঁর বাল্যকাল থেকেই এই অবস্থা।' শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে তৎক্ষণাৎ জানালেন।

হাজরার সামগ্রিক মূল্যায়নও তিনি করেন একবার। তার উপসংহারেও উপভোগ্য পরিহাস—'হাজরার সব হয়েছে, একটু সংসারে মন আছে—ছেলেরা রয়েছে, কিছু টাকা ধার রয়েছে। মামীর সব অসুখ সেরে গেছে, একটু কসুর আছে।' (সকলের হাস্য)।'...

সদা সপ্রতিভ শ্রীরামকৃষ্ণ. রহস্য কৌতুকেও। এমনকি অপরে যদি তাঁকে রসিকতার পাত্র করে, তিনি পাল্টা রসসৃষ্টি করেন তখনি। একদিন দুপুরে বিশ্রাম করছেন বলরামের বাড়িতে। আর ভক্তদের সঙ্গে কথা-বার্তা বলছেন। এক ভিখারীর গান হচ্ছে সেখানে।

একজন ভক্ত (সম্ভবত শ্রীম.) তাঁকে বললেন, 'মহাশয়, (গায়ক) আপনাকে আমীর ঠাওরেছে· আপনি তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে

আছেন।'

ঠাকুরও হাসতে হাসতে বললেন, 'ব্যারাম হয়েছে, ভাবতে পারে।'

অন্যের কথার মধ্যে পাল্টা কৌতুক তাঁর আরো দেখা যায়। একদিন শ্যামপুকুর বাড়িতে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল বলছিলেন এক রোগিনীর কথা —'পাকপাড়ার বাবুদের বাড়িতে সাত মাসের মেয়ের অসুখ করেছিল— ঘুঙ্‌রী কাশি (Whooping Cough)…কিছুতেই অসুখের কারণ ঠিক করতে পারি নাই। শেষ জানতে পারলুম, গাধা ভিজেছিল, যে গাধার দুধ মেয়েটি খেতো।' (সকলের হাস্য)।'

শুনেই ঠাকুর রঙ্গ-মুখর হলেন—'বলে কি গো। তেঁতুল তলায় আমার গাড়ি গিছিলো, তাই আমার অম্বল হয়েছে।' (ডাক্তার ও সকলের হাস্য)।'

এ যেন মাৎ-করা আসরকে পুনরায় মাতানো, পাকা ওস্তাদের মতন।… পরিহাসের কথোপকথনেও অপরাজেয় শ্রীরামকৃষ্ণ।

একদিন জ্ঞানী আর ভক্তের পার্থক্য বোঝাচ্ছেন গভীর উপমাযোগে। জ্ঞানীরা শুধু অনিত্য বা স্বপ্নবৎ দেখে। আর ভক্তরা গ্রহণ করে সব অবস্থা। যেন দুই প্রকার গাভী।

'জ্ঞানী দুধ দেয় ছিড়িক ছিড়িক করে। (সকলের হাস্য)। এক একটা গরু বেছে বেছে খায় ; তাই ছিড়িক ছিড়িক দুধ। যারা অত বাছে না, আর সব খায়, তারা হুড় হুড় করে দেয়। উত্তম ভক্ত—নিত্য লীলা দুই লয়। তাই নিত্য থেকে মন নেমে এলেও তাঁকে সম্ভোগ করতে পায। উত্তম ভক্ত হুড় হুড় করে দুধ দেয়।' (সকলের হাস্য)।

মহিমাচরণ টিপ্পনী কাটলেন, 'তবে দুধে একটু গন্ধ হয়।' (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণও হাসতে হাসতে সদুত্তর দিলেন, 'হয় বটে। তবে একটু আওটাতে হয়। একটু আগুনে আউটে নিতে হয়। জ্ঞানাগ্নির উপর দুধটা একটু চড়িয়ে নিতে হয়, তাহলে আর গন্ধটা থাকবে না।'

(সকলের হাস্য)।

সকৌতুকে কত বড় তত্ত্ব কথা এবং তার কি অতুলনীয় ভাষ্য।···

বৃহৎ ভাবকে রহস্যচ্ছলে পরিবেশনে অদ্বিতীয় তিনি। একদিন প্রতাপ মজুমদারকে বলছিলেন—তাঁর সমালোচনা তো সামনেই প্রকাশ পায় —'দেখো, তোমাদের ব্রাহ্ম সমাজের লেকচার শুনলে লোকটার ভাব বেশ বোঝা যায়।' এক পণ্ডিত আচার্যের (সত্যব্রত সমাধ্যায়ী) ভাষণ তিনি শুনেছিলেন—'ঈশ্বর নীরস, আমাদের প্রেমভক্তি দিয়ে তাঁকে সরস করে নিতে হবে।'

সেই সূত্রে ঠাকুর বলেলেন প্রতাপচন্দ্রকে, 'তখন একটা গল্প মনে পড়ল —একটি ছেলে বলেছিল, আমার মামার বাড়িতে অনেক ঘোড়া আছে, এক গোয়াল ঘোড়া। এখন গোয়াল যদি হয় তাহলে ঘোড়া থাকতে পারে না,···ঘোড়া-টোড়া কিছুই নাই।'

অর্থাৎ রসস্বরূপ ঈশ্বরকে যিনি নীরস বলেন, তার কোনো ধারণা নেই ঈশ্বর সম্বন্ধে।··

একদিন এক সদরওয়ালাকে বলছিলেন, ব্রাহ্মসমাজেই—'অহঙ্কার করা বৃথা। এ শরীর, এ ঐশ্বর্য কিছুই থাকবে না।'

আর তার উদাহরণ দিলেন—'একটা মাতাল দুর্গা প্রতিমা দেখছিল। প্রতিমার সাজগোজ দেখে বলছে, মা যতোই সাজো গোজো, দিন দুই তিন পরে তোমায় টেনে গঙ্গায় ফেলে দেবে।'···

লোকে অপরের দোষ দেখে। নিজের দোষ তার চোখে পড়ে না। এক দিন এই প্রসঙ্গ করছিলেন ঠাকুর। কিন্তু সে পরিহাস তীক্ষ্ণ শ্লেষ হয়ে উঠলো—ভাশুরের সঙ্গে নষ্ট এক স্ত্রীলোকের উপমায়—'আমি তো আপনার ভাশুরকে নিয়ে আছি তাইতেই লজ্জায় মরি, এরা সব (অন্য মাগীরা) পরপুরুষ নিয়ে কি করে থাকে?'···

আবার আরেক কোটির লোক-চরিত্র দর্শন। একদিন দান তথা কৃপণতার কথা হচ্ছিল। কেশব-শিষ্য ত্রৈলোক্য সান্ন্যালকে ঠাকুর বললেন কেশবের আরেক অনুগামী জয়গোপাল সেনের কথা—

'জয়গোপাল সেনের টাকা আছে তার দান করা উচিত। ও যে করে না

সেটা নিন্দার কথা।··সেদিন জয়গোপাল এসেছিল।···গাড়িতে ভাঙা লণ্ঠন; ভাগাড়ের ফেরত ঘোড়া—মেডিকেল কলেজের হাসপাতাল ফেরত দ্বারবান—আর এখানের জন্য নিয়ে এল দুই পচা ডালিম।'

তখন সুরেন্দ্র মিত্র জানালেন, 'জয়গোপালবাবু ব্রাহ্ম সমাজের। এখন বুঝি কেশববাবুর ব্রাহ্ম সমাজে সেরূপ লোক নাই। বিজয় গোস্বামী, শিবনাথ ও আর আর বাবুরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ করেছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে আরেক দৃষ্টান্ত দিলেন সকৌতুকে (এতও জানতেন) —'গোবিন্দ অধিকারী দলে ভাল লোক রাখত না; ভাগ দিতে হবে বলে।···

আবার ঈশ্বর কথায় কি মিষ্ট রস। সাকারভাবে কিংবা নিরাকারভাবে ভগবানকে পাবার সেই সুমধুর উপমা তাঁর মুখে—মিছরির রুটি—সিধে করে খাও আর আড় করে খাও, মিষ্টি লাগবে।'··

এক একটি রহস্য কথা কি গভীর অর্থবহ হয়ে ওঠে। একদিন নরেন্দ্র আর শ্রীম.-কে উত্তর দিলেন কি মুন্সিয়ানায়। শ্যামপুকুর বাড়িতে আগের দিন ডাক্তার মহেন্দ্রলালের সঙ্গে অনেক তত্ত্ব বিচার হয়েছিল। শ্রীম. গিরিশচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের সঙ্গে বিস্তর আলোচনা করেন ডাক্তার। বিবেক, বৈরাগ্য, স্বাধীন ইচ্ছা বনাম ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও শক্তি; বিশ্বাস; অহৈতুকী ভক্তি, নিষ্কাম ধর্ম ও শুদ্ধ সত্ত্ব প্রভৃতি প্রসঙ্গ। মহেন্দ্রলাল এঁদের কথা অনেকখানি মেনেছিলেন। আবার মত পার্থক্যও দেখা দেয় কিছু কিছু।

পরের দিন তারই আভাস দিয়ে নরেন্দ্র বললেন, 'ডাক্তার কাল কি করে গেল।'

শ্রীম. বললেন, 'সুতোয় মাছ গিঁথেছিল, ছিঁড়ে গেল।'

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে জানালেন, 'বঁড়শি বেঁধা আছে—মরে ভেসে উঠবে।'

অর্থাৎ মহেন্দ্রলালের মনের মধ্যে ভাব ও কথাগুলি ঠিক পৌঁছে গেছে। 'কাজ হবে, প্রকাশ পাবে যথাসময়ে।'

একদিন দক্ষিণেশ্বরে, পঞ্চবটীতে রয়েছেন। কথাবার্তা হচ্ছে ভক্তদের সঙ্গে।

ভবনাথ জামা পরে বসেছেন দেখে সুরেন্দ্র মিত্র তামাশা করে বললেন, 'কি হে বিলাত যাবে নাকি ?'

ঠাকুর হাসতে হাসতে মন্তব্য করলেন, মনে করিয়ে দিলেন সকলকে—'আমাদের বিলাত ঈশ্বরের কাছে।'

সামান্য কথা থেকে অসামান্যে উন্নীত করে দেওয়া রহস্যচ্ছলে।

আবার কখনো ভাষা সৌকর্যে ও ভাষণ পারিপাট্যেও রসসৃষ্টি করেন। পূর্বোক্ত প্রসঙ্গের আগের দিনের কথা। ডাক্তার মহেন্দ্রলালের সঙ্গে কথা বলছিলেন শ্যামপুকুর বাড়িতে।

নরেন্দ্রকে ডাক্তার জানালেন, 'যখন তুমি গাইছিলে 'দে মা পাগল করে, কাজ নাই মা জ্ঞান-বিচারে,' তখন আর থাকতে পারি নাই। দাঁড়াই আর কি ! তারপর অনেক কষ্টে ভাব চাপলুম ; ভাবলুম যে display করা হবে না।

ঠাকুর সহাস্যে বললেন, একেবারে শ্রীচৈতন্যের দুই প্রধান অনুগামীর তুলনা করে—সেই অবতারের অনুষঙ্গ তাঁর স্মরণে মননে, সদা প্রাণবন্ত থাকে—'তুমি যে অটল অচল সুমেরুবৎ। তুমি গম্ভীরাত্মা, রূপ সনাতনের ভাব কেউ টের পেতনা। . '

'তোমার সঙ্গে তো কথায় পারবার যো নাই,' তখন ডাক্তার স্বীকার করলেন। এমনি একদিন গিরিশচন্দ্রও মেনেছিলেন তাঁকে, রসিকতার কথায়।

নাট্যাচার্য অনেক গভীর তত্ত্বকথা, অনেক মাননীয় উপদেশ নির্দেশ ঠাকুরের কাছে পান, কৌতুকের আকারে। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রের বাড়িতে এসেছেন। রাত হয়ে গেছে কথায় কথায়। গিরিশচন্দ্রের থিয়েটারে যাবার সময় হয়েছে।

তিনি ঠাকুরকে তখন বললেন, 'আপনাকে ছেড়ে আবার থিয়েটারে যেতে হবে।'

ঠাকুর তাঁর এই থিয়েটারে যাবার অনিচ্ছাকে বর্জন করতে চাইলেন। কারণ গিরিশচন্দ্রের নাট্যজীবন লোকশিক্ষার সহায়ক, জনহিতকারী মনে করেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই কৌতুক উক্তিতে নাট্যাচার্যকে নির্দেশ দিলেন—'না, ইদিক উদিক দুদিক রাখতে হবে।' সঙ্গে সঙ্গে রাজর্ষি জনকের দৃষ্টান্তও বর্ণনা করলেন, তিনি কেমন সার্থক হয়েছিলেন আধ্যাত্মিক ও সাংসারিক জীবনের সমন্বয়ে—'জনক রাজা ইদিক ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি।'

ঠাকুর কথিত লোকশিক্ষার জন্যে গিরিশচন্দ্র নাট্যকার-নট-নাট্যাচার্য-রূপে সক্রিয় থাকেন শেষ পর্যন্ত।

অভিনয়ের মতন সঙ্গীতপ্রেমীও শ্রীরামকৃষ্ণ। স্বয়ং সঙ্গীতজ্ঞ বলে তাল বিষয়েও অবহিত। একদিন শ্যামপুকুর বাড়িতে কোনো কোনো ভক্ত গান গাইছিলেন বৈঠকখানায়। ঠাকুর শুনেই বুঝলেন, বেতালা হচ্ছে। গায়করা ঘরে আসতেই তিনি বললেন, 'তোমরা গান গাচ্ছিলে—তাল হয় না কেন? সে একজন বেতালসিদ্ধ ছিল—এ তাই!'

সঙ্গীত জগতে 'তালসিদ্ধ'ই প্রচলিত। ঠাকুরের অপূর্ব রসসিদ্ধ প্রয়োগ —'বেতালসিদ্ধ।'···

উপলক্ষ পেলেই তাঁর রসিকতা। একদিন পণ্ডিত শশধরকে বললেন, 'তুমি আদ্যাশক্তির কথা কিছু বল।'

পণ্ডিত মহাশয় বিনয় প্রকাশ করে বললেন, 'আমি কি জানি।'

অমনি ঠাকুর রহস্যভরে শোনালেন এক (স্বরচিত?) গল্পকথা—'এক-জনকে একটি লোক খুব ভক্তি করে। সেই ভক্তকে তামাক সাজার আগুন আনতে বলে; তা সে বললে, আমি কি আপনার আগুন আন-বার যোগ্য? আর আগুন আনলেও না!'···

একদিন শ্রীম. এসেছেন ঠাকুর সন্দর্শনে। স্কুলেরই এক ফাঁকে, বল-রামের বাড়িতে। তারপর সময় হতেই উঠে দাঁড়ালেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখনই যাবে?'

একজন জানালেন, 'স্কুলের এখনো ছুটি হয়নি। উনি মাঝে একবার

এসেছিলেন।'

ঠাকুর এক মজার উপমা দিলেন—'যেমন গিন্নী—সাত-আটটি ছেলে বিয়েন—সংসারে রাত দিন কায—আবার ওর মধ্যে এক একবার এসে স্বামীর সেবা করে যায়।'···

বিকালেই শ্রীম. আবার এলেন স্কুল ফেরত। তার আগে নরেন্দ্র, রাম দত্ত, ছোট নরেন, আরো কোনো কোনো ভক্তও উপস্থিত। একটু পরে ঠাকুর নীচে নামলেন সকলের সঙ্গে। এবার তিনি গিরিশচন্দ্রের বাড়িতে যাবেন, কাছেই বোসপাড়ায়। বলরামের বাড়ি থেকে তিন-চার মিনিটের পথ। সদলে শ্রীরামকৃষ্ণ চলেছেন। তাঁকে নিয়ে উৎসব হবে গিরিশ ভবনে।

বোসপাড়ায় পৌছলেন, সঙ্গে ভক্তমণ্ডলী। এবার নিজেদের নিয়েই রসিকতা—শ্রীম.কে বললেন, 'হ্যাঁ গা, কি বলে ? পরমহংসের ফৌজ আসছে ?'···

একদিকে বেদান্তের জীবন্ত বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ। আবার পরম ভক্তি-বাদী। ভক্তরূপে তিনি ঈশ্বরের সব ভাবই গ্রহণশীল। নিত্য এবং লীলা। দাস্য সখ্য বাৎসল্য শান্ত মধুর সব ভাবে তাঁর ঈশ্বরসম্ভোগ। কিন্তু তিনি আত্মপরিচয় দেন ভোজনরসিকের সরস বর্ণনায়—'আমি মাছ সব রকম খেতে ভালবাসি। আমার মেয়েলি স্বভাব। আমি মাছ ভাজা, হলুদ দিয়ে মাছ, টকের মাছ, বাটি চচ্চড়ি, এ সব তাতেই আছি, কালিয়া পোলোয়াতেও আছি।'···

যেমন তাঁর রোসনচৌকিতে 'শুধু নিরাকারের ভোঁ ধরা নয়। কত রাগ রাগিণী। কত রঙ্ পরঙ্।'···

মানবের পরিত্রাণের পথ দেখাতে শ্রীরামকৃষ্ণের অবতরণ। সকলেরই আছে মুক্তিলাভের আশা। এই তাঁর অভয় মন্ত্র। এই তাঁর পরম আশ্বাস দান—

'প্রার্থনা কর—সেই পরমাত্মার সঙ্গে সকলেরই যোগ হতে পারে।'

কেমন করে ? সকৌতুকে সংক্ষেপে তাঁর পথনির্দেশ, আরেক লৌকিক

উপমা যোগে—

'গ্যাসের নল সব বাড়িতেই আছে। গ্যাস কোম্পানীর কাছে গ্যাস পাওয়া যায়। আরজি কর; করলেই গ্যাস বন্দোবস্ত করে দেবে—ঘরেতে আলো জ্বলবে। শিয়ালদহে আপিস আছে।'

সকলে হাসতে লাগলেন কথার ধরনে। কিন্তু কথাটা তো হাসির নয়। বিশ্বচরাচরের 'আপিস' হলেন ঈশ্বর। তাঁর কাছেই আর্জি করতে হয়, প্রার্থনা করতে হয়, ব্যাকুল হয়ে ডাকতে হয়। তবেই তিনি জ্ঞান ভক্তির আলো জ্বালিয়ে দেন হৃদয়ে।

রসিকই চিনতে পারেন, তারিফ করতে পারেন রসিককে।

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ নিমন্ত্রণে এসেছেন পরম গৃহী ভক্ত ঈশান মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে এক ভাগবতের পণ্ডিত একটি উদ্ভট শ্লোক বললেন। আর ব্যাখ্যা করলেন আবৃত্তির পরে—দর্শনাদি শাস্ত্রের চেয়ে কাব্য মনোহর! কাব্য শোনবার সময় বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল এইসব শুষ্ক বোধহয়। আবার কাব্যের চেয়ে মনোহর গীত। কঠিন প্রাণও গলে যায় সঙ্গীতে। কিন্তু সেই গীতও আর ভাল লাগে না, যদি সুন্দরী নারী সামনে চলে যায়। সব মন আকৃষ্ট হয় ওই রমণীর দিকে। আবার যখন ক্ষুধা পায় কাব্য, নারী, সঙ্গীত কিছুই ভাল লাগে না। অন্ন চিন্তা চমৎকারা!'

শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে তাঁকে স্বীকৃতি জানালেন—'ইনি রসিক।'

একদিন নরেন্দ্র তবলা বাঁধছেন, গান গাইবার আগে। সুরযন্ত্রের সহযোগে তারে সুর মেলাচ্ছেন আঙুলের বিশেষ কায়দায় চাপড়ে।

ঠাকুর হেসে বললেন, 'তোর তবলা যেন গালে চড় মারছে।'

কত মজার গ্রাম্য ছড়াও যে তাঁর জানা ছিল লোক চরিত্রের দ্রষ্টারূপে। একদিন বলরাম মন্দিরে ভক্তদের সঙ্গে ঠাকুর রয়েছেন। তখন তিনি

কথোপকথন করছিলেন গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে।

গিরিশচন্দ্র সহাস্যে বললেন, 'মহাশয়! আমরা সব হল্ হল্ করে কথা কচ্ছি কিন্তু মাস্টার ঠোঁট চেপে বসে আছে। কি ভাবে? মহাশয়! কি বলুন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে শোনালেন—'মুখ হল্সা, ভেতর বুঁদে, কাণতুলসে, দীঘল ঘোমটা নারী, পানা পুকুরের শীতল জল বড় মন্দ-কারী।'

শুনে হাসতে লাগলেন সকলে।

তিনি সহাস্যে আরো যোগ করলেন—'কিন্তু ইনি তা নন—ইনি 'গম্ভীরাত্মা'।'

সবাই আবার হেসে উঠলেন।

গিরিশচন্দ্র বললেন—'মহাশয়! শ্লোকটি কি বললেন?'

অর্থাৎ ওই পল্লী-প্রচলিত শব্দগুলির অর্থ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিমুখে বুঝিয়ে দিলেন—'এই কটি লোকের কাছে সাবধান হবে: প্রথম মুখ হল্সা—হল্ হল্ করে কথা কয়; তারপর ভেতর বুঁদে—মনের ভিতর ডুবুরি নামালেও অন্ত পাবে না; তারপর কাণ-তুলসে—কাণে তুলসী দেয়, ভক্তি জানাবার জন্য; দীঘল ঘোমটা নারী—লম্বা ঘোমটা, লোকে মনে করে ভারী সতী, তা নয়, আর পানা পুকুরের জল—নাইলে সান্নিপাতিক হয়।'

শুনে, পুনরায় সকলে হাসতে লাগলেন।

দক্ষিণেশ্বরের নাটমন্দিরে 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রাপালা হয়েছে শেষ রাত্রে। শ্রীরামকৃষ্ণ তা দেখেছেন। যে তরুণ বিদ্যা সেজেছিলেন, তাঁর অভিনয় ভালো লেগেছে ঠাকুরের। তাঁকে প্রশংসা করে আলাপ পরিচয় করছেন; সংসারের খবর নিচ্ছেন।

অভিনেতা বললেন, 'আজ্ঞা একটি কন্যা গত; আরো একটি সন্তান হয়েছে।'

তিনি বলে উঠলেন, 'এরি মধ্যে হলো, গেল। তোমার এই কম বয়স।' অমনি একটি ছড়া শুনিয়ে দিলেন বলে—'সাঁজ সকালে ভাতার ম'লো কাঁদব কত রাত।' (সকলের হাস্য)

তারপর এক কথায় বাস্তব জগতের পরিচয়ও শুনিয়ে দিলেন, 'সংসারের সুখ তো দেখছ। যেমন আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া। খেলে হয় অম্লশূল।'

আবার যাত্রাদলের নেপথ্যে রূঢ় বাস্তবতার হুবহু বর্ণনা করলেন ভূয়োদর্শী, সপরিহাসে—'যাত্রাওয়ালার কায করছ তা বেশ! কিন্তু বড় যন্ত্রণা। এখন কম বয়স, তাই গোলগাল চেহারা। তারপর সব তুবড়ে যাবে। যাত্রাওয়ালারা প্রায় ঐরকমই হয়। গাল তোবড়া, পেট মোটা, হাতে তাগা।' (সকলের হাস্য)।

উপযুক্ত পরিস্থিতিতে অনুরূপ ভাবের ছড়া শুনিয়ে দেওয়া ঠাকুরের লোকচরিত্র অনুধাবন ক্ষমতার অন্যতম পরিচায়ক। এই ধরনের ছড়া বা প্রবাদ বাক্য ভূয়োদর্শনের প্রত্যক্ষ ফলেই সৃষ্ট। আর শ্রীরামকৃষ্ণও রসিকচিত্ত ও লোকপ্রজ্ঞায় একেকটি প্রবচন জমাটিভাবে প্রয়োগ করেন।

লোকজীবন এমনকি গৃহপালিত জীব-জন্তুদের ধরন-ধারণেও কি অব্যর্থ তাঁর লক্ষ্য। তার পরিচয় পাওয়া যায় কত গভীর ভাবোদ্দীপক ব্যাখ্যায় তাঁর কত কৌতুকাবহ লৌকিক উদাহরণে।

সেদিন তিনি সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মনস্বী মহিমাচরণ চক্রবর্তী প্রমুখের সঙ্গে প্রসঙ্গ করছিলেন। মানব শরীরে ঈশ্বরের আবির্ভাব কথা। অবতার তত্ত্বের একপ্রকার ভাষ্য।

বলছিলেন, 'মনুষ্যদেহ ধারণ করে ঈশ্বর অবতীর্ণ হন। তিনি সর্বস্থানে সর্ববস্তুতে আছেন বটে, কিন্তু অবতার না হলে জীবের আকাঙ্ক্ষা পূরে না। প্রয়োজন মেটে না। কি রকম জানো? গরুর যেখানটা ছোঁবে, গরুকে ছোঁয়াই হয় বটে। শিঙ্‌টা ছুঁলেও গাইটাকে ছোঁয়া হলো;

কিন্তু গাইটার বাঁট থেকেই দুধ হয়।'

সকলে হাসতে লাগলেন। মহিমাচরণ আরো নির্দিষ্ট করে দিলেন রূপক আলোচনাটির মূল বক্তব্যকে, রসিকতারও জের টেনে—'দুধ যদি দরকার হয়, গাইটার শিঙে মুখ দিলে কি হবে? বাঁটে মুখ দিতে হবে।'

সবাইকার হাসির মধ্যে বিজয়কৃষ্ণও কৌতুকী উপমায় কিছু যোগ করলেন, সমস্যার আভাস দিয়ে—'কিন্তু বাছুর প্রথম প্রথম এদিক-ওদিক ঢুঁ মারে।'

রসরাজ কিন্তু সহাস্যে সব সংশয় দূর করেছিলেন—'আবার কেউ হয়তো বাছুরকে ঐ করতে দেখে বাঁটটা ধরিয়ে দেয়।'

রহস্য পরিহাসের মধ্যে একটি পরম প্রেরণার বাণী শ্রোতাদের অন্তরে মুদ্রিত হলো।

•

কত প্রকার মানুষের, নর ও নারীরও, বিভিন্ন বয়সের মানসিকতার কি সুরসিক তাঁর দৃষ্টি।

তখন নরেন্দ্রনাথ নতুন আসছেন দক্ষিণেশ্বরে। ১৮৮২ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিকের কথা। শ্রীম.ও সেসময় কদিন মাত্র শ্রীরামকৃষ্ণর সন্নিধানে উপনীত হয়েছেন।

সেদিন বিকালবেলা। অন্য সব ভক্তরা চলে গেছেন একে একে। শুধু নরেন্দ্র ও শ্রীম. রয়েছেন।

ঠাকুর বললেন নরেন্দ্রকে, 'দ্যাখ, আর একটু বেশি বেশি আসবি। সবে নূতন আসছিস কিনা। প্রথম আলাপের নূতন সকলেই ঘন ঘন আসে, যেমন নূতন—পতি।'

নরেন্দ্র ও শ্রীম. হাসতে লাগলেন।

তিনি পুনরায় বললেন, 'কেমন আসবি তো?'

নরেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের ছেলে, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'হ্যাঁ, চেষ্টা করবো।'—জানিয়েছেন 'কথামৃত'-কার।

একদিন রামচন্দ্র দত্ত তাঁর পারিবারিক অশান্তির কথা বলছিলেন। অন্য ভক্ত কজনও ছিলেন ঠাকুরের সামনে। রামচন্দ্রের বিমাতা সংসারে (শ্রীম) একজন ভক্ত—'External world বাহিরে আছে ফিলজফার কেউ prove করতে পেরেছে? তবে বলেছে irresistible belief.

গিরিশ বললেন নরেন্দ্রকে—'তোমার সম্মুখে এলেও তো বিশ্বাস করবে না। হয়ত বলবে, ও বলছে আমি ঈশ্বর, মানুষ হয়ে এসেছি, ও মিথ্যা-বাদী ভণ্ড!'

দেবতারা অমর, এ প্রসঙ্গও এসে গেল।

নরেন্দ্র বললেন—'তার প্রমাণ কই?'

গিরিশ—'তোমার সামনে এলেও তো বিশ্বাস করবে না।'

নরেন্দ্র—'অমর, past ages-এতে ছিল, প্রুফ চাই।'

শ্রীম. এবার পল্টুকে কি বলে দিলেন।

পল্টু সহাস্যে নরেন্দ্রকে বললেন—'অনাদি কি দরকার? অমর হতে গেলে অনন্ত হওয়া দরকার।'

শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে টিপ্পনী দিলেন, 'নরেন্দ্র উকীলের ছেলে, পল্টু ডেপুটির ছেলে।'

সকলের হাসির মধ্যে প্রসঙ্গ সমাপ্ত হলো। ঠাকুর পরোক্ষে যেন পল্টুর দিকেই রায় দিলেন সকৌতুকে।

সংস্কৃত ভাষাতেও শ্রীরামকৃষ্ণের কিছু জ্ঞান ছিল কি? সেই এক জ্ঞানের উৎস থেকে, শ্রুতি-স্মৃতি সঞ্জাত কিছু ধারণা? ভারতের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য, জ্ঞান, বিদ্যা, চিন্তাদি যে ভাষায় প্রকাশিত, বিধৃত, রক্ষিত হয়ে আছে? সংস্কৃত সম্পর্কে তাঁর নিজেরই একটি উক্তি আছে, ছেলেবেলার প্রসঙ্গে 'কোন পণ্ডিত যদি এসে সংস্কৃত কথা কয় তো বুঝতে পারি। কিন্তু নিজে সংস্কৃত কথা কইতে পারি না।'

তাঁর একদিনের পরিহাস বাচন থেকে কৌতূহল জাগে এ সম্পর্কে। সেদিন তিনি দৃষ্টান্ত রাখেন যে, ভাষণের ত্রুটি বা বিচ্যুতি তাঁর কানে

বেসুরে বাজে। তিনিও ভুল উচ্চারণ ও ব্যাকরণ—দুষ্ট বাক্য নিয়ে সৃষ্টি করতে পারেন কৌতুক।

প্রসঙ্গত, ঠাকুরের সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে বলে নেওয়া যায় এখানে। শুধু হাজরার বিষয়ে নয়, আরো কিছু কিছু সংস্কৃত বাক্য তিনি উচ্চারণ করেছেন, বিভিন্ন দিনের ভাষণমালায়। কথাপ্রসঙ্গে, সূত্র-স্বরূপ। সম্পূর্ণ অর্থ জেনেই তাঁর এই উক্তিগুলির প্রয়োগ, বলাবাহুল্য। কখনো সেই সব বাক্যের তাৎপর্যও ব্যাখ্যা করেছেন।

'কথামৃত'তে লিপিবদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্ধৃত সংস্কৃত বাণী—(১) (অধ্যাত্ম রামায়ণের) বাচ্য বাচক ভেদেন ত্বমেক পরমেশ্বর। (২) (কেন রাম-চন্দ্রের ছদ্মবেশ ধারণ করে সীতাকে অধিগত করলে না ? একথার উত্তরে রাবণের উক্তি—'যখন রামকে চিন্তা করি তখন ব্রহ্মপদ তুচ্ছ বোধহয়, পরস্ত্রী সামান্য কথা। তাই রামরূপ কি ধরবো ?') তুচ্ছং ব্রহ্ম-পদং পর বধূসঙ্গঃ কুতঃ। (৩) অন্তর্বহির্যদিহরিস্তপস্য ততঃ কিম্। (৪) সর্বং বিষ্ণুময় জগৎ। (৫) মুষলং কুলনাশনম্। (৬) তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্। (৭) আপো নারায়ণঃ। (৮) রক্তবর্ণং চতুর্মুখম্। (৯) লভ লভ হরি-ভক্তিং। (১০) শতমারী ভবেদ্বৈদ্যঃ সহস্রমারী চিকিৎসকঃ ইত্যাদি।

তা ভিন্ন তিনি প্রায়স 'হরি ওম্ তৎসৎ' এবং তন্ত্রোক্ত নানা সংস্কৃত বীজ-মন্ত্রও উচ্চারণ করতেন।

আবার এমন বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ-বহুল কাব্য বলতেন অক্লেশে—যেমন —'প্রসুপ্ত ভূজগাকারা আধার পদ্মবাসিনী।' এটি একটি রামপ্রসাদী গানের পঙক্তি।

কিংবা—'কালীকল্পতরু মূলে।' এটিও রামপ্রসাদের আরেকটি গানের অংশ। কিংবা—'ঈশ্বর মায়া জীবজগৎ।' বা—'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।' বা— 'অন্নচিন্তা চমৎকারা, কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা।' বা—'মনমত্তকরী।' কিংবা—'কৃষ্ণকিশোর পরম হিন্দু, সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।' বা—'আদ্যাশক্তি লীলাময়ী ; সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন।' কিংবা—'শ্মশানকালীর সংহার মূর্তি। রুধিরধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কটীতে নরহস্তের কোমরবন্ধ।'

কিংবা—'নিত্যজীব, মুক্তজীব, মুমুক্ষুজীব, বদ্ধজীব।'
নিতান্ত আটপৌরে কিন্তু সতেজ কথ্য ভাষার মতন সংস্কৃতও ব্যবহার করতেন প্রয়োজন হলেই। দেবভাষায় তাঁর সহজাত অধিকারের এ-সবও সাক্ষ্যস্বরূপ।
সুতরাং হাজরার সেই সংস্কৃত বাক্যের একটি তাঁর কাণে ধরা পড়েছিল। সেজন্যেই ঠাকুর রহস্যভরে রামলালকে জিজ্ঞাসা করলেন—'হ্যাঁরে রামলাল, হাজরা ওটা কি করে বলেছিল—অন্তস্ বহিস্ যদি হরিস্ (সকার দিয়ে) ?'
বলে, আরেকটি হাস্যকর সংস্কৃত উদ্ধৃত করলেন—'যেমন একজন বলে-ছিল—মাতারং ভাতারং খাতারং অর্থাৎ মা ভাত খাচ্ছে।'
শুনে সকলে হাসতে লগেলেন। আর রামলালও সহাস্যে বললেন—'অন্তর্বহির্যদিহরিস্তপসা ততঃ কিম্।'

তিনি যেখানে অবস্থান বা কথোপকথন করেন, সৃষ্টি হয় সহর্ষ পরি-মণ্ডল। তাঁর তাবৎ ভাগবতী আলাপচারিতে ক্ষণে ক্ষণে দীপ্ত কৌতুক বিচ্ছুরিত হয়ে ওঠে আনন্দের প্রস্রবণ। তাঁর হাস্য পরিহাস এমনই সংক্রামক যে শ্রোতারাও যোগ দেন সচ্ছন্দে।
সেদিন দক্ষিণেশ্বরে একভাবে বলছেন। মেঝেয় বসে আছেন নরেন্দ্র, ভবনাথ, বাবুরাম, শ্রীম.।
ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে নানা কথার পর বলে চলেছেন—'যে মন তাঁকে দেব, সে মন ওদিক ওদিক বাজে খরচ করব? আমি বলি, মা, আমি নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল কিছুই চাই না, কেবল তোমায চাই। মানুষ নিয়ে কি করব?

ঘরে আসবেন চণ্ডী, শুনব কত চণ্ডী,
কত আসবেন দণ্ডী যোগী জটাধারী।

তাঁকে পেলে সবাইকে পাব। টাকা মাটি, মাটিই টাকা—সোনা মাটি, মাটিই সোনা—এই বলে ত্যাগ কল্লুম; গঙ্গার জলে ফেলে দিলুম।

তখন ভয় হলো যে, মা লক্ষ্মী যদি রাগ করেন। লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য অবজ্ঞা করলুম। যদি খ্যাঁট বন্ধ করেন। তখন বললুম, মা তোমায় চাই, আর কিছুই চাই না ; তাঁকে পেলে তবে সব পাব।'

তখন ভবনাথ হাসতে হাসতে বললেন, 'এ পাটোয়ারী !'

ঠাকুর সহাস্যে মেনে নিলেন—'হ্যাঁ, এটুকু পাটোয়ারী।'

কিন্তু তা কি একটুখানির লাভের আশায়, না পরম প্রাপ্তির জন্যে ? সে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির প্রয়োগও তৎক্ষণাৎ করলেন। জিহ্বাগ্রে বাদ্‌বাদিনী ভর দিলেন গল্প-কণিকার রূপকে—

'ঠাকুর সাক্ষাৎকার হয়ে একজনকে বললেন, তোমার তপস্যা দেখে বড় প্রসন্ন হয়েছি। এখন একটি বর নাও। সাধক বললেন, ঠাকুর যদি বর দেবেন তো এই বর দিন, .যন সোনার থালে নাতির সঙ্গে বসে খাই।' রহস্য ভেদ করে বললেন—এক বরেতে অনেকগুলি হল। ঐশ্বর্য হল, ছেলে হল, নাতি হল।' '(সকলের হাস্য)।'

কেশব সেন তখন খুব অসুস্থ। ঠাকুর তাঁর কাছে এসেছেন কমল কুটিরে।

কথায় কথায় বলছেন, 'হয কি জান ? আগুন লাগলে কতকগুলো জিনিষ পুড়িয়ে টুড়িয়ে ফেলে ; আর একটা হৈ হৈ কাণ্ড আরম্ভ করে দেয়। জ্ঞানাগ্নি প্রথমে কাম ক্রোধ এইসব রিপু নাশ করে ; তারপর অহং বুদ্ধি নাশ করে। তারপর একটা তোলপাড আরম্ভ করে !

তুমি মনে কচ্ছো সব ফুরিয়ে গেল ! কিন্তু যতক্ষণ রোগের কিছু বাকি থাকে, ততক্ষণ তিনি ছাড়বেন না। হাসপাতালে যদি তুমি নাম লেখাও, আর চলে আসবার যো নাই। যতক্ষণ রোগের একটু কসুর থাকে, ততক্ষণ ডাক্তার সাহেব চলে আসতে দেবে না। তুমি নাম লিখালে কেন !'

শুনে সকলেই হাসতে লাগলেন। বিশেষ 'কেশব হাসপাতালের কথা শুনিয়া বার বার হাসিতেছেন। হাসি সংবরণ করিতে পারিতেছেন না।

থাকেন থাকেন, আবার হাসিতেছেন।'

এমনই কৌতুককর কথা বলার ধরন—'তুমি নাম লিখালে কেন!'

ঈশ্বরেরই ঐশ্বর্য। ভগবানকে জানলে, তাঁকে লাভ করলে সবই জানা যাবে। সর্বাগ্রে প্রয়োজন ঈশ্বরকে জানা। একথা শ্রীরামকৃষ্ণ কত-ভাবেই কতদিনে কতজনকে বুঝিয়েছেন। গল্প শুনিয়েছেন সেই বাগানের আম খাওয়া। সেখানে কত আম গাছ, কত আম এসবের দরকার কি? আম খাওয়াই আসল লাভ।

তেমনি আরেক গল্পের রহস্যে বললেন মহিমাচরণকে।

'বড়বাবুর সঙ্গে আলাপ দরকার। তাঁর কখানা বাড়ি, ক'টা বাগান, কত কোম্পানীর কাগজ; এসব আগে জানবার জন্য অত ব্যস্ত কেন? কিন্তু যো সো করে বড়বাবুর সঙ্গে একবার আলাপ কর, তা ধাক্কা খেয়েই হউক আর বেড়া ডিঙ্গিয়েই হউক, তখন ইচ্ছা হয়তো তিনিই বলে দিবেন, তাঁর ক'খানা বাড়ি, কত বাগান, কত কোম্পানীর কাগজ। বাবুর সঙ্গে আলাপ হলে আবার চাকর দ্বারবান সব সেলাম করবে।'

(সকলের হাস্য)।'

যে কোনো সাধনের মাধ্যমে নিখিল বিশ্বের 'বড়বাবু' অর্থাৎ অধীশ্বরকে জানাই সকলের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। তিনি জ্ঞাত হলেই তাঁর ঐশ্বরেরও পরিচয় পাওয়া যাবে। শ্রীরামকৃষ্ণের এই অন্যতম মূল বাণী, কৌতুকের মোড়কে।

কথায় কথায় তাঁর রসিকতা। ইচ্ছামাত্র যে কোনো প্রসঙ্গ থেকে রসসৃষ্টি করতে পারেন। রহস্যের কথাতেও তিনি আসরপতি। অপরাজেয়। অসুস্থ শরীরেও অম্লান রসিকসত্তা। তখন শ্যামপুকুরে রয়েছেন। সেদিন পরীক্ষা করতে এসেছেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল। তিনিও রসিক। ঠাকুরকে দেখে বললেন, 'আবার কাশি হয়েছে? (সহাস্যে) তা কাশীতে যাওয়া তো ভাল।' (সকলের হাস্য)।'

শ্রীরামকৃষ্ণ অমনি হেসে বললেন, 'তাতে তো মুক্তি গো ! আমি মুক্তি চাইনা, ভক্তি চাই।'
বুদ্ধি-দীপ্ত রহস্য তাঁর কি মহান তত্ত্বের প্রকাশ !

সেদিন দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে তিনি এসেছেন রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে। ঠাকুর একতলায় দেবীর কাছে প্রার্থনা করলেন। রাম দত্ত এলেন খানিক পরে।
তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'রাম ! তুমি কোথায় ছিলে ?'
রামচন্দ্র জানালেন, 'আজ্ঞা, উপরে ছিলাম।'
শ্রীরামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বললেন, 'উপরে থাকার চাইতে নীচে থাকা কি ভাল নয় ? নীচু জমিতে জল জমে, উঁচু জমি থেকে জল গড়িয়ে যায়।'
এখানে নীচু জমি অর্থ ভক্ত হৃদয়, যেখানে ভক্তি জমা হয়। রামচন্দ্রও তা বুঝে সহাস্যে বললেন, 'আজ্ঞা, হ্যাঁ।'

অত প্রিয় শিষ্য শ্রীম.। কিন্তু পরিহাস থেকে তাঁরও নিষ্কৃতি নেই। এক-সময় তিনি অনেকদিন আসতে পারেন নি দক্ষিণেশ্বরে।
সেদিন ঈশানচন্দ্রের বাড়িতে, কথার মধ্যে তাঁকে সকলের সামনেই বললেন, 'মাস্টার, তুমি আগে অত যেতে, এখন তত যাওনা কেন ? বুঝি পরিবারের সঙ্গে বেশি ভাব হয়েছে ?'
শ্রীম. কি উত্তর দিলেন তা আর লেখা নেই !

তাঁর চেয়ে আর কে বেশি জানেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ভাব ভক্তি। কিন্তু তার জন্যে রসিকতার কমতি হবে কি ?
একদিন খুব কীর্তন আর নৃত্য হলো দক্ষিণেশ্বরের ঘরে। 'এবার সং-কীর্তনে খুব মাতামাতি হইল। ঠাকুর মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতে-ছেন। ভক্তেরা তাঁহাকে খুব বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতেছেন। বিজয় নৃত্য

করিতে করিতে দিগম্বর হইয়া পড়িয়াছেন। হুঁশ নাই। কীর্তনান্তে বিজয় চাবি খুঁজিতেছেন, কোথায় পাড়য়া গিয়াছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বললেন, 'এখানে একটা হরিবোল খায়।' হরিবোল বা হরিনাম তাঁর নিজেরই কত প্রিয়। কত ভক্তকে হরিনাম ও কীর্তন করতে বা শুনতে নির্দেশ দিয়েছেন, উপায়-স্বরূপ। কিন্তু পরিহাসের পাত্র হয়েছেন যে বিজয়কৃষ্ণ। তাই 'এখানে একটা হরিবোল খায়।'

'জ্ঞানবাবু চারটে পাশ করিয়াছেন ও সরকারের কর্ম করেন। তিনি ১০টা ১১টার সময় আসিয়াছেন।' তাঁকে দেখে ঠাকুর বললেন, 'কি গো, হঠাৎ যে জ্ঞানোদয় ?'

তিনিও হেসে বেশ জানালেন, 'আজ্ঞে, অনেক ভাগ্যে জ্ঞানোদয় হয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাষায় ও ভাবে অসাধারণ চতুরালি করে, হাসতে হাসতে বললেন, 'তুমি জ্ঞান হয়ে অজ্ঞান কেন? ও বুঝেছি যেখানে জ্ঞান সেইখানেই অজ্ঞান। বশিষ্ঠদেব অত জ্ঞানী—পুত্রশোকে কেঁদেছিলেন! তাই তুমি জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও। অজ্ঞান কাঁটা পায়ে ফুটেছে—তুলবার জন্য জ্ঞান কাঁটার দরকার। তারপর তোলা হলে দুই কাঁটাই ফেলে দেয়।...'

কৃষ্ণ-যাত্রা পালার বিখ্যাত গায়ক ও অধিকারী নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর গানের ও সুকণ্ঠের অনুরাগী। তিনি সবিনয়ে বললেন ঠাকুরকে, 'আমায়ও ভাল্ করুন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ কি সুন্দর, সরস করে বললেন, 'তুমি ত ভাল আছ।' ক'য়ে আকার 'কা', আবার আকার দিয়ে কি হবে? 'ক'-এর উপর আবার আকার দিলে সেই 'কা'-ই থাকে।' (সকলের হাসি)।

একদিন 'পূর্বকথা'য় ঠাকুর বলছেন, 'রাজেন্দ্র মিত্র—আটশ' টাকা মাইনে

—প্রয়াগে কুম্ভমেলা দেখে এসেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কেমন গো, মেলায় কেমন সব সাধু দেখলে ? রাজেন্দ্র বল্লে—'কই তেমন সাধু দেখতে পেলেম না। একজনকে দেখলাম বটে, কিন্তু টাকা লন।
তাই যোগ করলেন পরিহাসে, কৃপণ স্বচ্ছলদের প্রতি অন্তর্দৃষ্টিতে—'এখানে প্যালা দিতে হয় না—তাই সকলে আসে। আমি ভাবি, আহা ওরা টাকা বড় ভালবাসে ! তাই নিয়েই থাকুক।'

সেই যে কৃষ্ণকিশোর 'লুচি ছক্কা খেয়ে একাদশী' পালন করতেন, তার কথায় পরম রসিক বললেন, 'কৃষ্ণকিশোর বল্‌তো 'আমি খ !' একদিন তার বাড়িতে গিয়ে দেখি, সে চিন্তিত হয়ে বসে আছে; বেশি কথা কচ্ছে না। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছে গা, এমন করে বসে রয়েছ কেন ? সে বললে, 'টেক্‌সোওয়ালা এসেছিল, সে বলে গেছে টাকা যদি না দাও তাহলে ঘটি বাটি সব নিলাম করে নিয়ে যাব; তাই আমার ভাবনা হয়েছে।' আমি হাসতে হাসতে বললাম—সে কি গো, তুমি ত 'খ', আকাশবৎ। যাক শালারা ঘটি বাটি নিয়ে যাক, তোমার কি ?'

সেদিন 'গোবিন্দ' নাম করতে করতে ঠাকুরের সমাধিস্থ অবস্থা এসেছে, দক্ষিণেশ্বরের ঘরটিতে। শ্রীম. প্রমুখ কয়েকজন ভক্ত সামনে।
এমন সময়, গৈরিক পরিহিত এক অপরিচিত বাঙালী এলেন এবং বসলেন। ক্রমে ভঙ্গ হতে লাগল ঠাকুরের সমাধি। ভাবস্থ থেকেই আপনা আপনি কথা বলছেন—গৈরিকধারীকে দেখে—
'আবার গেরুয়া কেন ? একটা কি পরলেই হলো ?'
সেই ভাবের মধ্যেও কৌতুকী। হেসে বললেন, 'একজন বলেছিল, চণ্ডী ছেড়ে হলুম ঢাকী।'—আগে চণ্ডীর গান গাইতো, এখন ঢাক বাজায় !'
সকলে হাসতে লাগলেন।
বৈরাগ্য কয়েক প্রকার। তার মধ্যে একরকমের দৃষ্টান্ত দিলেন তিনি—'সংসারের জ্বালায় গেরুয়াবসন পরেছে—সে বৈরাগ্য বেশিদিন থাকে

না। হয়ত কর্ম নাই, গেরুয়া পরে কাশী চলে গেল। তিন মাস পরে পত্র এলো, 'আমার একটি কর্ম হইয়াছে, কিছুদিন পরে বাড়ি যাইব, তোমরা ভাবিত হইও না।'
তাকে বলে মর্কট বৈরাগ্য। একথা শুনে সেই গৈরিক পরিহিত আগন্তুকের অবস্থার কথা কিছু জানান নি শ্রীম.।

কথোপকথনে সদা প্রাণবন্ত তিনি। আর, উপলক্ষ হলেই সরস, মনোরম বাচন। সেদিন সুরেন্দ্র মিত্রের বাগানে মহোৎসব চলেছে। ঠাকুর রয়েছেন ভক্তদের সঙ্গে। এমন সময় এলেন মহিমাচরণ। তিনি সর্বদা শাস্ত্রালোচনা ও ঈশ্বরচিন্তা করেন। কিন্তু পাণ্ডিত্যও আছে। ইংরাজী, সংস্কৃত অনেক গ্রন্থ পড়িয়াছেন।
তাঁকে দেখামাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে অভ্যর্থনা করলেন—'এ কি! এখানে জাহাজ এসে উপস্থিত!' (সকলের হাস্য)।
সুন্দর বিনয় প্রকাশ করে বললেন, 'এমন জায়গায় ডিঙ্গিটিঙ্গি আসতে পারে; এ যে একেবারে জাহাজ!'
সকলে আবার হাসতে লাগলেন। তিনি আরো যোগ করলেন—'তবে একটা কথা আছে—এটা আষাঢ় মাস।'
পুনরায় সকলের হাস্য।

এমনি কৌতুকের ঝলক কথার মাত্রায় মাত্রায়।
সেদিন প্রসঙ্গ করছেন হরিনাম মাহাত্ম্য। নরেন্দ্র, ভবনাথ, আর কোন্নগরের ভক্তদের বলছেন, 'যিনি পাপ হরণ করেন তিনিই হরি। হরি ত্রিতাপ হরণ করেন।'
আর চৈতন্যদেব প্রচার করেছিলেন—'অতএব ভালো। দেখো চৈতন্যদেব কত বড় পণ্ডিত—আর তিনি অবতার—তিনি সেকালে এই নাম প্রচার করেছিলেন এ অবশ্য ভাল।'
বলতে বলতেই পরিহাস মুখর হলেন—'চাষারা নিমন্ত্রণ খাচ্ছে—তাদের

জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমরা আমড়ার অম্বল খাবে? তারা বললে, যদি বাবুরা খেয়ে থাকেন তা হলে আমাদের দেবেন। তাঁরা যেখানে খেয়ে গেছেন সেখানে ভালই হয়েছে।' (সকলের হাস্য।)

নিজেকে নিয়েও রঙ্গভঙ্গ। এমন কি বিপর্যস্ত শরীরেও সদানন্দ, রসিকতার নির্ঝর। চিত্তরঞ্জক সদালাপী, সুকৌশলী ভাষাশিল্পী। সে বাকপটুত্বের অনেক নিদর্শন আগে দেওয়া হয়েছে। এখানে আরেকটি।
একবার দক্ষিণেশ্বরে তিনি আঘাত পান, ভাবাবিষ্ট অবস্থায়। ঝাউতলার দিকে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে কেউ না থাকায়, পড়ে যান রেলের কাছে। তাঁর বাঁ হাতের হাড় সরে যায়।
তারপর সেদিন ডাক্তার এসেছেন প্যাড, ব্যাণ্ডেজ করবার জন্যে। ঠাকুরের ভগবদ্ প্রসঙ্গে তখনো বিরাম নেই।
ডাক্তারের নাম শুনলেন মধুসূদন। হাতে বাড়, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হচ্ছে। তার মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, 'ঐহিক ও পারত্রিকের মধুসূদন।'
ডাক্তারও হেসে বিনয় প্রকাশ করলেন, 'কেবল নামের বোঝা বয়ে মরি।'
অপরাজেয় আলাপচারী অমনি হাসতে হাসতে বললেন, 'কেন, নাম কি কম? তিনি আর তাঁর নাম তফাৎ নয়।'
আবার একটি মনোরম পৌরাণিক প্রসঙ্গও শুনিয়ে দিলেন, 'সত্যভামা যখন তুলাযন্ত্রে স্বর্ণ-মণি মাণিক্য দিয়ে ঠাকুরকে ওজন কচ্ছিলেন, তখন হলো না! যখন রুক্মিণী তুলসী আর কৃষ্ণনাম একদিকে লিখে দিলেন, তখন ঠিক ওজন হলো!'
এর মধ্যে বাড় বাঁধবার জন্যে মেঝেয় বিছানা পাতা হলো ঠাকুরের। তিনি সহাস্য বদনে শোবার সময় কীর্তনের পদ গাইলেন—'রাইয়ের দশম দশা! বৃন্দে বলে, আর কত বা হবে।'
দশম দশা অর্থাৎ বিরহের চরম দশা, যা মৃতকল্প অবস্থা। শয়নের

অনুষঙ্গেই শ্রীরামকৃষ্ণের মনে উদয় হয়েছিল রাধিকার কৃষ্ণবিরহে দশম দশা। আর সুর করে পদটি শোনালেন। যেমন সদা কৌতুকী চিত্ত, তেমনি নিত্যই কোনো না কোনো ঈশ্বরীয় ভাবে তদ্‌গত অন্তর। এখন রাধা ভাবে ভাবিত। কণ্ঠে কীর্তনের সুর।
ভক্তেরা তাঁর চারিদিকে বসলেন। ঠাকুর আবার গাইলেন সেই পরি-বেশে—'সব সখি মিলি বৈঠল—সরোবর কূলে।'
তারই মধ্যে তাঁর হাতে বাড় বাঁধা হলো।

তখন শ্যামপুকুরে রয়েছেন, ক্যান্‌সার চিকিৎসার জন্যে। কিন্তু যে কাল ব্যাধি ত 'খোল' টার। সে আনন্দ-সত্ত্বার তাতে কি?
কোনো কোনো ভক্ত তখন বৈঠকখানায় গান গাইছিলেন। ঠাকুরের কান ছিল সেদিকেও। তাই তাঁরা যখন তাঁর কাছে এলেন, তিনি বললেন—'তোমরা গান গাচ্ছিলে—তাল হয়না কেন?' অমনি যেন নিজের কথার তাল রাখতেই আরো একটু যোগ করলেন—'কে একজন বেতাল সিদ্ধ ছিল—এ তাই।'
সকলে হাসতে লাগলেন।
ঘরে একটি তরুণ উপস্থিত, ছোট নরেনের আত্মীয়। তার খুব সাজ-গোজের বাহার, চোখে চশমা।
ঠাকুর ছোট নরেনের সঙ্গেই কথার মধ্যে কেমন বললেন' 'দেখ, এই রাস্তা দিয়ে একজন ছোকরা যাচ্ছিল, প্লেটওলা জামা পরা। চলবার যে ঢঙ্‌। প্লেটটা সামনে রেখে সেইখানটা চাদর খুলে দেয়—আবার এদিক ওদিক চায়—কেউ দেখছে কিনা। চলবার সময় কাঁকাল ভাঙ্গা। এক-বার দেখিস না।'
বাচন ও অঙ্গ ভঙ্গিমায় শ্রোতাদের হাসালেন। কিন্তু সে ছোকরা কি রাস্তার, না তাঁর ঘরের? তার ধরন ধারণ দেখেই তাঁর এই মৌখিক কৌতুক রচনা কি?

ওইদিনেই ডাক্তার মহেন্দ্রলাল প্রমুখের সঙ্গে কথা বলছেন, 'তবে এ
ভ্রম সহজে যায় না। জ্ঞানের পরও থাকে। স্বপনে বাঘ দেখেছে, স্বপন
ভেঙ্গে গেল, তবু বুক দুড় দুড় করছে।'
বলে, সেই গল্পটি শোনালেন। ক্ষেতে চোরদের ভয় দেখাতে খড়ের
চৌকিদার সাজিয়ে রাখা।'
মহেন্দ্রলাল বললেন, 'এসব বেশ কথা।'
সহাস্য কথক বললেন, 'একটা 'থ্যাঙ্ক ইউ' 'দাও।'
ডাক্তার জানালেন, 'তুমি কি বুঝছো না, মনের ভাব? আর কত কষ্ট
করে তোমায় এখানে দেখতে আসছি।'
তেমনি হাসিমুখে ঠাকুর বললেন—আবার গল্প করে—'না গো, মূর্খের
জন্য কিছু বল। বিভীষণ লঙ্কার রাজা হতে চায় নাই—বলেছিল, রাম
তোমাকে পেয়েছি আবার রাজা হয়ে কি হবে! রাম বললেন, বিভী-
ষণ! তুমি মূর্খদের জন্য রাজা হও। যারা বলছে, তুমি এত রামের সেবা
করলে, তোমার কি ঐশ্বর্য হলো? তাদের শিক্ষার জন্য রাজা হও।'
মহেন্দ্রলালের হয়ত কথাটির পূর্ণ তাৎপর্য ধারণা হয় নি। তাই তিনি
সাধারণভাবে বললেন, 'এখানে তেমন মূর্খ কই?'
হাসতে হাসতে শ্রীরামকৃষ্ণ রহস্য করে বললেন, 'না গো, শাঁকও আছে
আবার গেঁড়ি গুগলিও আছে।' ('সকলের হাস্য।')
শঙ্খ ধ্বনি শোনা যায়। কিন্তু আওয়াজ নেই গেঁড়ি গুগলির!

হাজরাকে ঠাকুরই দক্ষিণেশ্বরে থাকবার ব্যবস্থা করে দেন। তাঁর ঘরের
বারান্দায় বসে জপ তপ করতেন হাজরা। আবার তাঁর সঙ্গে তর্কও
করতেন। দালালীর চেষ্টাও চলত জপাদির মধ্যে। কারণ দেশে কিছু
দেনা আছে। ঠাকুর সকৌতুকে বলতেন, 'হাজরার সব হয়েছে, কেবল
একটু কসুর আছে। মামীর সব অসুখ সেরে গেছে, কেবল একটু কসুর
আছে।' হাজরার অহমিকাও খুব।
সেই হাজরার কি ধারণা নিজের এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে! ঠাকুর স্বয়ং

সেই হাস্যকর উক্তি জানিয়েছেন সহাস্যে।
(সত্বগুণে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, সত্বগুণকে সাদা, রজোগুণকে লাল ও তমোগুণকে কালো রঙের সঙ্গে তুলনায় কথা বলে)—'আমি একবার হাজরাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি বল কার কত সত্বগুণ হয়েছে। সে বললে, 'নরেন্দ্রের যোল আনা আর আমার একটাকা দুই আনা।' (আমার অর্থ হাজরার)। জিজ্ঞাসা করলাম, আমার কত হয়েছে ? তা বললে, তোমার এখনও লাল্‌চে মারছে—তোমার বার আনা।'
শুনেই সকলে হেসে উঠলেন।
শ্রীরামকৃষ্ণের বারো আনা ! আর হাজরার এক টাকা দু আনা ! হাস-বারই কথা ত ! আর বলবার ধরন এমন কৌতুকী।

ভোগ সুখ সব চূড়ান্ত করে নিলে, বার্ধক্যে এক রকমের অনাসক্তি আসে। ভোগের ক্ষমতা থাকে না তখন। সমস্তই ঠাকুরের লক্ষ্য করা। তাই একদিন হাসতে হাসতে বললেন—অমনি একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে—'আর দেখ, দাঁতও সব পড়ে গেছে, আর দুর্গাপূজা কেন ? (সকলের হাস্য)। একজন বলেছিল, আর দুর্গাপূজা কর না কেন ? সে ব্যক্তি উত্তর দিলে, আর দাঁত নাই ভাই। পাঁঠা খাবার শক্তি গেছে।'
একথায় দ্বিতীয় পরিহাস এই যে, সে ব্যক্তির পাঁঠা খাওয়াটাই মুখ্য, দুর্গাপূজা গৌণ বা উপলক্ষ মাত্র।
লোক-চরিত্রের সর্বদিকে কি অন্তর্ভেদী দৃষ্টি তাঁর। আর অসঙ্গতি দেখা মাত্র উপভোগ্য তাঁর রহস্য বাচন।
'যার টাকা আছে তার দেওয়া উচিত।' কিন্তু তার বিপরীত উদাহরণই সংসারে বেশি। তাই বললেন, 'এক একজন টাকা থাকলেও হিসেবী (কৃপণ) হয়, টাকা যে কে ভোগ করবে তার ঠিক নাই !
সেদিন জয়গোপাল এসেছিল। গাড়ি করে আসে। গাড়িতে ভাঙা লণ্ঠন ; ভাগাড়ের ফেরৎ ঘোড়া ; মেডিকেল কলেজের হাসপাতাল ফেরৎ দ্বার-বান—আর এখানের জন্য নিয়ে এল দুই পচা ডালিম।' (সকলের হাস্য)।

সুরেন্দ্র মিত্র বললেন, 'জয়গোপালবাবু ব্রাহ্ম সমাজের। এখন বুঝি কেশববাবুর ব্রাহ্মসমাজে সেরূপ লোক নাই। বিজয় গোস্বামী, শিবনাথ ও আর আর বাবুরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ করেছেন।'
অমনি শ্রীরামকৃষ্ণের সুরসিক মন্তব্য—'গোবিন্দ অধিকারী যাত্রার দলে ভাল লোক রাখতনা—ভাগ দিতে হবে বলে।' (সকলের হাস্য)।

ইচ্ছা হলেই তিনি কোনো বিশেষ চরিত্র বা ঘটনা বা কথা উপলক্ষে রসিকতা মুখর হতে পারেন। তরুণ শিষ্যদের সামনে পরিহাস করেন সচেতনভাবে। একদিন জানিয়েও ছিলেন।
'ঠাকুর এইবার ছোকরাদের সঙ্গে ফস্টি নষ্টি করতে লাগলেন।'
ভক্তদের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমি এদের (ছোকরাদের) কেবল নিরামিষ দিইনা। মাঝে মাঝে আঁশ ধোযা জল একটু একটু দিই। তা না হলে আসবে কেন।'

তাঁর গৃহী ভক্ত সেবকদের মধ্যে বলরাম বসু কিংবা রামচন্দ্র দত্তের মতন অত প্রিয় আর কজন ? তবু তাঁদের নিয়েও কি রহস্য পরিহাসে মেতে ওঠেন।
একদিন বলরাম-ভবনে নরেন্দ্রকে ঠাকুর বলছেন গান গাইতে।
নরেন্দ্র বললেন—'ঘরে যাই—অনেক কায আছে।'
'তা বাছা, আমাদের কথা শুনবে কেন ?' অমনি শ্রীরামকৃষ্ণ ছড়া কেটে বলে উঠলেন, 'যার আছে কানে সোনা, তার কথা আনা আনা। যার আছে—ট্যানা তার কথা কেউ শোনেনা।' (সকলের হাস্য)।
নরেন্দ্র একটু মৌন থেকে বললেন, 'যন্ত্র নাই, শুধু গান—'
'আমাদের বাছা যেমন অবস্থা।—এইতে পারতো গাও। তাতে বলরামের বন্দোবস্ত !'
কেমন সে বন্দোবস্ত বলরামের ? সবিস্তারে তার সরস বর্ণনা দিলেন—রাম দত্তও আক্রান্ত হলেন তার মধ্যে—'বলরাম বলে, 'আপনি নৌকা

` ˜ াসবেন, একান্ত না হয় গাড়ি করে আসবেন—(সকলের হাস্য)। খ্যাঁট দিয়েছে। আজ তাই বৈকালে নাচিয়ে নেবে। (হাস্য) এখান থেকে এ দিন গাড়ি করে গিছলো—বার আনা ভাড়া—আমি বল-লাম, 'বার আনায় দক্ষিণেশ্বরে যাবে?' তা বলে, ও অমন হয়।' গাড়ি রাস্তায় যেতে যেতে একধার ভেঙ্গে পড়ে গেল—(সকলের হাস্য)। আবার ঘোড়া মাঝে মাঝে একবারে থেমে যায়। কোন মতে চলে না। গাড়োয়ান এক একবার খুব মারে, আর এক একবার দৌড়ায়। (উচ্চ হাস্য)। তারপর রাম খোল বাজাবে—আর আমরা নাচবো—রামের তাল বোধ নাই। (সকলের হাস্য)। বলরামের ভাব, আপনারা গাও, নাচো. আনন্দ করো।' (সকলের হাস্য)।

ঠাকুরের একান্ত অনুগত সেবক বলরাম কার কাছে পেয়েছিলেন আনন্দ করা আর নৃত্যগীতের ভার? তাঁর রসিক চূড়ামণি গুরুর দৃষ্টান্তেই। স্বয়ং রসস্বরূপ ঈশ্বরকে লাভ করে শ্রীরামকৃষ্ণ রসময়। নিত্য এবং লীলা দুইয়েই অবস্থান করে তিনি সদানন্দ। তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মানন্দ। কিন্তু ওই ব্রহ্ম-জ্ঞানেই তাঁর তৃপ্তি নয়। চিন্ময়ী জননীকে তিনি প্রার্থনা জানান, 'ওমা! ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে বেঁহুশ করে রাখসনে। ব্রহ্মজ্ঞান চাইনা মা। আমি আনন্দ করবো। বিলাস করবো।'
শ্রীরামকৃষ্ণের সেই আনন্দ-বিলাসী লীলা-বিলাসী সত্তার এক প্রকাশ তাঁর কৌতুকী রূপ!

যিনি নিজেকে নিয়ে পরিহাসে উচ্ছ্বসিত হতে পারেন, তিনি কত বড় রসিক। ঠাকুরও ছিলেন তাই। তার কিছু নিদর্শন আগে দেওয়া হয়েছে। আর একটি বলা যাক উপসংহারে।
একদিন তিনি সপার্ষদ একটি উৎসবে যাবেন। কথা ছিল, শ্রীমাও থাকবেন সঙ্গে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সারদা দেবীর যাওয়া হলো না। তিনি যাবেন না শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন—আশ্বস্ত হয়ে—'ভালই হল। দুজনে একত্র গেলে সবাই বল্‌তো, হংস হংসী এসেছে।'